উদ্ধারণপুরের ঘাট

অবধূত

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৬৩
পঞ্চম মুদ্রণ
—সাড়ে চার টাকা—

এই লেখকের
বহুব্রীহি
মরুতীর্থ হিংলাজ
বশীকরণ

প্রচ্ছদপট :—
অঙ্কন—শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
ব্লক ও মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে স্বামী কালিকানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত ও
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি:-৯ হইতে শ্রীসন্তোষকুমার ধর কর্তৃক মুদ্রিত।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব—

অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণোদ্দেশে-

১৭ই পৌষ, ১৩৬৩

এই রচনাটি ধারাবাহিকভাবে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁদের তাগিদ না থাকলে হয়ত লেখাও হ'ত না। উক্ত পত্রিকার কর্মকর্তাদের কাছে অকপট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

অবধূত

ভূমিকা

বৎসর দেড়েক পূর্বে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' পড়িয়া বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নবাগত 'অবধূতে'র পাকাপোক্ত হাতের এবং অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত মনের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। যে ডিটাচ্‌মেণ্ট সাহিত্যে উচ্চতম শিল্প—এপিক ও ড্রামা—সৃষ্টির সহায়ক, অনুভব করিলাম লেখকের তাহা আছে। লেখকের সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া যাহা জানিলাম তাহাতে গোড়াতেই দমিয়া গেলাম—তিনি আমারই মত প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিতে চলিয়াছেন। এ বয়সে সাহিত্য-শিল্প-সৃষ্টির উপযোগী নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা থাকার কথা নয়। কিন্তু লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় আমাকে অচিরাৎ আশ্বস্ত করিল। তাঁহার বহুবিচিত্র জীবন হইতে তিনি এতকাল অভিজ্ঞতার যে রস ও রসদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা তাঁহার চিত্তকে কুলিশকঠিন করে নাই। তিনি আষাঢ়ের নবীন মেঘের মত বর্ষণোন্মুখ হইয়া আছেন। অতএব মাভৈঃ!

হিংলাজের স্বামীজীমহারাজের চরিত্র আমাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল। আমার মন বলিয়াছিল, উনি রাতারাতিই এমন স্বয়ম্ভূ হইয়া উঠেন নাই। ইহারও প্রস্তুতির কাল ও ক্ষেত্র আছে। কয়েক মাস পরে প্রকাশিত 'অবধূতে'র 'বশীকরণে' খুঁজিলাম। তিনখানা লক্কড় জ্বালিয়া যে ফক্কড় দিনান্তে দুইখানা টিক্কর বানাইয়া খাইয়া বিনা ঝপ্পড় মাঠে ঘাটে গাছতলায় ধূলিধূসরিত হইয়া সাধনপথে অগ্রসর হয় এবং পথ চলিতে চলিতে দুই হাতে দুনিয়াকে থাপ্পড় মারে তাহার বৈশ্বানরদগ্ধ অথচ অশ্রুসজল কাহিনীর মধ্যে স্বামীজীমহারাজের প্রাথমিক আভাস পাইলেও তাঁহাকে ঠিক ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাইতেছিলাম না। একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ 'উদ্ধারণপুরের ঘাটের' পাণ্ডুলিপি হাতে পাইলাম। এক নিঃশ্বাসে পড়িয়াই সন্দেহের নিরসন হইল। সকল মানুষের যাহা চরম পরিণতি—কালো কয়লা এবং সাদা হাড়—অনির্বাণ চিতাবহ্নিতে যেখানে অহরহ সেই পরিণামের ভিয়ান চলিতেছে, সেই উদ্ধারণপুরের ঘাটে শবপরিত্যক্ত বিচিত্র শয্যার গদির উপর আসীন হইয়া তরল আগুন গিলিতে গিলিতে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সাঁই-বাবা না বনিলে যে 'মরুতীর্থ হিংলাজে'র স্বামীজীমহারাজ হওয়া যায় না তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। এবং অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলাম। এই আনন্দ সকল পাঠক পাইবেন সেই আশাতে এই "ভূমিকা" লেখার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় স্বীকার করিলাম। ইতি—

শ্রীসজনীকান্ত দাস

"মাসর্তুদর্বী-পরিঘট্টনেন, সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে, ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা।"

রংপুরে অবস্থানের অব্যবহিত পরে সেখানে
গৃহীত লেখকের আলোকচিত্র (১৯১৮)

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

কান্না হাসির হাট।

ছত্রিশ জাতের মহাসমন্বয় ক্ষেত্র।
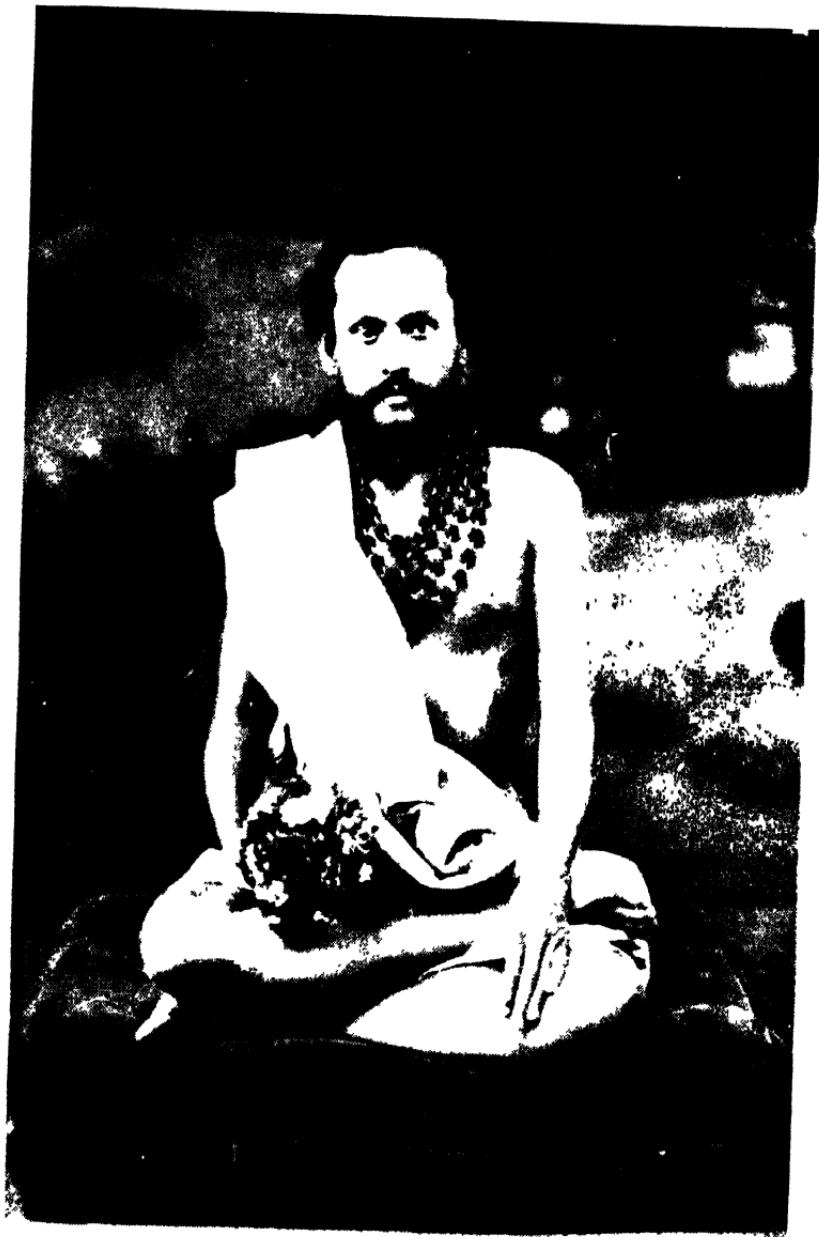
দুনিয়ার সর্বত্র দিনের শেষে নামে রাত, রাতের পিছু পিছু আসে দিন। উদ্ধারণপুরের ঘাটেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

উদ্ধারণপুরের দিন।

সুপ্তিমগ্না প্রকৃতির ধমনীতে নতুন জীবনের জোয়ার তুলে যে জ্যোতির্ময় উদিত হন ধরণীর বুকে, তিনি উদ্ধারণপুরের ঘাটকে সভয়ে এড়িয়ে চলেন। উদ্ধারণপুরের দিন আসে ওস্তাদ জাদুকরের বেশ ধরে। ভেল্কি-বাজির সাজ-সরঞ্জাম-বাঁধা প্রকাণ্ড পুঁটলিটা পিঠে ফেলে আঁধার কালো যবনিকার অন্তরাল থেকে নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে আর্বিভূত হয় উদ্ধারণপুরের দিন। ধীরে ধীরে যবনিকাখানি চোখের ওপর মিলিয়ে যায়। আলোর বন্যায় ভেসে যায় রঙ্গমঞ্চ। হেসে ওঠে উদ্ধারণপুরের ঘাট। পোড়া কাঠ, ছেঁড়া মাদুর, চট কাঁথা, বাঁশ চাটাই, হাড়গোড়, ভাঙ্গা কলসী সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। হাড়গিলাদের ঘুম ভাঙে। শকুনিরা ডানা ঝাপ্‌টে সাড়া দেয়। আকাশের দিকে মুখ তুলে শেয়ালেরা শেষবারের মত বলে ওঠে—হুক্কা হুয়া-হুয়া হুয়া-হুয়া হুয়া। অর্থাৎ কি না, হে নিশা, আবার ফিরে এস তুমি। দিনের আলোয় আমরা বড় চক্ষু-লজ্জায় পড়ে যাই কাঁচা মড়া নিয়ে টানাটানি করতে। তার ওপর ওই ওরা জেগে উঠে পাখা ঝাপটাচ্ছে, এখনি ভাগ বসাতে আসবে আমাদের ভোজে।

ততক্ষণে উদ্ধারণপুরের দিন তার জাদুর পুঁটলি খুলে ফেলেছে। শুরু হয়ে গেছে মায়াবী জাদুকরের জাদুর খেল্‌। পুঁটলিটা থেকে কি যে বেরুবে আর কি যে না বেরুবে তা আন্দাজ করে কার সাধ্য ? খেলার পর খেলা চলতেই থাকে। কথা আর কথা, কথার ইন্দ্রজালে সব কিছু ঘুলিয়ে যায়। যা জলজল করছে চোখের সামনে এক ফুঁ দিয়ে দেয় তা উড়িয়ে। কোথাও যার চিহ্ন মাত্র নেই—তুড়ি দিয়ে তা আমদানি করে তুলে ধরে নাকের ডগায়। সবই অদ্ভুত—সবই তাজ্জব কাণ্ড। আগের খেলাটির সঙ্গে পরেরটির কোনও খানে কোনও মিল নেই।

উদ্ধারণপুরের শ্মশান। পাকা ওস্তাদ জাদুকরের বেশে প্রতিটি দিন যেখানে আসে কালো যবনিকার অন্তরাল থেকে। চালিয়ে যায় তার ভোজবাজি যতক্ষণ না যবনিকাখানি আবার ধীরে ধীরে নামতে থাকে রঙ্গমঞ্চের ওপর তখন সব ফাঁকা হয়ে যায়।

আর তখন গালে হাত দিয়ে বসে থাকতাম আমি, পুনরায় যবনিকা ওঠার অপেক্ষায়।

আজ বড় বেশী করে মনে পড়ে উদ্ধারণপুর শ্মশানের সেই জমজমাট দিন-গুলিকে। প্রতি রাতে আমার সেই রাজসিক শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে হিসেবে খতিয়ে দেখতাম, কি কি জমা পড়ল সেদিন আমার জমা খরচের খাতার পাতায়। কম কিছু নয়, আক্ষেপ করতে হত না কোনও দিন। তখন সারা দিনের উপার্জন—অমূল্য মণিরত্নগুলি সাজিয়ে তুলে রাখতাম আমার মনের গহন কোণের মণি-কোঠায়। একটি পরম পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত বুক খালি করে।

তারপর নিশ্চিন্ত আরামে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়তাম বুক-ভরা আশা নিয়ে। ঘুম ভাঙ্‌লেই এমন একটি দিনকে পাব যা রঙে রসে যেমন টইটম্বুর, আলোয় আঁধারে তেমনি রহস্যময়। এমন একটি দিনকে বরণ করবার বুক-ভরা আশা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া কি কম ভাগ্যের কথা!

এখন রাত পোহায় আঁটকুড়ো দিনের মুখদর্শন করে—অর্থাৎ হাড় অযাত্রা। এখানকার এই দিনগুলির কাছে কোনও কিছু প্রত্যাশা করা বৃথা। জীবনের জোয়ালখানা কাঁধে নিয়ে টেনে বেড়াবার এতটুকু অর্থ আছে নাকি এখন! বহুবার পড়া পুরানো-পুঁথির পাতা ওলটানো। না আছে তাতে চমক, না আছে উত্তেজনার রোমাঞ্চ। বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা ভোগ। এর নাম বেঁচে থাকা নয়, শুধু টিকে থাকা। মরা ফুল যেমন গাছের ডালে শুকনো বোঁটা আঁকড়ে ঝুলতে থাকে।

আজ মনের দুয়ারে ভিড় করে এসে দাঁড়ায়—উদ্ধারণপুর শ্মশানের কত কথা, কত কাহিনী। কোন্‌টিকে ফেলে কোন্‌টি বলি! এমন একটি দিনও তখন আসেনি যেদিন কিছু না কিছু কুড়িয়ে পেয়ে তুলে রাখিনি মনের মণি-কোঠায়। সেই সব ভাঙ্গিয়ে এখন এই মরা দিনগুলোর গুজরান হচ্ছে। মহাশ্মশান-উদ্ধারণপুর-ঘাটে-কুড়িয়ে-পাওয়া মনি-মুক্তাগুলির আভা আজও এতটুকু ম্লান হয়নি।

কাটোয়া ছাড়িয়ে গঙ্গার উজানে উঠ্‌তে থাকলে আসবে উদ্ধারণপুর। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর। তাঁরই নামের স্মৃতি বহন করছে

উদ্ধারণপুর। কিন্তু সে কথা কারও মনে পড়ে না। উদ্ধারণপুর বলতে বোঝায় উদ্ধারণপুরের ঘাট। "যত মড়া উদ্ধারণপুরের ঘাটে"—এটা হচ্ছে ওদেশের একটা চলতি কথা। অবাঞ্ছিত কেউ এসে জ্বালাতে থাকলে বিরক্তি প্রকাশ করে এই কথাটা যখন তখন বলা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার যে অংশটুকু গঙ্গার পশ্চিম তীরে পড়েছে, সেখানকার আর বীরভূম জেলার প্রায় ষোল আনা মড়া আসে উদ্ধারণপুর ঘাটে। কাঁথা মাদুর চট জড়ানো, বাঁশে ঝোলানো মড়া দশ দিনের পথ পেরিয়ে আসে উদ্ধারণপুর ঘাটে পুড়তে। ওদেশের নিয়ম, স্বজাতিরা মড়া কাঁধে করে গ্রামের বাইরে একটা নির্দিষ্ট গাছতলায় নিয়ে গিয়ে মুখাগ্নি করবে। মন্ত্র পড়া, পিণ্ডি দেওয়া, এ সমস্ত শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান সেখানেই সেরে ফেলা হবে। তারপর মড়াটিকে নিয়ে যাওয়া হবে উদ্ধারণপুরে গঙ্গায় দিতে। গঙ্গায় দেওয়া যদি সামর্থ্যে না কুলোয় তাহলে আত্মীয়জনের আর আক্ষেপের অন্ত থাকে না। দশবছর আগে যে মরেছে তার জন্যেও শোক করতে শোনা যায়—ওরে বাপ্‌রে, তোকে আমি গঙ্গায় দিতেও পারিনি রে বাপ্।

গঙ্গায় মড়া নিয়ে যাবার জন্যে প্রতি গাঁয়ে দু'-একদল লোক আছে। মড়া বওয়া হচ্ছে তাদের পেশা। কে কোথায় মরোমরো হয়েছে সে খোঁজ তারা রাখে। মরার সঙ্গে সঙ্গে জুটবে গিয়ে সেখানে। তখন দর কষাকষি চলবে। এত বোতল কাঁচি মদ, নগদ টাকা এত। আর যাওয়া-আসায় যে ক'দিন লাগবে সেই ক'দিনের জন্যে চাল ডাল নুন তেল তামাক মুড়ি গুড়! সব জিনিস বুঝে পেলে মড়াটাকে কাঁথায় মাদুরে জড়িয়ে একটা বাঁশে ঝুলিয়ে হাঁটতে শুরু করবে উদ্ধারণপুরের দিকে। এরাই হল কেঁধো। সব জাতের ঘর থেকেই কেঁধোর পেশার লোক জোটে। যে ছেলেটা বখে গিয়ে বাউণ্ডুলে হয়ে গেল, সে আর করবে কি? পরের পয়সায় মদটা ভাঙ্‌টা চলে এমন পেশা বলতে ঐ কেঁধোর পেশার তুল্য আর কোন্ কাজটি আছে! টাকাটা সিকেটা জোটে। পেট ভরে খাওয়াটা ত ফাউ, তার উপর নেশাটা। গাঁয়ে ফিরে একটি ফলারও জোটে বরাতে। যেমন তেমন করে মৃতের পারলৌকিক কর্ম করলেও কেঁধোরা বাদ পড়ে না। মুখাগ্নি হয়ে যাবার পর আর জাতি-বিচারের দরকার করে না। তখন বামুনের মড়াও এদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাসে যদি দু'তিনটে কাজও কপালে জুটে যায় তাহলে কেঁধোদের সচল বচল থাকে সব দিকে।

কিন্তু সব সময় ত আর সেরকম চলে না। হামেশা আর মরছে কটা লোক? একবারের বেশী দু'বার ত আর মরবে না কেউ ভুলেও, একবার মলেই একজনের

মরার পালা সাঙ্গ হয়ে গেল জন্মের মত। তখন আবার আর একজনের দিকে তাকিয়ে কেঁধোদের দিন গুণতে হয়। আর এক একটা লোক জ্বালায় ত কম নয়। ক্ষীরগোবিন্দপুরের ঘোষাল মশাই আজ মরি কাল মরি করে তেরো বছর পার করে তবে এলেন। তেরো বছর একজনের দিকে নজর রেখে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা কি সহজ কথা না কি!

মড়া কাঁধে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে মাঠের পর মাঠ ভাঙ্গতে থাকে কেঁধোরা। রান্না খাওয়ারসব কিছু সঙ্গে আছে। পথে কোথায় থেমে খাওয়াদাওয়া করা হবে তার জন্যে এক একটা আম জাম বট পাকুড় গাছ ঠিক করাই আছে। ঘণ্টা পাঁচ-ছয় সমানে চলে—সেই গাছতলায় পৌঁছে প্রথমে মড়াটাকে টাঙানো হবে সেই গাছের ডালে। নয়ত ওরা যখন ব্যস্ত থাকবে খাওয়াদাওয়ায়—তখন শেয়াল-কুকুরে টানাটানি করবে যে। মড়াটা টাঙিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আশপাশের খানা ডোবা পুকুরে ডুব দিয়ে এসে সকলে রান্নাবান্নায় লেগে যাবে সেই গাছতলাতেই। তার সঙ্গে চলতে থাকবে মদ গাঁজার শ্রাদ্ধ। খাওয়াদাওয়ার পর সেই গাছতলাতে পড়ে লম্বা বেহুঁশ ঘুম। ঘুম ভাঙ্গলে মড়া নামিয়ে নিয়ে আবার হাঁটা। এইভাবে দশ দিনের পথ ভেঙেও মড়া আনে উদ্ধারণপুর ঘাটে।

আবার এরই মধ্যে অনেক রকমের অনেক সব গড়বড়ও হয়। বর্ষার সময় বিচার-বিবেচনা করে মাঠের মধ্যে কোনও নালায় ফেলে দিলে মড়াটাকে। দিয়ে যে যার কুটুমবাড়ী চলে গেল দূর গাঁয়ে। কাটিয়ে এল কটা দিন। প্রাপ্যটা ষোল আনাই মিলে গেল দিকদারি না ভুগে।

আরও নানা রকমের কাণ্ডও ঘটে। তবে সে সমস্ত ব্যাপার হামেশা ঘটে না। উপযুক্ত শাস্ত্র-সঙ্গত আধার পেলে শুরু হয় মড়া-খেলানো। মড়া-খেলানো অতি কঠিন, গুহ্য ব্যাপার। যার তার কর্মও নয়। পাকা লোক দলে থাকলে তবে এ খেলা চলে।

কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপার বড় একটা হতে পায় না। সব মড়াই আর কেঁধোদের হাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় না। আত্মীয়স্বজন সঙ্গে থাকেই। তার পর বড় ঘরের বড় কাণ্ড। খাটে করে মড়া যাবে। সঙ্গে লোকজন-আত্মীয়স্বজন এক পাল। যেন বিয়ের বরযাত্রী চলেছে। এ সমস্ত ব্যাপারে কেঁধোদের যদি ডাকা হয়ও, তবে তাদের পাওনা শুধু টাকা কটাই। এক ঢোঁক মদ বা এক বেলার ফলারও নয়।

সেই বিখ্যাত উদ্ধারণপুরের শ্মশানে যে ঘাট দিয়ে ওদেশের বাপ ঠাকুরদার ঠাকুরদারাও পার হয়ে চলে গেছেন ওপারে, সেই ঘাটেই তখন আমি সাধ করে বাসা বেঁধেছিলাম। ছিলামও কয়েকটা বছর বড় নির্ঝঞ্ঝাটে। একেবারে রাজার হালে আর আমিরী চালে।

শ্মশান গঙ্গার কিনারায়—দক্ষিণে উত্তরে লম্বা। পশ্চিমে বড় সড়ক। সড়ক থেকে নেমে শ্মশানে ঢুকলে দেখা যাবে গঙ্গার জল পর্যন্ত সমস্ত স্থানটুকুময় ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসী, পোড়া কাঠ, বাঁশ চাটাই মাদুর দড়ি আর হাড় গোড় ছড়িয়ে পড়ে আছে। ইয়া হামদা হামদা শিয়ালগুলো আধপোড়া মড়া নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে। দিনের আলোয় সকলের চোখের ওপরেই তাদের খেয়োখেয়ির বিরাম নেই। ওদের চক্ষুলজ্জা বলতে কোনও কিছুর বালাই নেই একেবারে। রক্ত-চক্ষু কেঁদো কেঁদো কুকুরগুলো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারিক্কী চালের মুরব্বী সব, ছোট দিকে নজর যায় না।

একেবারে গঙ্গার কিনারায় জলের ধারে শকুনগুলো পাখা মেলে মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যা খেয়েছে তা হজম না হওয়া পর্যন্ত ওরা পাখায় রোদ লাগাবে।

শ্মশানের:উত্তর দিকের শেষ সীমায়—একটি উঁচু ঢিবি। ঢিবির পেছনেই আকন্দ গাছের জঙ্গল। সেই ঢিবির ওপরেই ছিল আমার গদি।

তোশকের ওপর তোশক, তার ওপর আরও তোশক, তার ওপর অগুণতি কাঁথা লেপ কম্বল চাপাতে চাপাতে আমার সেই সুখাসন মাটি থেকে দু'হাতের ওপর উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। ওখানে গিয়ে প্রথম যেগুলো পেতেছিলাম সেগুলো ক্রমে ক্রমে মাটিতে পরিণত হচ্ছিল। তা হোক না, আমার কি তাতে? আমার ত অভাব ছিল না কোনও-কিছুর। রোজই কিছু না কিছু নতুন জিনিস চড়ছেই আমার গদিতে। কাজেই একেবারে তলারগুলোর জন্যে মন খারাপ হত না।

বনকদমপুরের কুমার বাহাদুরের বুড়ী ঠাকুরমার গঙ্গালাভ হল মাঘ মাসে। আধ হাত চওড়া, হাতের-কাজ-করা কাশ্মীরী শালখানা এসে চড়ল আমার গদির ওপর। দিন কতক ঝুলতে লাগল আমার গদির দু'পাশে সেই অপূর্ব কারুকার্য-করা পশমী শালের পাড়। তার ওপর শুয়ে শরীর-মন-মেজাজ বেশ গরম হয়ে উঠেছে। কয়েকটা দিন কাটতে না কাটতে এসে গেলেন গোঁসাই-পাড়ার সপ্ততীর্থ ঠাকুর মশাই। তাঁর শিষ্য-ভক্তরা প্রভুকে একখানা নতুন

মটকা চাদর চাপা দিয়ে নিয়ে এল। দিলাম চাপিয়ে সেই মোলায়েম মটকাখানা কাশ্মীরী শালের ওপর। শাল নিচে যেতে শুরু করলে। মটকার ওপর শুয়ে মন মেজাজ বেশ মোলায়েম হয়ে আসছে—এমন সময় এলেন পালবাবুদের বড় বৌমা একখানি রক্তবর্ণ বেনারসী পরে। তা বলে বেনারসী পরে চিতায় ওঠা যায় না। বেনারসী ছাড়িয়ে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে নতুন লালপাড় শাড়ী পরিয়ে সিন্দুরে চন্দনে আলতায় সাজিয়ে যখন তাঁকে চিতায় তোলা হল, তখন সেই বেনারসীও এসে গেছে আমার গদীর ওপর। পালবাবুর খোদ শালাবাবু আস্ত পূর্ণাভিষিক্ত কৌল। বিলাতী ভিন্ন দিশী জিনিস ছোঁন না তিনি। তবে আমার কাছে যা পেলেন তা হচ্ছে শোধন করা মহাকারণ। মহাপাত্র পূর্ণ করে মহাকারণ করে গেলেন তিনি। ভাগ্নে-বৌয়ের বেনারসীখানা নিজে হাতে আমার গদির ওপর বিছিয়ে দিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠলেন, "বোম্ কালী শ্মশানওয়ালী, যাকে নিলি তাকে পায়ে ঠাঁই দিস মা।" বলে ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিলেন মহাকারণ।

বেনারসীর ওপর শুয়ে রাতে ঘুম হল না। খস খস করে, গায়ে ফোটে। তার পরদিন বিরক্ত হয়ে তার ওপর চাপালাম একখানি পুরানো কাপড়ের নরম কাঁথা। কাঁথাখানায় বড় যত্নে শাড়ীর পাড় থেকে নানা রঙের সুতো তুলে ছুঁচ দিয়ে ফুল লতা পাতা আঁকা হয়েছে। কতদিন লেগেছে তৈরী করতে ওখানা কে জানে! এবার তার ওপর শুয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

এইভাবেই তখন আমার আমিরী মেজাজ গড়ে উঠেছিল। কোনও কিছুর জন্যই পরোয়া ছিল না তখন। গরজ বলতে কোনও বালাই ছিল না একেবারে। অফুরন্ত ভাণ্ডার—কে কার কড়ি ধারে ?

আমার সেই গদির তিনপাশে দিয়েছিলাম বাঁশ পুঁতে। পর্যাপ্ত বাঁশ, চাঁচা ছোলা পরিষ্কার করা। যে বাঁশে মড়া ঝুলিয়ে আনে তা নাকি পোড়াতে নেই। সে বাঁশ পোড়ালে আর সহজে বয়ে আনবার জন্যে মড়া জুটবে না। কেঁধো বন্ধুরা কায়মনোবাক্যে এ কথাটি বিশ্বাস করত। আর সেইজন্যেই তারা মড়া নামিয়ে বাঁশখানা এনে আগে পুঁতে দিয়ে যেত আমার গদির তিন পাশের দেওয়ালে। ঘরখানির ওপরে চাল দেওয়া হয়েছিল মাদুর আর চাটাই দিয়ে। মাদুরের ওপর মাদুর, তার ওপর চাটাই আর চাটাই। ঘরের ভেতর তিনদিকের বাঁশের দেওয়াল ঢেকে দিয়েছিলাম রঙ-বেরঙের শাড়ী দিয়ে। মাথার ওপর হরদম বদলে বদলে ঝুলিয়ে দিতাম নতুন নতুন চাঁদোয়া। চাঁদোয়াও শাড়ী দিয়ে

বানানো। কোনও কিছুরই অভাব ছিল না কিনা তখন! এতে কার না মেজাজ চড়ে!

খাওয়াদাওয়ার কথা না বলাই ভাল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক কথা একশবার শুনতে হচ্ছে—'বাবা, এটুকু পেসাদ করে দিন?' গণ্ডা গণ্ডা বোতল সামনে নামিয়ে দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে মিনতি করছে—'বাবা, পেসাদ করে দিন।' এক ঢোক করে গিলতে গিলতেও সারাদিনে অন্ততঃ এক পিপে গিলতে হত। তার ওপর গাঁজা। কলকেতে আগুন দিয়েই জোড় হাতে এগিয়ে ধরবে—'প্রভু, ভোগ লাগান।' টান দিতেই হবে একটা। নয়ত ভক্তরা হায় হায় করতে থাকবে। বলবে—'ভৈরবের কিপা পেলুম না।'

বাজার থেকে কিনে আনল লুচি পুরী মেঠাই মোণ্ডা। তাও 'পেসাদ' করে দিতে হবে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে মিলে গেল গঙ্গার ইলিশ। মাছ ভাজা আর গরম ভাত তৈরী হল। কলাপাতা পেতে সামনে সাজিয়ে দিলে আগে। তাও করে দাও প্রসাদ। ডোমপাড়া থেকে দুটো হাঁস কিনে এনে পালক ছাড়িয়ে সেদ্ধ করে ফেললে পেঁয়াজ-গরমমশলা দিয়ে। তার সঙ্গে খিচুড়ী। দাও পেসাদ করে। শ্মশান জাগিয়ে যে বসে আছে সেই ত সাক্ষাৎ ভৈরবের চেলা। প্রথমে তার মুখে না উঠলে অপরে এখানে কিছু মুখে দেয় কি করে!

এইভাবেই কেটেছে তখন আমার উদ্ধারণপুরের সেই মধুর দিনগুলি।

সন্ধ্যা নামবার সঙ্গে সঙ্গে বিলকুল খালি হয়ে যাবে। সবাই নেয়ে ধুয়ে হরিবোল দিয়ে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে বিদায় নেবে। সন্ধ্যার পর আর এক প্রাণীও নামবে না শ্মশানের মধ্যে। তখন যাকে বলে একেবারে রামরাজত্ব। একা আমি সেই মহাশ্মশানের হর্তাকর্তা বিধাতা। হাত পা ধুয়ে এসে নিশ্চিন্তে গ্যাঁট হয়ে বসতাম আমার সেই রাজশয্যার ওপর চেপে। গদির সামনে পড়ে আছে গোটাকতক বোতল আর গাঁজা। রাতের সম্বল।

সামনেই থাবার ওপর মুখ রেখে চোখ বুজে পড়ে থাকত আমার দুই প্রধান সেনাপতি—শুম্ভ আর নিশুম্ভ। ওদের পেটে আর জায়গা নেই। রাত ভোর একভাবে পড়ে ওরা নাক ডাকাবে।

ওধারে আমার প্রজাকুলের মধ্যে খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাচ্ খ্যাচ্ মহা সোরগোল পড়ে যেত। রাজপ্রসাদ নিয়ে কাড়াকাড়ি ছেঁড়া-ছিঁড়ি চলেছে। খুব বেশী

শান্তির ব্যাঘাত হলে সজোরে একটা ধমক দিতাম। আমার শুম্ভ-নিশুম্ভ ঘেউ ঘেউ করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তেড়ে যেত। আবার চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে আসত। ওরা ফিরে এসে থাবার ওপর মুখ রেখে লেজ গুটিয়ে শুয়ে পড়ত।

ছলছলিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। হরিদ্বার হৃষীকেশ দেবপ্রয়াগ, তারও আগে উত্তরকাশী। উত্তরকাশীর ওপরে গঙ্গোত্রী। গঙ্গা নেমে আসছে গঙ্গোত্রীরও ওপরে গোমুখী থেকে। গোমুখী থেকে যাত্রা শুরু করে সমানে চলে আসছে। মুহূর্তের জন্যে কোথাও থামেনি, বিশ্রাম নেয়নি, কোনও দিকে ফিরে তাকায়নি। ওর সঙ্গে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে সময়। সেও থামে না, বিশ্রাম নেয় না, কোন দিকে ফিরেও তাকায় না। ওরা দুজনে তন্দ্রাহারা।

আর তন্দ্রাহারা আমি। কূলে বসে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি গঙ্গার দিকে আর প্রহর গুণি। গঙ্গার ওপার থেকে নাম-না-জানা পাখী উঁচু পর্দায় গলা ফাটিয়ে প্রহর ঘোষণা করে। ওরা আমার রামরাজত্বের সদা-জাগ্রত প্রহরী। একবারও নড়চড় হয় না ওদের প্রহর ঘোষণার। দস্তুরমত আদব-কায়দা-দুরস্ত রাজসিক ব্যবস্থা।

হতভাগা শকুনগুলোই ছিল নেহাৎ ছোটলোক। কোথাও কিছু নেই আরম্ভ হল মড়া-কান্না। টেনে টেনে নাকিস্মুরে করুণ বিলাপ। একজন যদি আরম্ভ করলে ত আর রক্ষে নেই। যে যেখানে আছে তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুর তুলবে। ওপারের তাল গাছের মাথায় চড়ে বসে আছে যারা—তারাও সাড়া দেবে। সহজে সেই অশ্রাব্য গীত কিছুতেই থামবে না।

মাঝে মাঝে মহা স্ফূর্তিতে আমার প্রজাবৃন্দ 'জয় জয়' করে উঠত। হঠাৎ আরম্ভ হল শ্মশানের ভেতর থেকে—ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া হুক্কা হুয়া-হুয়া-হুয়া। গঙ্গার ওপার থেকে ওপারের ওরা সাড়া দিলে। তারপর চারিদিক থেকে সমবেত কণ্ঠে আরম্ভ হল—হুয়া-হুয়া-হুয়া-হুয়া। শেষে রেললাইনের ওধারে বহুদূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল হুয়া-হুয়া-হুয়া-হুয়া।

উদ্ধারণপুরের রাত্রি।

রাত্রি ছায়া-দিয়ে-গড়া কায়াহীনা নিশীথিনী নয়।

আঁখিতে স্বপন-দেখার সুর্মা প'রে যে রজনীরা দুনিয়ার বুকে আসে যায়, সেই ছলনাময়ী অভিসারিণীরা উদ্ধারণপুরের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। তিমির-কেশজালে নিরাভরণ নগ্ন কায়া আবৃত করে যে যামিনীরা নিঃশব্দে আবির্ভূতা হয় উদ্ধারণপুর শ্মশানে, তারা কামনার বিষ থেকে তিলে তিলে গড়ে-ওঠা তিলোত্তমা। সুতিকাগারে জন্ম লাভ করে কাম, বুকে নিয়ে অনন্ত পিপাসা। কিছুতেই শান্তি হয় না সে পিপাসার। শেষ পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয় শ্মশানে। সবই ভস্মীভূত হয় এখানে, ধুয়ে যায় গঙ্গার জলে। শুধু পোড়ে না সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণা। উদ্ধারণপুরের শর্বরীর চক্ষেও সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণা, পীনোন্নত বক্ষে যুগযুগান্তরের নির্লজ্জ লালসা। চুপে চুপে এসে দাঁড়াত আমার পেছনে। উষ্ণ শ্বাস পড়ত আমার পিঠের ওপর। স্পষ্ট শুনতে পেতাম তার প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ। ঝলসানো মাংসের উৎকট গন্ধ ছাপিয়ে তার তনুর সুবাস আচ্ছন্ন করে ফেলত আমায়। সর্বেন্দ্রিয় অবসন্ন হয়ে পড়ত। পেছন থেকে ধীরে ধীরে জড়িয়ে ধরত সেই কামুকী নিশাচরী। তার নগ্ন বক্ষের নিষ্পেষণে আমার দম বন্ধ হয়ে আসত। কী তীব্র মাদকতা তার চক্ষু দুটির অতল চাহনিতে! তার হিমশীতল নগ্ন দেহের নিবিড় আলিঙ্গনের মাঝে তলিয়ে যেতাম।

এখনও গোধূলি-লগ্নে চটুল চরণে আসে সন্ধ্যা। রাত্রির জন্যে যত্ন করে বাসরশয্যা সাজিয়ে দেয়। তারপর করুণ নয়নে একবার আমার দিকে তাকিয়ে ত্রস্তপদে বিদায় নেয়। কিন্তু আসে না রাত্রি। বৃথা-প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে ঢুলতে থাকি। হঠাৎ গভীর নিশীথে তন্দ্রা ছুটে যায়। তখন যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সে সেই উদ্ধারণপুরের উন্মত্তা শর্বরী নয়। এ এক লোলচর্ম পক্ককেশ দন্তহীনা থুত্থুরে বুড়ী। এর বীভৎস মুখ-গহ্বরের মধ্যে কৃতান্তের কুটিল ইঙ্গিত। কোটরে-বসা দুই চক্ষের হিংস্র দৃষ্টিতে নিয়তির নির্মম আহ্বান, শ্বাসপ্রশ্বাসে হারিয়ে-যাওয়া অতীতের জন্যে কুৎসিত হাহাকার। কিছুই দিতে আসে না

আজকের নিঃস্বা বিভাবরী। শুধু নিতেই আসে। সারা রাত এর সঙ্গে এক শয্যায় কাটাবার মূল্য দিতে হয় একদিনের পরমায়ু।

আজও তারা আসে—যারা আসত আমার কাছে উদ্ধারণপুরের শ্মশানে। এসে ভিড় করে দাঁড়ায় আমার চারপাশে করুণ কণ্ঠে মিনতি করে বলে, "চল গোসাঁই, আবার ফিরে চল আমাদের সেই আড্ডায়। তোমার জন্যে গদি পাতব আমরা। বাঁশের দেওয়াল দিয়ে ঘর তুলে দোব, চাটাই আর মাদুর দিয়ে চাল বাঁধব। তুমি আমাদের রাজা ছিলে। আবার তোমায় রাজসিংহাসনে বসিয়ে আমরা তোমার প্রসাদ পাব।"

আসে বিষ্ণুটিকুরীর জয়দেব ঘোষাল, দাড়োন্দার হিতলাল মোড়ল, বাঘডাঙ্গার ছুট্‌কে বাগ্দী। নাকে রসকলি-আঁকা, মাথায় চূড়ো-করে চুল-বাঁধা নিতাই বোষ্টমী আসে মন্দিরা বাজিয়ে। চরণদাস বাবাজী আসে হাতে একতারা নিয়ে। আর আসেন ব্রহ্মবিদ্যা আগমবাগীশ খড়ম খট খট করে। তাঁর পিছু পিছু আসেন টকটকে লালপাড় শাড়ীপরা তাঁর নতুন শক্তি। আগমবাগীশ প্রতিবারই নতুন শক্তি নিয়ে আসতেন শ্মশানে লতা-সাধনা করতে। বলতেন—"জানলে গোসাঁই, বাসি ফুলে পূজো হয় না।" তখন ভেবে পেতাম না এত নতুন ফুল তিনি জোটান কোন্ বাগান থেকে, আর বাসি হয়ে গেলে ওদের জলাঞ্জলি দেনই বা কোথায়!

এখনও মাঝে মাঝে দেখা দেয় একমাথা-কোঁকড়া-চুল রামহরি ডোম আর আধ-বিঘত চওড়া রূপার বিছা কোমরে পরে রামহরির বউ। সঙ্গে নিয়ে আসত তাদের পাঁচ বছরের উলঙ্গ মেয়ে সীতাকে। মেয়েটাকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে রামহরি বলত—"তোমার সেবায় দিলুম গোসাঁই। তোমার পেসাদী ফুল না হলে যে শালা একে ছোঁবে তাকে জ্যান্ত চিতেয় তুলে দোব।" নিজের সুপুষ্ট নিতম্বের ওপর হাতখানা ঘষে মুছে আঁচল থেকে একখিলি পান খুলে দিয়ে রামহরির বউ বলত—"নাও জামাই, মুখে দাও।"

সাড়ে তিন মণ ওজনের মোষের মত কালো রতন মোড়ল আসে। নিজের নাম বলত 'অতন'। চিৎ হয়ে মড়ার মত গঙ্গায় ভেসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অতন মোড়ল দলে না থাকলে সহজে কেউ চাটাই কাঁথা খুলে মড়া বার করে নাচাতে সাহস করত না। অতনকে কেঁধোরা সমীহ করে চলত। অতন মোড়ল

কেউটে সাপের বিষে পোস্ত ভিজিয়ে তাই শোধন করে খেত নেশা করবার জন্যে। লোকটি ছিল ন্যাংটা চণ্ডীর দেয়াসি। তিন তুড়ি দিয়ে ডাকিনী নামাতে পারত।

ঝাড়া পাঁচ হাত লম্বা খন্তা ঘোষ এসে দাঁড়ায় সামনে। একটা বিলিতী সাদা ঘোড়া বার করে তার লম্বা কোটের ভেতর থেকে। তারপর লাল টকটকে উঁচু দাঁত ক'খানা দেখিয়ে বলে—"চালাও গোসাঁই, খাস বিলিতী মাল। তোমার জন্যেই আনলুম। ভোগ লাগাও।" অন্তত বিশবার কান্দি মহকুমার তামাম চিনি মন্ত্রবলে উড়িয়ে দিয়েছিল খন্তা ঘোষ। আবার মন্ত্রবলেই আসমান থেকে সব চিনি আমদানি করে বেচেছিল চল্লিশ টাকা মণ দরে। শেষবার ওরা খন্তাকে নিয়ে আসে চাটাই জড়িয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে। টপ টপ করে রক্ত ঝরছিল চাটাই ফুঁড়ে। তার আগের দিন রাত্রে পাঁচুন্দির শীলেদের বাড়ীর তিনতলার ছাদ থেকে নিচে শানবাঁধানো উঠোনের ওপর লাফিয়ে পড়ে পিণ্ডি হয়ে এল খন্তা ঘোষ। আরও কত লোকই এখন ভিড় করে এসে দাঁড়ায় আমার চারপাশে। সবাই চায়, আবার আমি ফিরে যাই—সেই উদ্ধারণপুরের শ্মশানে। নয়ত ওদের বড় অসুবিধে হচ্ছে। অসুবিধে হচ্ছে গাজনতলার মেলার ঝুমরী মেয়েদের। আমার-দেওয়া মাদুলি না পরলে ওদের গতর ঠিক থাকে না। আর অসুবিধে হচ্ছে কৈচরের বামুনদিদির। পাল-পার্বনে তাঁর যজমানদের নিয়ে তিনি গঙ্গাস্নানে আসতেন। আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতেন অনেকের জন্যে ছেলে-হবার মাদুলি। আবার অনেক বড় ঘরের কুমারী আর বিধবাদের জন্যে অন্য জিনিস। তাদের সঙ্গে করে এনে গঙ্গাস্নান করাতেন বামুনদিদি, তখন আমার পায়ে পড়ত পাঁচসিকে করে দক্ষিণা।

আসে সবাই। টাট্টু চেপে দারোগা আসেন মদ ধরতে। রামহরির ঘরে রাতটা কাটিয়ে যান। রামহরি সে রাতটা মেয়ে নিয়ে আমার কাছে এসে থাকে আর সারারাত ঢক ঢক করে মদ গেলে। পরদিন সকালে রামহরির বউ গঙ্গাস্নান করে এসে আমার সামনে কাঁচা গোবর খায়। গোবর-গঙ্গায় সব শোধন হয়ে যায়।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

পতিতপাবনী মা গঙ্গা কুল কুল করে বয়ে যায় কালো মাটি ধুয়ে নিয়ে।

ঘাটের উত্তরদিকে আকন্দ গাছের জঙ্গলের পাশে উঁচু টিলার ওপর আমার দু'হাত পুরু গদি। সামনে চিতার পর চিতা সাজিয়ে তার ওপর তুলে দিয়ে যায়— ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ী ছোকরা-ছুকরী যুবক-যুবতী। দমকা হাওয়া লেগে এক একবার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে চিতাগুলো। আবার ঝিমিয়ে পড়ে। শিয়ালেরা ছোঁক ছোঁক করে ঘুরতে থাকে। আগুনটা নিভে না এলে এগুতে সাহস পায় না ওরা। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটানে নামিয়ে আনে একটা মড়া। তারপর আর ওদের পায় কে! ছেঁড়া-ছিঁড়ি করে সাবড়ে ফেলতে ওদের বেশী সময় লাগে না। শূন্য চিতাটা জ্বলে জ্বলে নিভে যায়। সাদা হাড় কখানা এধারে ওধারে ছড়িয়ে পড়ে থাকে।

সাদা হাড় আর কালো কয়লা। উদ্ধারণপুর শ্মশানে কোনও ময়লা নেই। বর্ষায় গঙ্গার জল ওঠে শ্মশানে। ভাসিয়ে নিয়ে যায় হাড়গোড় আর পোড়া কাঠ। তখন নেপথ্যে মহাসমারোহ লেগে যায়। পাপী-তাপী জ্ঞানী-মূর্খ মহাপুণ্যবান আর মহাধর্মিষ্ঠের দল স্বর্গারোহণ করে। সবাই হাত-ধরাধরি করে উদ্ধার হয়ে যায়।

আমি ঠায় বসে থাকি গালে হাত দিয়ে আমার সেই দু'হাত পুরু গদির ওপর চেপে। আমার উদ্ধার হয়নি উদ্ধারণপুরে গিয়েও।

আজও বসে বসে মালা গাঁথছি। এ শুধু কথার মালা নয়। চিতার আগুনে-পোড়ানো—কষ্টিপাথরে-কষা সোনার মালা। এ মালা হীরে মুক্তা চুনী পান্না দিয়ে সাজাব আমি। হয়ত চোখধাঁধানো জেল্লা থাকবে না আমার মালায়। তবু এ হচ্ছে সাঁচ্চা জিনিস, মেকী ঝুটার কারবার নয় আমার। উদ্ধারণপুর শ্মশানে যা কুড়িয়ে পেয়েছি তা শহর গাঁয়ের হাটে বাজারে মাথা-খুঁড়ে মলেও মিলবে না। শহর-গাঁয়ে রঙের খেলা। রঙের জলুসে এখানে পচা মালও চড়া দামে বিকোয়। উদ্ধারণপুর শ্মশান একটিমাত্র রঙে রঙিন। সে হচ্ছে পোড়া কাঠ-কয়লার রঙ—যে রঙের মাঝে পড়ে সবরকমের রঙই কালোয় কালো হয়ে যায়

সেই কথাই বলে নিতাই বোষ্টমী। বলে—"বল না গোসাঁই, কি করে এই দেহটাকে একবার ঝলসে নেওয়া যায়। ঝলসে আঙার করে নিতে পারলে আর এটার দিকে চেয়ে কারও জিভ দিয়ে লাল গড়াতো না। গলায় কণ্ঠি পরে নাকে রসকলি এঁকে জীবনটা কাটালাম শুধু মাংস বেচে। আর ভাল লাগে না এই রক্ত-মাংসের কারবার করা। তুমি মজা পাও দিনরাত মাংস পোড়ার গন্ধ শুঁকে। কাঁচা রক্ত-মাংসে তোমার রুচি নেই। চিতায় উঠে আগুনে ঝলসে কালো কয়লা হয়ে যাচ্ছে না দেখলে তোমার মন ওঠে না। তাইত ছুটে ছুটে আসি তোমার কাছে। দাও না গোসাঁই একটা উপায় বলে, যাতে এই হাড় মাস পুড়ে কালো আঙার হয়ে যায়। যা দেখে আর কারও হ্যাংলামো করবার প্রবৃত্তি হবে না।"

তা জিভ দিয়ে লাল গড়াবার মত সম্পদ ছিল বৈকি নিতাই বোষ্টমীর। কাঁচা হলুদের সঙ্গে অল্প একটু চুন মেশালে যে রঙ দাঁড়ায় সেই রঙে রঙিন ছিল নিতাই। তার উপর তার সেই ছোট্ট শরীরখানির বাঁধুনি ছিল অটুট, সব খাঁজ-খোঁজগুলি তীক্ষ্ণ সুস্পষ্ট। পেছন ফিরে চলে গেলে ষাট বছরের তত্ত্বদর্শী মশাই থেকে তেরো বছরের ফচকে ছোঁড়া নাপিতদের হুলো পর্যন্ত সবাই একবার বোষ্টমীর কোমরের নিচে চোখ বুলিয়ে না নিয়ে স্থির থাকতে পারত না! 'জয় রাধে, দুটি ভিক্ষে পাই মা' বলে যখন গেরস্তের দরজায় গিয়ে দাঁড়াত নিতাই, তখন বউ-ঝিরা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত বাড়ীর ভেতর। পিঁড়ি পেতে বসিয়ে মুড়ি নাড়ু খাইয়ে পানের খিলি হাতে দিয়ে জেনে নেবার চেষ্টা করত, কি উপায়ে বুকের সম্পদ বোষ্টমীর মত চিরকাল বজায় রাখা যায়। মাথার চুল অত কালো হয় কি করে? কোমর ছাড়িয়ে চুল নামাবার ওষুধ কি? কি দিয়ে কাজল বানালে বোষ্টমীর মত চোখের পাতা কালো হবে? সবাই খোঁজ করত, ওর কুঁড়াজালির ভেতর পুরুষকে হাতের মুঠোয় পোরবার জড়ি-বুটি লুকানো আছে কিনা।

দশ ক্রোশ পশ্চিমে নান্নুরের কাছাকাছি কোনও গ্রামে ছিল ওদের আখড়া। বাবাজী চরণদাস আখড়া বেঁধেছিল নিতাইকে নিয়ে না নিতাই ঘর তুলেছিল চরণদাসকে নিয়ে তা ঠিক করে বলা অসম্ভব। আখড়া বাঁধবার গরজ যারই আগে হয়ে থাকুক না কেন, আখড়া চালাত কিন্তু নিতাই দাসী। চরণদাস গাঁজা টেনে পড়ে পড়ে ঘুমোত। নেহাৎ কখনও কোনও কারণে ঠেকে

গেলে তার হাতিয়ারের থলেটা নামিয়ে নিয়ে ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ত। মাসখানেক পরে যখন ঘুরে আসত আখড়ায় তখন অন্তত পাঁচ কুড়ি টাকা তার কোমরে বাঁধা। করাত চালিয়ে বাটালি ঠুকে রেঁদা ঘষে জঙ্গলের গাছকে গেরস্ত বাড়ীর দরজা জানালা বানিয়ে ছেড়েছে! নিশ্চিন্তে ঘুমোক এখন গেরস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে। চরণদাসও গাঁজা টেনে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ত। একবার চোখ মেলে দেখবেও না তার বোষ্টমী কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, কি দিয়ে কেমন করে চালাচ্ছে আখড়া।

মাত্র আমার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও ওরা দুজনে একসঙ্গে যাওয়া-আসা করত না। ফোঁটা তিলক কুঁড়াজালি এসব কোনও কিছুরই ধার ধারত না চরণদাস। কোথাও বৈষ্ণবসেবার নিমন্ত্রণ রাখতে যেত না সে। কচি বৈষ্ণবকে ডোর-কৌপীন দেবার সময় কিংবা কোনও আখড়ার মোহন্ত বাবাজীর সমাধি হলে সমাজের সকলের ডাক পড়ত। চরণদাসেরও নেমন্তন্ন হত। কিন্তু কোথাও ও যেত না। ওর খঞ্জনি আর একতারা আখড়ার দেওয়ালে লটকানোই থাকত। মাথার কাছে কলকেটা উপুড় করে রেখে চরণদাস নাক ডাকাতো। সেই চরণদাস কেন যে আসত আমার কাছে তা অবশ্য আন্দাজ করতে পারতাম। দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর ঢালাও গাঁজা টানার সুযোগ আমার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও জুটত না তার। কিন্তু কিসের টানে যে নিতাই আসত উদ্ধারণপুর শ্মশানে, তার হদিস কোনও দিনই পাইনি।

বিস্তীর্ণ চারণভূমি ছিল নিতাইয়ের। জমিদার বাড়ীর অন্দরমহল থেকে ধরম কলুর কুঁড়ে পর্যন্ত সর্বত্র ছিল তার অবারিত দ্বার। তার ভক্তসংখ্যা যে কত তা সে নিজেও বলতে পারত না। মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর আর রামহরি ডোমের ছোট শালা—পঙ্কেশ্বর—সবাই তার চোখের ইশারায় সাপের মাথার মণি আনতে ছুটে যেত। আস্ত পূর্ণাভিষিক্ত কৌল পালবাবুর খোদ শালাবাবু আর বিষ্ণুটিকুরির জয়দেব ঘোষালের ছ'বারের পুঁচকে বউ বোষ্টমীকে দুটো মনের কথা শোনাবার জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে থাকতেন। নিতাইয়ের ডবল লম্বা খন্তা ঘোষ ডাকত তাকে ছোড়দি বলে। চরণদাসের জন্যে কোথা থেকে কাঁচা গাঁজা আমদানি করত সে কে জানে। নিজের বোন বলেই তাকে মনে করত খন্তা। একবার বৈরাগ্যতলার মেলায় ঘুঁষিয়ে পাঁচটা লোকের নাক থেবড়ে দিয়েছিল সে। তারা নাকি বোষ্টমীর নাম নিয়ে রসিকতা জুড়েছিল খন্তার সামনে। সেই দুর্দান্ত খন্তাও বোষ্টমীর কাছে ছোট

ভাইয়ের মত বসে মুড়ি চিবুতে চিবুতে মনের কথা বলত। এ হেন নিতাই কি লোভে শ্মশানে এসে আমার গদির পাশে মাদুর বিছিয়ে বসে এক একবারে পাঁচ সাত দিন কাটিয়ে যেত তা আজও আমার অজানাই রয়ে গেছে।

থুঃ থুঃ করে থুতু ফেলে নিতাই বলে—"খালি পচা পাঁক আর নোংরা জল। জলে রক্তশোষা জোঁক কিলবিল করছে, ছুঁতে গা ঘিন ঘিন করে। কোনও ঘাটে আমার কলসী ভরা হল না গোসাঁই—আমার কলসী শুকনোই থেকে গেল চিরকাল।"

আকাশে একখানা আস্ত চাঁদ ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে বোষ্টমীর দিকে। গঙ্গায় গলানো রূপো টলমল করে বয়ে যাচ্ছে। সেই দিকে চেয়ে একই মাদুরের এক পাশে পা ছড়িয়ে বসে আছে নিতাই, ওপাশে শুয়ে আবলুস-কাঠের-কুঁদো চরণদাস নাক ডাকাচ্ছে। অত গাঁজা টেনেও কি করে স্বাস্থ্যটি বজায় রাখে বাবাজী তা একটা রহস্য বটে!

সেইদিকে দেখিয়ে বলি, "ওই ত পাশেই রয়েছে তোমার কাজলা দীঘি। অমন দীঘির জলেও তোমার মন ওঠে না কেন গো সই?"

আঁচলের বাতাস দিয়ে চরণদাসের ওপর থেকে মশা তাড়িয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে নিতাই। বলে—"আ আমার পোড়া কপাল, এ যে নিরেট পাষাণ গো গোসাঁই। এতে কলসী ডোবাতে গেলে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে যে। শাবল কোদাল চালালেও এক চাঙড় কেটে ওঠানো যাবে না এর তলা থেকে। এই দীঘির পাড়ে কপাল ঠুকে শুধু রক্ত ঝরানোই সার, এক ফোঁটা তেষ্টার জলও মেলে না।"

চেয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। চাঁদের আলোয় ওর মুখখানি বড়ই করুণ দেখাচ্ছে। ওর অনুপম কালো ভুরুদুটি আরও যেন বেঁকে গেছে। ছোট্ট কপালখানি একটু কুঁচকেছে। অনাবৃত সুডৌল কাঁধদুটি দু'পাশে নুয়ে পড়েছে। নিরাভরণ হাত দু'খানি পড়ে আছে কোলের ওপর। নিজের ছড়ানো পায়ের আঙুলের ডগায় নজর রেখে চুপ করে বসে আছে। ওই দেহখানির মধ্যে যেন ডুব দিয়ে তলিয়ে গেছে নিতাই।

গঙ্গার ওপার থেকে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা করা হল। শ্মশানের মধ্যে ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া আরম্ভ হয়ে গেল। ওই ওধারে একেবারে গঙ্গার জল

ছুঁয়ে চিতা সাজিয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময় একটা বুড়ীকে চড়িয়ে দিয়ে গেছে কারা। সেখান থেকে চড় চড় চটাস্ শব্দ উঠছে। সেইদিকে চেয়ে দেখি, বুড়ীটা আস্তে আস্তে খাড়া হয়ে উঠে বসছে জলন্ত চিতার ওপর। তার মুখেও চাঁদের আলো এসে পড়েছে। এতদূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মুখ। চোখদুটোর মধ্যে আর কিচ্ছু নেই। মাংস পুড়ে গিয়ে কপালের আর নাকের সাদা হাড় বেরিয়ে গেছে। ঠোঁট দু'খানাও নেই। দাঁতও নেই একখানি। মুখের গর্তটার মধ্যে জমাট অন্ধকার। ওপর থেকে চাঁদের আলো আর নিচে থেকে আগুনের আভা পড়ে অদ্ভুত রঙ্ খুলেছে বুড়ীর। বুড়ীরও শূন্য চোখের দৃষ্টি তার ছড়ানো-পায়ের আঙুলের ডগার ওপর।

সশব্দে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল এ পাশে। মুখ ফিরিয়ে দেখি বোষ্টমী তার রাশীকৃত চুলে চুড়ো বাঁধছে দু'হাত মাথার ওপর তুলে। সারাদিন তার পরনে থাকে একখানি সাদা থান আর তার তলায় গলাবন্ধ কাঁধকাটা শেমিজ। মাত্র হাত দু'খানি ছাড়া সম্পূর্ণ শরীরটাই থাকে ঢাকা। বোধ হয় গরমের জন্যেই রাত্রে সেমিজটা খুলে ফেলেছে। দু'হাত মাথার ওপর তোলার দরুন দুই বাহু-মূলের পাশ দিয়ে বুকের অনেকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নার রূপালী আলোয় ভয়ানক রকম জীবন্ত পাতলা চামড়া-ঢাকা দুটি রক্ত-মাংসের ডেলা।

আবার মুখ ফিরিয়ে নিলাম। চিতার ওপর বুড়ী সটান উঠে বসেছে। আগুনের লাল আভা পড়েছে তার বুকে। চামড়া মাংস পুড়ে গিয়ে সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে। বীভৎস দৃশ্য—নিজে থেকে দুই চোখ বুজে গেল।

চুড়ো বাঁধা শেষ করে নিতাই বললে, "জল নেই গোসাঁই, কোথাও এক ফোঁটা তেষ্টার জল নেই। কাঁটার জ্বালায় মন বিষিয়ে উঠেছিল ঘরে, তেষ্টায় বুকের ছাতি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। মনে করেছিলাম পথের ধুলায় আছে মুক্তি। আকাশের জল মাথায় পড়লে মনের জ্বালা আর বুকের তেষ্টা দুই-ই জুড়িয়ে যাবে। কে জানত যে সবচেয়ে বড় শত্রু যে আমার, সেও সঙ্গে সঙ্গে পথে নামবে। পথও বিষিয়ে উঠল। কেউই আমায় চায় না। আমার খোঁজে কেউ আসে না আমার কাছে। সবাই আসে আমার এই শত্রুর কাছে। বাপ-মায়ের হাড় মাংস থেকে পাওয়া এই হাড় মাংসের বোঝাটার লোভে সবাই ছোঁকছোঁক করে ঘোরে আমার পেছনে। কানের কাছে ফিসফিস

করে—সোনা-দানায় গা-গতর মুড়ে দেবে, বাড়ী-ঘর দাসী চাকর কোনও কিছুরই অভাব রাখবে না। খেংরা মারি সোনা-দানা বাড়ী-ঘরের মুখে—হ্যাংলা কুকুরের পাল।”

হেসে ফেলি। বলি—“থামকা গালমন্দ দিচ্ছ কেন সই দুনিয়াসুদ্ধ সবাইকে ? সে বেচারাদের দোষ কি ! লোভের জিনিস নাকের ডগায় ঘুর ঘুর করে ঘুরলে কে কতক্ষণ মাথার ঠিক রাখতে পারে। আমারই মাঝে মাঝে লোভ হয়। মনে হয় যা থাকে কপালে, দুর্গা বলে ঝুলে পড়ি তোমার সঙ্গে। তারপর যেখানে হাত ধরে নিয়ে যাবে সেখানেই চলে যাই দু' চোখ বুজে। যা হুকুম করবে তাই করব, সারা জীবন ঘুরতে থাকব তোমার পিছু পিছু।”

ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিতাই জিজ্ঞাসা করলে, “সত্যি বলছ ?”

বললাম, “হ্যাঁ গো—বিশ্বাস হয় না ? আচ্ছা, একবার ডাক দিয়েই দেখ না তু করে।”

“কিসের লোভে ছাড়বে তোমার এই রাজসিংহাসন গোসাঁই ?”

“শুধু তোমায় পাব বলে।”

হঠাৎ বোষ্টমী একেবারে ক্ষেপে গেল। ধাক্কার পর ধাক্কা দিতে লাগল চরণদাসের গায়ে—“ওঠ মোহন্ত, ওঠ শিগ্‌গির। রাজী হয়েছে গোসাঁই। এইমাত্র আমায় কথা দিলে, যাবে আমাদের সঙ্গে। আমরা যেখানে নিয়ে যাব সেখানেই যাবে। আমায় পাবার লোভে গোসাঁই ওই মড়ার বিছানা থেকে নামতে রাজী হয়েছে। আজ আমাদের জয় হল মোহন্ত। ওঠ, চল এবার গোসাঁইকে জোর করে তুলে নিয়ে যাই।”

একবার আড়মোড়া দিয়ে চোখ না খুলেই চরণদাস জবাব দেয়, “কলকেতে আগুন চাপা বোষ্টমী। কোনও লাভ হবে না হুজ্জৎ করে। জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে রাখবি কোন্ খাঁচায় ? ও পাখী কখনও পোষ মানবে না। আবার শেকল কেটে পালিয়ে আসবে।”

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে আমার একখানা হাত ধরে ফেলেছে নিতাই : “নামো, নেমে এস ওখান থেকে। আর ওখানে চড়ে বসে থাকবার কোনও অধিকার নেই তোমার। এই মাত্র কথা দিলে—যা হুকুম করব আমি তাই করবে। হাত ধরে যেখানে নিয়ে যাব সেখানেই যাবে। নামো—চল এখনিই। কথা রাখ তোমার গোসাঁই।” প্রবল উত্তেজনায় আর কিছু বেরুলই না তার গলা দিয়ে।

আচমকা উচ্ছ্বাসের তোড়ে আমিও বাক্যহারা।

চোখ মেলে উঠে বসল চরণদাস। ধরা গলায় বললে, "চল না গোসাঁই, ঐ মড়ার বিছানার মায়া ছেড়ে। যতকাল বেঁচে থাকব তোমার পেছনে ঘুরে বেড়াব ঝুলি বয়ে। এতটুকু কষ্ট অভাব হতে দোব না তোমার। দেখছ ত আমার শরীরখানা। তিনটে অসুরের শক্তি আছে এতে। গতর খাটিয়ে তোমায় খাওয়াব গোসাঁই। মিথ্যে ভড়ং আর নোংরা বুজরুকির এই খোলসটা ছেড়ে বাঁচব। চল গোসাঁই আমাদের সঙ্গে। যেখানে তুমি নিয়ে যাবে সেখানেই যাব আমরা। আজীবন তোমার সেবা করে কাটাব।"

আবার হাসতে হয়। বলি—"লোভ দেখাচ্ছ মোহন্ত? কিন্তু তোমার ত সঙ্গে থাকবার কথা নয়। তেমন কথা ত হয়নি নিতাইয়ের সঙ্গে। নিতাই বলছিল তুমি নাকি একটা শুকনো দীঘি। ও বেচারা তোমার কাছ থেকে এক ফোঁটা তেষ্টার জলও পায় না। তোমার পাড়ে কপাল ঠুকে শুধু রক্ত ঝরানোই সার হচ্ছে ওর। আর পাঁচজনে ওর মাংসের লোভে সোনা-দানা ঘর-বাড়ীর ফাঁদ পাতছে। কাজেই শেষ পর্যন্ত আমিই রাজী হয়ে গেলাম—দেখি, যদি আমায় পেয়ে সইয়ের তেষ্টা মেটে। কিন্তু তুমি সঙ্গে থাকলে যে আমার রস শুকিয়ে যাবে।"

উঠে এসে খপ্ করে দু'হাতে পা জড়িয়ে ধরে চরণদাস।—"তাই কর গোসাঁই, তাই কর। যাও তুমি নিতাইকে নিয়ে। আমি থাকি তোমার ছাড়া গদির ওপর। তাতে আমার কোনও দুঃখ হবে না। তবু যে তোমায় এই লক্ষীছাড়া গদির মায়া ছাড়াতে পেরেছি এ কি কম কথা আমাদের। তোমাকে এখানে ফেলে রেখে গিয়ে আমরা কোথাও শান্তি পাই না। আমরা খেয়ে সুখ পাই না, ঘুমিয়ে শান্তি পাই না। অষ্টপ্রহর তোমার কথা মনে করে জলেপুড়ে মরি। এখানেই আমায় রেখে যাও গোসাঁই। আমি খুব শান্তিতে থাকব। তবু ত জানব কোথাও না কোথাও তুমি সুখে আছ নিতাইকে নিয়ে। তাতেই আমার মনের জ্বালা জুড়োবে।"

তখনও আমার হাত ধরে টানাটানি করছে নিতাই।—"উঠে এস গোসাঁই—আর তোমার একটি কথাও আমি শুনব না। এইমাত্র আমায় যে কথা দিয়েছ, আগে রাখ সেই কথা। নাও আমাকে, নাও এখনিই। আমাকে নিয়ে যা খুশী হয় কর। তবু উঠে এস ওখান থেকে, নয়ত এখনিই ঝাঁপিয়ে পড়ব একটা চিতায়।"

দু'জনের হাত ধরে টেনে পাশে বসাই। বলি—"দেওয়া নেওয়া ত অনেক

দিন আগেই হয়ে গেছে ভাই। আজ আবার নতুন করে সে সব কথা উঠছে কেন? অনেক দিন আগেই ত আমি তোমাদের জিনিস হয়ে গেছি। এমন পাকা জায়গায় রেখে গিয়েও তোমরা শান্তি পাও না কেন? নিজের প্রাণের ধন গচ্ছিত রাখবার এমন ভাল জায়গা আর পাবে কোথায় তোমরা? এখানে না আছে চোর-ডাকাতের ভয়, না আছে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর যেখানেই নিয়ে রাখবে আমায়, সেখানেই গায়ে পাঁক কাদা লাগবার ভয়। এখানে শুকনো ভস্ম, এ গায়ে লাগলেও দাগ পড়ে না। ঝেড়ে ফেললেই ঝরে যায়। তোমাদের এত দামী সম্পত্তি এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ভিড়ের মাঝে রাখলে শেষে খোয়া যাবে যে। নয়ত দেখবে গায়ে কলঙ্কের দাগ লেগে গেছে। এখানে চিতার আঁচে তেতে থাকি বলে গায়ে কোনও দাগ লাগবার ভয় নেই। যতবার তোমরা ঘুরে আস তোমাদের সম্পত্তি দেখতে, দেখ ঠিকই আছে। তোমাদের মনের মতনটি হয়ে আছে। এখান থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে কদিন সামলে রাখতে পারবে ভাই? দেখতে দেখতে রঙ যাবে বদলে, তখন তোমরাই ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।"

চরণদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। বলে—"বোষ্টমী, আগুন দে কলকেতে। খামকা আমার নেশাটা ছুটিয়ে দিলি। এখানে মাথা খুঁড়ে কোনও লাভ হবে না রে। এ একেবারে ছিবড়ে হয়ে গেছে, এতটুকু রসকস আর নেই এই পোড়া কাঠে।"

গঙ্গার এপার ওপার থেকে শেষ প্রহরের শেষ ডাকাডাকি অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। চাঁদখানার রঙ্ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, পেছন দিকে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে বড় সড়কের ওধারে। রাস্তার ওপারের বট পাকুড় গাছের লম্বা ছায়া পড়েছে শ্মশানের ভেতর। বুড়ী তার চিতার ওপর শুয়ে পড়েছে আবার। চিতাটাও প্রায় নিভে এল। ভোরবেলা দু'গ্রাস মুখে দেবার জন্য শুম্ভ-নিশুম্ভ উঠে গেল। একটু পরে হাড়গিলে আর শকুনিরা জেগে উঠে লম্বা গলা বাড়িয়ে ডানা মেলে সব আগলে বসবে। তখন ওধারে এগোয় কার সাধ্য?

বড় সড়কের ওধারে কে সুর তুলছে, "কানু জাগো, কানু জাগো।"

আমার একখানা হাত নিজের কোলের ওপর নিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে নিতাই। হঠাৎ আমার হাতের ওপর দু' ফোঁটা তপ্ত জল পড়ল।

এবার সত্যিই হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম—"এ কি করছ সই? শ্মশানে জ্যান্ত মানুষের জন্যে চোখের জল ফেললে নাকি তার ভয়ানক অকল্যাণ হয়।"

নিতাই রুদ্ধকণ্ঠে ঝাঁজিয়ে উঠল, "হোক—এর চেয়ে এই গদিটায় নুড়ো জ্বেলে দিয়ে এর মালিককে সুদ্ধ পুড়িয়ে রেখে যেতে পারতাম ত শান্তি পেতাম।"

চরণদাসকেই বললাম, "মোহন্ত, তুমিই ভাগ্যবান। চোখের জলের ঝরণা সঙ্গে রয়েছে তোমার। আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ তুমি, কিন্তু কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকলে এ ঝরণা তোমার শুকিয়ে যাবে। অতবড় লোকসান তখন সইবে কেমন করে? আর কি লোভেই বা আমি অমন ভয়ঙ্কর কাজ করতে যাব? এই দুনিয়ার একমাত্র খাঁটি জিনিস—বুকের আগুনে চুয়ানো ঐ চোখের জল; সব চেয়ে দুর্লভ মদ। কেউ কারও জন্যে ও জিনিসের এক ফোঁটাও বাজে খরচ করতে চায় না। আমার ওপর ভেতর এই শ্মশানের ভস্মে ছেয়ে গেছে। এর ছোঁয়া লাগলে সব শুকিয়ে যাবে। জানি না, কি লোভে তুমি আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে চাও। কিন্তু তোমার এই সবুজ লতাটিকে শুকিয়ে মেরে ফেলবার জন্যে আমি কোনও মতেই তোমার সঙ্গ নিতে রাজী হব না।"

আঁচলে চোখ মুছে নিতাই উঠে দাঁড়াল। বললে—"তাই ত বলছিলাম গোসাঁই, পুড়ে কালো আঙার না হলে এই রক্ত মাংসের ওপর তোমার কিছুতেই লোভ হবে না। অনর্থক সারাটা রাত মাথা খুঁড়ে মলাম।"

চরণদাস নিজেই কলকেটা নিয়ে আগুন চাপাতে গেল। ওপারে কিচির-মিচির করে উঠল কয়েকটা পাখী। নিতাই উঠে গেল গঙ্গার দিকে। বোধ-হয় মুখে মাথায় জল দেবে। সামনে আধখানা বোতল পড়েছিল। তুলে নিয়ে গলায় ঢেলে দিলাম। আর একজন জাদুকর দিন আসছে উদ্ধারণপুর শ্মশানে। তাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে তৈরী হলাম।

তখনও নিচেটা ভাল করে ফর্সা হয়নি। বড় সড়ক থেকে হরিধ্বনি শোনা গেল। নামল এসে একজন শ্মশানে।

দুর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে একজন হাতের লাঠিগাছা আর পোঁটলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আছড়ে এসে পড়ল আমার পায়ের ওপর।

"ঠাকুর হেই বাবা, এবারও রক্ষে করতে পারলুম না বাবা। এবারও সোনার পিতিমে ভাসিয়ে দিতে এলুম গো—ভাসিয়ে দিতে এলুম।" বলেই ঢিপ ঢিপ করে কপাল ঠুকতে লাগল পায়ে।

নিচু হয়ে ভাল করে চেয়ে দেখে চিনতে পারলাম--বিষ্ণুটিকুরির জয়দেব ঘোষাল।

গঙ্গার ওপারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একটি মেয়ে।

কপালে শুকতারার টিপ আঁকা, স্বচ্ছ কুহেলী ওড়নায় তনুখানি ঢাকা, বন-হরিণীর চকিত চাহনি চোখে নিশার অভিসারিণী।

উষা। অনিরুদ্ধ আনন্দের মূর্তিমতী প্রাণশক্তি।

ঘুমভাঙানী গান শুনিয়ে ঝরা শিউলির ওপর দিয়ে লঘু চরণে পালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাল কেটে গেল গানের, চরণে চরণ জড়িয়ে গেল, থমকে দাঁড়িয়ে ঘোমটার ভেতর থেকে চোখ মেলে চেয়ে রইল গঙ্গার এপারে।

ও কি! মাদুর জড়িয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে কি এনে নামালে এই জাগরণের পরম লগ্নে! কি বাঁধা আছে ওর ভেতর! কার ভেট বয়ে এনেছে ওরা অত কষ্ট করে!

গঙ্গার এপার থেকে হা হা করে হেসে উঠল দিন, উদ্ধারণপুরের ওস্তাদ জাদুকর। বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে চেঁচিয়ে বললে, "দেখছ কি সুন্দরী থমকে দাঁড়িয়ে? এই দেখ এসে গেছে আমার জাদুর পুঁটলি। এস না এপারে, দাঁড়িয়ে দেখ না আমার জাদুর খেলা। খুলে দেখাচ্ছি তোমায় এই মাদুর চাটাইয়ের ভেতর কি জিনিস লুকানো আছে।"

লজ্জায় সরমে রাঙা হয়ে ছুটে পালিয়ে যায় উষা।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকি বিষ্ণুটিকুরির জয়দেব ঘোষালের দিকে। ওধারে ওরা ততক্ষণে দড়াদড়ি খুলে বাঁশ থেকে ছাড়িয়ে কাঁথা-মাদুরের ভেতর থেকে বার করে মাটির ওপর শুইয়েছে একটি মেয়েকে। মেয়েটির সারা কপাল মাথা সিঁথি ডগডগে সিন্দুরে লেপ্‌টা-লেপ্‌টি, পরনে একখানি লালপাড় কোরা শাড়ী, হাতে শাঁখা, পায়ে আলতা, পরম সৌভাগ্যবতী সধবার সাজ। পাঁচ দিনের পথ

ভেঙ্গে এসেছে, তাই একটু ফোলা ফোলা মুখখানি। দুই চোখ বোজা, অসীম ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে আছে মেয়েটি। বিষ্ণুটিকুরির নৈকষ্য কুলীন জয়দেব ঘোষালের পঞ্চমবারের সহধর্মিণী।

জয়দেব তখনও পায়ের ওপর মুখ ঘষছে আর জড়িয়ে জড়িয়ে কাতরাচ্ছে—"হেই বাবা, তুমিই সাক্ষাৎ ভৈরব গো, জ্যান্ত কালভৈরব তুমি, কিপা কর বাবা—এই অধম সন্তানের ওপর একটু কিপার চোখে চাও। তুমি না দয়া করলে আমার বংশ রক্ষে কিছুতেই হবে না গো, আমার বাপ-পিতামো জল পিণ্ডি না পেয়ে চিরটা কাল টা টা করে মরবে।"

"এবার নিয়ে কবার হল গো ঠাকুর মশাই?"

"হেই রাঙা দিদিমণি যে গো। তা ভালই হল বাপু, তোমাকেও পেয়ে গেলুম এখানে। এবার গোসাঁইকে বলে কয়ে আমার একটা ব্যবস্থা করে দাও গো দিদি ঠাকরুণ। আমার বংশটা যাতে রক্ষে পায়। পাঁচ-পাঁচজনকে এখানে নিয়ে এলুম গো, কেউ আমার মুখের দিকে চাইলে না। হাড় বেইমান বজ্জাতের ঝাড় সব। একটা ছেলেমেয়ে যদি কেউ রেখে আসত তবে আর আমাকে বারবার নিজের হাতে এ গু খেতে হবে কেন? গোসাঁইকে ধরে একটা কিছু উপায় করে দাও গো দিদিমণি, যাতে এবারে যে আসবে আমার ঘরে সে যেন অন্তত একটা ছেলে আমাকে দিয়ে তবে এখানে আসে।"

পা ছেড়ে দিয়ে উঠে বসল জয়দেব। পাঁচদিন অবিরাম মদ গাঁজা টেনে ওর চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ির ভেতর দুর্গন্ধ ময়লা শুকিয়ে রয়েছে। বোধ হয় বমি করে তার ওপর মুখ রগড়েছিল জয়দেব। বউয়ের শোকের জ্বালায় মুখ ধুতে, স্নান করতেও ভুলে গেছে বেচারা। ব্রাহ্মণের ঘরের পাঁচ-পাঁচটি সতী-সাধ্বী স্ত্রীর পতিদেবতা নৈকষ্য কুলীন জয়দেব ঘোষাল আমার সামনে বসে বুক চেপে ধরে হিক্কা সামলাতে আর থুতু ফেলতে লাগল।

"তা এবারে যিনি আসছেন তিনি কার ঘরের গো ঠাকুর মশাই?" বোষ্টমীর কথায় বিষের ঝাঁজ।

অত খেয়াল করবার মত অবস্থা নয় তখন ঠাকুর মশায়ের। এক খেবড়া থুতু ফেলে হাতের পিঠে মুখ মুছে এক গাল হেসে সে আরম্ভ করলে—"তা তুমি চিনবে বৈকি গো রাঙাদিদি। আমাদের ন'পাড়ার হেঁপো রুগী হারাধন চক্কোত্তীর ছোট মেয়ে ক্ষিরি গো। আজকাল বেশ ডাগর-ডোগরটি হয়ে উঠেছে

যে। এ বউ রোগে পড়তে কথাটা একদিন মাকে দিয়ে পাড়ালাম চকোত্তীর কাছে। সহজে কি নচ্ছার হারামজাদা বাগ মানে! শালার ঘরের চালে খড় নেই, পাঁচ বিঘে ভুঁই আর ভিটেটুকু আজ তিন বছর আমার ঘরে বাঁধা রয়েছে। এক পয়সা সুদও আজ পর্যন্ত ঠেকাতে পারেনি ব্যাটা। খালি বসে বসে হাঁপাচ্ছে আর মেয়েকে ঘরে রেখে খুন্নী করছে। ভিটে-ভুঁই সব দখল করে পথে বসাব মোচড় দিলুম। তখন ব্যাটা শয়তানি ছেড়ে সোজা পথে এল।”

এতক্ষণ আমার পেছনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল নিতাই, এবার সামনে এসে দাঁড়াল। স্নান সেরে এসেছে। পিঠ ছাপিয়ে কোমরের নিচে নেমেছে ভিজে চুলের রাশি। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তার দুই চোখে আগুনের ফিনকি ছুটছে।

হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে নিতাই বললে—“এখনি আমরা উঠব গোসাঁই। এবারের মত অনুমতি কর আমাদের।”

“সে কি! এই ত সবে পরশু এলে তোমরা, এর মধ্যে যাচ্ছ কোথায়?”

মোহন্ত চরণদাস বাবাজী মাদুরের ওপর বসে দম লাগাচ্ছিল। আকাশের দিকে মুখ তুলে ধোঁয়াটা ছেড়ে দিয়ে কলকেটা উপুড় করে মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে জবাব দিলে মোহন্ত, “ঠাকুর যেখানে নেন। আমাদের জন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না গোসাঁই। তুমি তোমার রাজসিংহাসনের ওপর বসে শান্তিতে রাজত্ব চালাও।”

মুখ ফেরাতেই আবার নজর পড়ল জয়দেবের ওপর। সামনে বসে বুক চেপে ধরে হিক্কা সামলাচ্ছে আর থুতু ফেলছে। একটু দূরে মাটির ওপর চোখ বুজে পড়ে আছে ওর বউ। রাজ্যের মাছি এসে ছেঁকে ধরেছে তার ফোলা ফোলা মুখখানা। যারা তাকে কাঁধে করে বয়ে এনেছে তারা চারজন পাশে বসে হ্যাংলার মত চেয়ে আছে মেয়েটার দিকে।

হঠাৎ খেয়াল হল যে আমি উদ্ধারণপুরের বিখ্যাত সাঁইবাবা নিজের গদির ওপর চেপে বসে আছি। কিন্তু আমার যা করা কর্তব্য এ সময় তা এখনও করাই হয়নি।

আরম্ভ করলাম গালাগাল। প্রথমে মা বেটীকে অর্থাৎ যার কানে কোনও কিছুই ঢুকবে না কোনওদিন সেই অদৃশ্যা শ্মশানকালীকে। তারপর বেটা কাল-ভৈরবকে। তারপর চোখ বুজে শোওয়া বেইমান বৌটিকে। সে পালা সমাপ্ত করে শ্রীমান জয়দেব ঠাকুরকে।

"শালার বেটা শালা, ফের তুই এ পাপ করতে গেলি কেন রে হারামজাদা? লজ্জা নেই তোর শুয়োরের বাচ্ছা? কতবার তোকে সাবধান করে দিয়েছি রে হারামজাদা যে তোর বংশরক্ষা কিছুতেই হবে না। তবু তুই কেন এ কাজ করতে গেলি রে আঁটকুড়ির বেটা?"

লাল চক্ষু দুটো ঘুরিয়ে কি ইশারা করলে জয়দেব তার সঙ্গীদের। তাড়াতাড়ি তারা দুটো বোতল বার করে সামনে বসিয়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল। জয়দেব আবার উপুড় হয়ে পড়ে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলে।

"ক্ষেপে যেও না বাবা, শাপমন্নি দিও না তোমার অধম সন্তানকে। তুষ্টু হয়ে একটু পেসাদ করে দাও বাবা। তুমি তুষ্টু থাকলে আমার সব হবে গো বাবা, সব হবে। দিনকে রাত বানাতে পার বাবা তুমি, তোমার দয়ায় এবার আমার বংশরক্ষে নিশ্চয়ই হবে। রোখে কার বাবার সাধ্যি।"

জয়দেবের বংশরক্ষে হবেই হবে। রোখে কার বাবার সাধ্যি, শুধু একটু যা আটকাচ্ছে আমার তুষ্টু হওয়া ব্যাপারটার জন্যে। আর তুষ্টু আমাকে হতেই হবে। সে ব্যবস্থা ওরা বাড়ী থেকেই করে এনেছে। ঘরে ভাঁটি নামিয়ে জ্বলন্ত মদ এনেছে কয়েক বোতল। একবার ওর খানিকটা গলা দিয়ে নামলে পর আমি তুষ্টু না হয়ে যাব কোথায়! আর তখন পেসাদ পেয়ে ওরা নাচতে নাচতে গাঁয়ে ফিরে যাবে। সেখানে জিয়ানো আছে আর একটি মেয়ে। যাকে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে আবার আমায় তুষ্টু করতে ফিরে আসবে জয়দেব কিছুদিন পরেই।

জয়দেব আমার বাঁধা খদ্দের। ওকে চটানো কাজের কথা নয়। একটা বোতল তুলে নিয়ে খানিকটা ঢেলে দিলাম গলায়, খাসা মাল। গলা দিয়ে যতদূর নামল, জ্বলতে জ্বলতে নামল।

পেসাদ পাবার জন্যে জয়দেব পা ছেড়ে দিলে। বোতলটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম। তার সঙ্গীরা চিৎকার করে উঠলো—"বোম্ বোম্ হরশঙ্করী মা।" তারপর দু'হাতে নিজেদের দু' কান আর নাকটা মুচড়ে গড় হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকালে।

বড় সড়কের ওপর থেকে চরণদাসের গলা ভেসে এল—

"গুরু—বলে দাও মোরে
কোন্‌খানে সে মনের মানুষ বিরাজ করে।"

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

বিকিকিনির টাট।

পাপ-পুণ্য চরিত্র মনুষ্যত্ব জ্যান্ত মড়া ধড়িবাজ আর ধর্মধ্বজী সব একসঙ্গে সস্তা দরে নিলামে ওঠে সেখানে। নিলাম ডাকেন স্বয়ং মহাকাল—ক্রেতা চারজন। ভবিতব্য, ভাগ্য, কর্মফল আর নিয়তি।

শ্মশানের ঝিরঝিরে বাতাসে, গঙ্গার ঢেউয়ের কুলকুল ধ্বনিতে, চিতার ওপর আগুনের আঁচে মানুষের মাথা ফাটবার কট্ ফটাস আওয়াজে শোনা যায় সেই নিলামের ডাক। সপ্তগ্রামের বণিক-কুলপতি উদ্ধারণ দত্ত মশায় পাকা সদাগর ছিলেন। নিক্তির তৌলে আজও জোর কারবার চলেছে তাঁর ঘাটে। কড়া ক্রান্তি এধার ওধার হবার জো নেই। যিনি নিলাম ডাকেন তাঁর কপালের ওপর আছে তিন-তিনটে চোখ। কার সাধ্য রেহাই পাবে সেই চোখ তিনটিকে ফাঁকি দিয়ে?

বলরামপুরের সিঙ্গীমশায় কিন্তু রেহাই পেয়েছিলেন সে বার। খোল খত্তাল বাজিয়ে ঘটা করে গঙ্গায় দিতে এনেছিলেন তিনি তাঁর বিধবা গুরুকন্যাকে। তিন মহলা সিঙ্গী বাড়ী বলরামপুরে, বাড়ীতে সিংহবাহিনীর নিত্য সেবা। তার সঙ্গে তাঁর গুরুদেবকেও সপরিবারে নিজের বাড়ীতে বাস করিয়ে সেবা চালিয়েছিলেন সিঙ্গীমশায়। গুরু দেহ রক্ষা করলেন, তারপরেও গুরুপত্নী আর বিধবা গুরুকন্যা রয়ে গেলেন তাঁর আশ্রয়ে। কোথায় ফেলবেন অসহায়া বিধবা দুটিকে সিঙ্গীমশায়? তাঁদের রক্ষা করাও ত তাঁর ধর্ম বটে।

ধর্মরক্ষা হল বটে তবে শেষরক্ষাটুকু হল না।

চিতায় আগুন দেবার পরমুহূর্তেই তাঁর জ্ঞাতি ভব সিঙ্গী পুলিশের দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে হৈ হৈ করে ঢুকে পড়লেন শ্মশানে। পুলিশ চিতার ওপর থেকে টান মেরে নামিয়ে নিলে শব। পাঁচ মাস গর্ভবতী ছিল মেয়েটি আর তার নরম তুলতুলে গলায় ছিল দাগ-- বাঁশ দিয়ে নিষ্পেষণ করার স্পষ্ট দাগ ছিল তার গলায়। নতুন গরদের থান পরিয়ে, অজস্র শ্বেত পদ্মে ঢেকে, ধূপ চন্দনকাঠের গন্ধে চারিদিক মাত করে, খই-কড়ি-পয়সা ছড়াতে ছড়াতে, নাম সংকীর্তনের দল সঙ্গে নিয়ে, ঠিক যেভাবে গুরুকন্যাকে গঙ্গায় দিতে নিয়ে আসা উচিত, সেইভাবেই এনেছিলেন সিঙ্গীমশায়। কোনও দিকে এতটুকু

ত্রুটি বিচ্যুতি না হয় সেদিকে ছিল তাঁর কড়া নজর। কিন্তু তিনটে চোখ যে রয়েছে উদ্ধারণপুরের নিলামদারের কপালের ওপর!

কাজেই সব চাল গেল ভেস্তে। চাটাই জড়িয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবেই তারা সদরে সিঙ্গীমশায়ের অত সাধের গুরুকন্যাকে। সেখানে হবে চেরা-ফাড়া। তারপর—

তারপর ভয়ানক চড়া ডাক দিলেন সিঙ্গীমশায়। যার ফলে তাঁর তিনখানা চারহাজারি মহাল হাতছাড়া হয়ে গেল। উদ্ধারণপুরের নিলামদার হল পরাভূত। কিন্তু গুরুকন্যা আর উঠল না চিতায়। গোলমাল চুকে গেলে কারও আর মনেই পড়ল না তার কথা। পড়ে রইল গুরুকন্যা উদ্ধারণপুরের ঘাটে, নরম সাদা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললে শেয়াল-শকুনে। পেটটা ঠোঁট দিয়ে ফেড়ে ভেতরের পাঁচ মাসের ভ্রূণটাকেও তারা রেহাই দিলে না।

ঠিক দু'বছর পরে ছুটকে বার্গদার দল নামালে তাদের কাঁধের বোঝা উদ্ধারণ-পুরের ঘাটে। বিকট দুর্গন্ধে পেটের নাড়িভুঁড়ি মুচড়ে উঠে দম বন্ধ হবার উপক্রম। কপালের ঘাম মুছে বাঁশখানা খুলে নিয়ে পুঁতে দিতে এল ছুটকে আমার গদ্দির দেওয়ালে।

"পেন্নেম হনু গো গোঁসাইবাবা। এক ঢোঁক প্যাসাদ দ্যান।"

বললাম—"আজ ওটা কি আনলি রে ছুটকে—দম আটকে এল যে। আজ-কাল শুয়োর-পচা বইছিস না কি তোরা?"

"হেই—শুয়োর কি গো! ক্ষ্যামা দাও গো বাবাঠাকুর—ক্ষ্যামা দাও ও কথায়। ও যে আমাদের বলরামপুরের সিঙ্গীমশাই গো। তিনদিন ধরে পচেছেন ঘরে শুয়ে। কেউ চাইলে না ছুঁতে মড়া। শেষে বউ ঠায়রেণ বেইরে এসে আমার হাত দু'খানা জইড়ে ধরে কানতে লাগলেন। সে কি কান্না গো গোসাঁইবাবা—বললেন—'ছুটকে, পেটের সন্তান নেই আমার, তোকেই আজ থেকে ছেলে বলে মান্নু, কত্তার হাড় ক'খানা নিয়ে যাবিনে বাবা?' সে কান্না দেখে আর থাকতে পান্নু না গো। মাল কাঁধে তুলে এই সাত কোশ মাটি এক ছুটে পার হয়ে এনু আমরা। নামবার কি জো আছে কোথাও—এমন বাস বেরুচ্ছেন যে গগনের শকুন টেনে নামিয়ে ফেলবে।"

ওরা চারজন—নবাই গোকলো ভূষণো আর ছুটকে। একটা আস্ত বোতল

এগিয়ে দিলাম। ওরা খায় পচুই আর এ হচ্ছে পাকী মাল। এক এক ঘটি জলের সঙ্গে খানিকটা করে মিশিয়ে নিয়ে ঢকঢক করে গলায় ঢালতে লাগল।

শুনলাম সিঙ্গী গিন্নীও আসছেন গরুর গাড়ীতে। তিনি এলে শব চিতেয় উঠবে।

বললাম—"তবে এখন সরিয়ে রেখে আয় ওটাকে। ওই উত্তর দিকের জাম গাছের ডালে লট্‌কে রেখে আয়। দক্ষিণে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে গন্ধ। নয়ত টেঁকা যাবে না যে এখানে।"

ওদের মাল উঠিয়ে নিয়ে গেল ওরা। আবার মড়াপোড়ার সোঁদা গন্ধে চারিদিক মাত হয়ে গেল। বুক ভরে শ্বাস টেনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

গঙ্গার কিনারায় গোটা চার পাঁচ চুলায় ভিয়ান চড়েছে। সব রকম রস পাক হচ্ছে ওখানে—নবরসের রসায়ন তৈরী হচ্ছে। মাথায় গামছা জড়িয়ে ভিয়ানকররা চুলায় খোঁচাখুঁচি করছে বাঁশ দিয়ে। উদ্ধারণপুরের সুয্যি ঠাকুর ঐ ওপরে এসে দাঁড়িয়ে হাঁ করে লোলুপ-দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন ভিয়ানের দিকে। এখানকার জাদুকর চালিয়ে যাচ্ছে তার ভেলকি-বাজির চাল। বোতল বেরুচ্ছে, আগুন চড়ছে বার বার কলকের মাথায় আর কাঠ বইছে রামহরি আর পঙ্কেশ্বর। বল হরি—হরি বোল, হরি হরি বল। হরিবোল দিয়ে আসছে—হরিবোল দিয়ে চলে যাচ্ছে।

হরি গঙ্গা তিল তুলসী এই নিয়েই উদ্ধারণপুরের ঘাট মশগুল। আবার একখানি লাল রঙের ছোট্ট গীতাও অনেকে চাপিয়ে আনে মড়ার বুকের ওপর। যে বুকের ভেতর আগুন নেই, তুষারের মত শীতল হয়ে জমে গেছে যে বুকের ভেতরটা, সেখানেই ঝড় বহাবে গীতার গীতিকা।

অতন মোড়ল হাই তুলতে তুলতে হাতে তুড়ি দিয়ে বলে—এই ত সাক্ষাৎ কাশীক্ষেত গো। গঙ্গার পশ্চিম কুল বারাণসী সমতুল। এঁর তুল্য থান কি আর কোথাও আছেন ?

নেইও।

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ সিদ্ধির চৌকস বন্দোবস্ত রয়েছে উদ্ধারণপুরের

ঘাটে। রক্তে আগুন ধরিয়ে দেবার জন্যে রামহরির বউ এমন মাল জ্বাল দিয়ে নামায়—যা আর কোথাও মেলে না। আর যে দেহের রক্ত জমে শক্ত হয়ে গেছে তাতে আগুন ধরাবার জন্যে রামহরি কাঁধে করে বয়ে আনে মোটা মোটা তেঁতুল কাঠের কুঁদো। তারপর রামহরির শালা পক্কেশ্বরের পালা। তার আছে একখানি রঙিন চৌকো ছককাটা কাপড় আর তিনখানা হাড়ের পাশা। চাঁড়ালের পায়ের হাড় থেকে বানিয়েছে সে পাশা তিনখানা। পক্কা যখন তার ছকখানা গঙ্গার ধারে পেতে ডাক দেয় তখন না গিয়ে থাকতে পারে না কেউ সেখানে। আওয়াজ ওঠে সেখান থেকে—বোম্ কালী নাচনেওয়ালী—চা বেটী একবার মুখ তুলে—শালার হাড়ে ভেলকি খেলিয়ে দি।

ভেলকিই খেলিয়ে দেয় পক্কা ডোম। সকলের সব ট্যাঁক খালি হয়ে সব রেস্ত গিয়ে ঢোকে পক্কার ট্যাঁকে। তাতে যায় আসে না কিছুই। তখন ডাক পড়ে পক্কার দিদিকে। পাঁচ বছরের উদলা মেয়ে সীতাকে নিয়ে এসে দাঁড়ায় সে। পরনে শুধু কস্তাপেড়ে পাতলা একখানি শাড়ী। তার আঁচলখানা বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে শক্ত করে বাঁধা থাকে কোমরে। মাজায় জড়ানো থাকে আধ বিঘত চওড়া রূপোর বিছা। সামনে উবু হয়ে বসে সে টাকা গুণে দেয়। যাকে দেয় সে চেয়েই থাকে। চেয়েই থাকে শুধু ওর দিকে। পাতলা শাড়ীখানা কিছুই ঢাকতে পারেনি। মাংস শুধু মাংস—টাটকা তাজা জ্যান্ত মাংস অনেকটা বয়ে বেড়াচ্ছে পক্কেশ্বরের দিদি।

আধ কুড়ি টাকা পর্যন্ত গুণে দেয় রামহরির বউ। ফিরিয়ে দেবার সময় দিতে হবে মাত্র দু'টাকা বেশী। তা ছ' মাস পরে ঘুরে এলেও তাই দিতে হবে। রামহরির বউ জানে যে এই ধম্মক্ষেতে হাত পেতে নিয়ে কেউ মেরে দেবে না তার টাকা।

সে উপায় নেই। উদ্ধারণপুরের পাওনা দেনা জন্মের শোধ চুকিয়ে দেওয়া যায় নিজে মরে। নয়ত বারবার ঘুরে আসতেই হবে এখানে। আসতেই হবে নয়ত চলবে কি করে আমাদের? শেয়াল শকুন কুকুর রামহরি পক্কা আমি আর ওই ওরা, যারা মনে অঙ্ ধরাবার দোকান খুলে বসেছে ওই বড় সড়কের ওধারে। দরমার খোপ বানিয়ে বাঁশের মাচা পেতে দিয়েছে রামহরি জমিদারের কাছ থেকে জমির বন্দোবস্ত নিয়ে। রোজ সকালে ওদের দিতে হয় মাত্র এক

আনা করে ভাড়া। তা আমাদের এতগুলি প্রাণীর চলবে কি করে যদি বারবার না ঘুরে আসে সকলে?

উদ্ধারণপুর ঘাটের পুরুত ঠাকুর সিধু গাঙ্গুলী দেন দু' আনা করে রোজ। মনে অঙ্ ধরাবার জন্যে যারা বসেছে তাদের ওধারেই একখানা ঘরে দোকান সাজিয়েছেন তিনি। ঘা ধুইয়ে দেন, শ্বেত চন্দনের সঙ্গে বেটে বড়ি খাওয়ান। ডাক দিলে ডাক শোনে সিধু কবরেজের গুলি। তিন দিন তিনটি বড়ি আর এক ভাঁড় করে পাচন খাও—কিন্তু মাছ মাংস পেঁয়াজ ডিম এ সমস্ত চলবে না অন্তত সাত দিন। তারপর যা খুশি চালাও। কিছুদিন পরে আবার ফিরে এসো সিধু কবরেজের কাছে। যত্ন করে ঘা ধুইয়ে বড়ি খাইয়ে দেবেন, আবার একেবারে নবকলেবর পাবে।

নবকলেবর ধারণ করবার আশা নিয়েই লোকে আসে উদ্ধারণপুরের ঘাটে। সারা জীবন জ্বলে পুড়ে আঙার হয়েই আসে। চিতার ওপর সামান্য ঝলসে ওঠে মাংসটা যখন তখন শেয়ালেরা টেনে নামায়। তারপর ওদেরই পেটে চলে যায় সবটুকু। তখন তারা আবার জন্মায় নবকলেবর ধারণ করে।

কিন্তু আবার কি জন্মায় ওরা? সাক্ষাৎ কাশীক্ষেতে গঙ্গায় দিয়ে গেলে আবার জন্ম হয় কখনও? অতন মোড়ল চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে পারে যে সবাই উদ্ধার হয়ে 'সগগে' চলে যায়। আর যারা তা যায় না, তাদের জন্যে অন্য সগ্গের ব্যবস্থা ত করেই রেখেছে এখানে রামহরি।

বিষ্টুটিকুরির জয়দেব ঘোষাল বউকে সগ্গে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে চলে গেল রামহরির তৈরী এই মর্ত্যের সগ্গে। বউটাকে চিতায় তুলে একটা নুড়ো জ্বালিয়ে দিয়ে ওরা উঠে গেল রামহরির সঙ্গে। আজ রাতে ওরা আর ফিরবে না। অঙ্ চড়াবে মনের পর্দায়। ওধারে ত জয়দেবের পথ চেয়ে বসেই আছে হেঁপো রুগী হারাধন চক্কোত্তীর মেয়ে ক্ষিরি।

থাকুক আরও কয়েকটা দিন সে পথ চেয়ে বসে। কিন্তু ছুটকে নবাই গোকলো ভুষণো আর পথ চেয়ে বসে থাকতে পারলে না সিঙ্গী গিন্নীর জন্যে। গাছে-টাঙানো সিঙ্গীমশাইকে আমার জিম্মায় রেখে তারা নেয়েধুয়ে নিজেদের

পথে পা বাড়ালে। নগদ দেড় কুড়ি টাকা আগেই গুণে পেয়েছিল, কাজেই আরও এক রাত সিঙ্গী গিন্নীর অপেক্ষায় বসে থেকে লাভ কি। কাল সেই জলখাবার বেলা হবে তাঁর গরুর গাড়ী এসে পৌঁছতে।

বড়ই নিরাশ হয়ে মুখ আঁধার করে বড় সড়কের ওধারে নেমে গেলেন আকাশের দেবতা। সারাদিন এত ভিয়ান চড়ল উদ্ধারণপুরের ঘাটে কিন্তু কিছুই জুটল না তাঁর ভাগ্যে। শুধু হ্যাংলার মত চেয়ে থাকাই সার হল সারা-দিন। কেউই কিছু নিয়ে যেতে পারে না এখান থেকে। মুঠো মুঠো শুকনো ভস্ম ছাড়া কারও কপালে কিছুই জোটে না এখানে।

গঙ্গার পূবতীরের তালগাছের মাথাগুলো লাল হয়ে উঠেছে। কালো যবনিকাখানি ধীরে ধীরে নেমে আসে রঙ্গমঞ্চের ওপর। চিতার আগুনের আলো আরও লাল আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নিঃসাড়ে পা ফেলে অলক্ষ্যে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে উদ্ধারণপুরের রাত্রি। কুহকিনীর চোখে ভীরু লজ্জা, নিঃশ্বাসে কামগন্ধ, আর্দ্র ঠোঁটে নির্লজ্জ লালসা। থমকে দাঁড়িয়ে সভয়ে দেখছে আমার মুখের দিকে চেয়ে। অনায়াসে কেমন গলগল করে গলায় ঢালছি আমি জলন্ত মদ। সেই জিনিস জলতে জলতে নামছে পেটের মধ্যে। ঢালব গলায় যতক্ষণ হুঁশ থাকবে; অনেকগুলো বোতল আজ ভর্তি পড়ে রয়েছে এখনও। জয়দেব আমার বড় উঁচুদরের খদ্দের। ওর সুদ আদায় করা সার্থক হোক।

এইবার আর একলা নই আমি। সারাটা দিন বড় একা একা মনে হয়। ঐ ত এসে দাঁড়িয়েছে কাছে অভিসারিণী। এইবার ঢুলে পড়ব ওর নরম বুকের ওপর। তিমির-কেশজালে ও আমায় ঢেকে ফেলবে। ওর দেহের অতল রহস্যের মাঝে তলিয়ে যাব। মিশে যাব ওর আঁধার অন্তরের সঙ্গে। তখন আর থাকবে না কিছুই এখানে, উদ্ধারণপুরের রঙ্গমঞ্চের ওপর তখন যে খেলা দেখানো হয় তা দেখবার জন্যে একমাত্র রাত্রি ভিন্ন কেউ জেগে থাকে না।

সেদিনও কেউ সাক্ষী ছিল না সিঙ্গীমশায়ের গুরুকন্যার পক্ষে। শুধু এক ভয়ঙ্করী রাত্রি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছিল। তিন মহলা বাড়ীর কোন এক অন্ধকার ঘরের মধ্যে একান্ত সঙ্গোপনে স্বহস্তে কার্যটি সমাধা করেন সিঙ্গী মশায়। ভোরে রটিয়ে দিলেন হঠাৎ কলেরায় তাঁর গুরুকন্যা দেহত্যাগ

করেছেন। জ্ঞাতি-শত্রু বাদ না সাধলে অত চড়া ডাক দিতে হত না তাঁকে উদ্ধারণপুরের নিলামে। তিনখানা মহালও নিলামে চড়ত না। কিন্তু তাতেও কি তিনি রেহাই পেলেন? অন্তরীক্ষে দাঁড়িয়ে সেই সর্বনাশী রাত্রি মুখ টিপে হাসলে। সেই হাসির জের চলল দু' বছর। নিবিড় আঁধার ঘনিয়ে এল তাঁর জীবনে। দু' বছর মশারির ভেতর শুয়ে কাটাতে হল তাঁকে। সেই মশারীর ভেতর বসে তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গ থেকে একটি একটি করে পোকা বাছতে লাগলেন। খসে গলে পড়তে লাগল নাক কান হাত পায়ের আঙুল। দুর্গন্ধের চোটে তাঁর বাড়ীর ত্রিসীমানা দিয়ে কেউ হাঁটত না। শুধু সিঙ্গী গিন্নী নির্বিকারভাবে মুখ টিপে বসে রইলেন স্বামীর বিছানায়, আর পোকা বাছতে লাগলেন।

এতদিনে শেষ হল তাঁর পোকা বাছা। গরুর গাড়ী এসে পৌঁছল ভোর বেলায়। শাঁখা সিন্দুর পরেই নেমে এলেন সিঙ্গী গিন্নী। স্বহস্তে স্বামীর মুখাগ্নি করে শাঁখা সিন্দূর ভেঙ্গে মুছে ফেলবেন এখানেই। আর এক প্রাণীও তাঁর সঙ্গে আসেনি। মহাপাতক যে—এমন কি একঘরে হবার ভয়ে গাঁয়ের পুরুতে প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র পর্যন্ত পড়ায়নি।

সিঙ্গীমশায়ের সাধ্বী স্ত্রী পাগলের মত মাথা খুঁড়তে লাগলেন, "বলে দাও—ওগো বলে দাও কেউ আমায়—কি করলে ওর প্রায়শ্চিত্তটা করানো যায়।"

জানা নেই কারও প্রায়শ্চিত্তের বিধান। গুরুকন্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে তার গলায় বাঁশ দিয়ে ডলে মেরে ফেললে কি জাতের প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন, তার বিধান হয়ত এখনও কোনও পণ্ডিত লিখে উঠতে পারেননি কোনও পুঁথিতে। পুরো দু'বছর বিছানায় শুয়ে যে প্রায়শ্চিত্ত চালাচ্ছিলেন সিঙ্গীমশায় তার ওপরেও আরও কিছু করবার আছে কিনা, তাই জানবার জন্যে তিনি সদা সর্বক্ষণ আকুলি বিকুলি করতেন। কেউ জানে না, কেউ বিধান বলে দিতে পারেনি তাঁকে।

হয়ত জানতে পারেন আমাদের সিধু ঠাকুর। তাঁকেই ডাকা হল। তিনি এসে দান করলেন প্রায়শ্চিত্তের শাস্ত্রীয় বিধান।

একটি সবৎসা গাভী দান করতে হবে। সেই গাভীর ভাত খাবার জন্যে থালা গেলাস বাটি চাই। তা ছাড়া গাভীর শয্যা বস্ত্র পাদুকা ছত্র সবই প্রয়োজন! মন্ত্র পড়ালেন সিধু কবরেজ সিঙ্গী গিন্নীর হাতে তিল তুলসী গঙ্গাজল দিয়ে—"ইদং সালঙ্কারা সবৎসা ও সবস্ত্রা শয্যা পাদুকা ছত্র ভোজ্য গামছা

সহিতং গাভীমূল্যং ব্রাহ্মণাহং দদামি।" তারপর স্বামীর জন্যে মস্তক মুণ্ডন করলেন সিঙ্গী গিন্নী, পঞ্চ গব্য পান করলেন। কিন্তু চিতায় উঠল না সিঙ্গী-মশায়ের পচা দেহখানি, গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হল। গোটাকতক কলা গাছ নিয়ে এল পঙ্কা। সেগুলো এক সঙ্গে বেঁধে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল সিঙ্গী-মশায়কে। তারপর বুঝে নিন কলুষনাশিনী মা গঙ্গা। গাভীর মূল্য আর বস্ত্র পাদুকা ছত্র শয্যা দক্ষিণা ইত্যাদি বাবদ মাত্র বিয়াল্লিশটি টাকা গ্রহণ করলেন সিধু কবরেজ। রামহরি অবশ্য সম্পূর্ণ চিতার খরচই পেলে। জলে ভাসিয়ে দিলেও চিতার খরচ দিতে হয়।

পার হয়ে গেলেন সিঙ্গীমশায় সিধু পুরুতের সজীব মন্ত্রের জোরে। যথাসময়ে কৈচরের বামুনদিদির শরণাপন্ন হলে নির্বিঘ্নে পার হয়ে যেতেন অনেক আগেই। কাকে-বকে টের পেত না কিছুই। অনেক বড় ঘরের বড় কথা জমা আছে বামুন দিদির পেটে। তাঁর বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না।

সিঙ্গী গিন্নীও কম পাকা নন। সেদিন রাত্রে তাঁরও বুক ফেটেছিল কিন্তু মুখ ফোটেনি। নিজের বাড়ীর অন্দরমহলে যে খেলা খেলেছিলেন তাঁর স্বামী, তাতে তাঁর হাত ছিল না বটে তবে মুখ ফুটিয়ে তিনি বাধাও দিতে যাননি। বরং তাঁর বুকের জ্বালা কিছুটা হয়ত জুড়িয়েছিল। চোরকুঠরিটার বাইরে দাঁড়িয়ে একবার তিনি সামান্য চাপা আর্তনাদও শুনেছিলেন। তারপর নিজের হাতেই সযত্নে ফুলে চন্দনে সাজিয়েছিলেন গুরুকন্যাকে, নিজের হাতেই গুরু-ঠাকুরুণকে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিলেন। সবই সেদিন করেছিলেন স্বামীর জন্যে, স্বামীর নাম মান বাঁচাবার জন্যে। আর তা করাও তাঁর কর্তব্য, নয়ত তিনি কেমন করে নিজেকে সিঙ্গীমশায়ের উপযুক্ত সহধর্মিণী বলে পরিচয় দেবেন।

তারপর তাঁর অত বড় বাড়ী-ভর্তি আত্মীয়স্বজন আশ্রিত-আশ্রিতার দল যখন একে একে বিদায় নিলে, সারা বাড়ীটা খাঁ খাঁ করতে লাগল, আর সন্ধ্যা হলেই সেই চোরকুঠরিটার ভেতর থেকে নানারকম অদ্ভুত শব্দ বার হতে লাগল, তখনও তিনি মুখ বুজে পড়ে রইলেন সেই বাড়ীতে। সাধ্বী-স্ত্রীর কর্তব্য করে গেলেন মশারির ভেতর বসে—স্বামীর দেহ থেকে পোকা বেছে। আজ তাঁর সব কর্তব্যের শেষ হল এখানে, স্বামীর সঙ্গেই তিনি জন্মের-শোধ বেরিয়ে এসেছেন সেই বাড়ী থেকে। আর ফিরবেন না সে বাড়ীতে, ফেরবার উপায়ও নেই।

শাঁখা সিন্দুর ঘুচিয়ে মাথা মুড়িয়ে থান পরে আমার সামনে এসে বসলেন তিনি। তাঁর দিকে চেয়ে মনে হল এবার জুড়িয়েছে তাঁর বুকের জ্বালা, নিভে গেছে যে চিতাটা তাঁর বুকের মধ্যে হু হু করে জ্বলছিল। দুঃখ শোক উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই তাঁর চোখে মুখে কোথাও। যেন মস্তবড় একটা দেনাপাওনা মিটিয়ে ফেলে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে এলেন। বড় ঘরের মেয়ে তিনি, বড় ঘরের বৌ। বয়সও এমন কিছু বেশী হয়নি তাঁর, শরীরের বাঁধুনিও নষ্ট হয়নি তেমন। যে বয়সে মেয়েরা মেয়ে জামাই ছেলে বৌ নিয়ে জাঁকিয়ে সংসার করেন সেই বয়স তাঁর।

কিন্তু কিচ্ছু নেই, পেছন ফিরে তাকাবার মত কোনও আকর্ষণ নেই তাঁর। তাই আর ফিরবেন না তিনি, এগিয়েই চলবেন সারা জীবন।

বললেন—"গাড়ী ত অনেকক্ষণ ফিরে গেছে বাবা। ওতে আর আমার দরকার নেই। পা দুটোই ত রয়েছে, এতদিনে ঘুচেছে পায়ের বেড়ি। এবার শুধু হাঁটব। যেখানে নিয়ে যাবে এই পা দু'খানা সেখানেই যাব। আর কোনও খাঁচায় ঢুকছি না আমি।"

তারপর যা বললেন তা শোনাবার জন্যে আমার কান দুটো তৈরী ছিল না একেবারে। দু'হাত জোড় করে বললেন—"এবার দয়া করে আমায় একটু প্রসাদ দিন বাবা।"

"প্রসাদ! কি প্রসাদ?"

"ঐ যে রয়েছে বোতল-ভর্তি আপনার সামনে। দিন বাবা দিন, একটু জুড়োক বুকের ভেতরটা। আজ কতদিন গলা দিয়ে এক ফোঁটা জলও নামে নি। দয়া করুন এই হতভাগী মেয়েকে।"

দিলাম।

হাতে তুলে দিলাম একটা বোতল। তারপর হাঁ করে চেয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে। বলরামপুরের সিঙ্গী বাড়ীর বড় বৌ, যাঁর রূপের খ্যাতি ও-তল্লাটে একদিন লোকের মুখে মুখে ছড়াত, ষোল বেহারার পালকির মধ্যে বসে যিনি চলাফেরা করতেন একদিন, তিনি উদ্ধারণপুরের ঘাটে বসে সকলের চোখের সামনে অনায়াসে বোতলটা গলায় ঢেলে দিলেন। শ্মশানসুদ্ধ সবাই কাঠ হয়ে চেয়ে রইল নতুন থান-পরা মাথা-কামানো সদ্য বিধবার দিকে। আর যারা মরে কাঠ হয়ে পড়ে ছিল তারাও যেন একটু নড়েচড়ে উঠল চিতার ওপর।

শিপ্রা নদীর তীরে মহাকালের বিরাট ঘণ্টাটা বাজছে। চিতাভস্মে স্নান হচ্ছে এখন মহাকালের। প্রত্যহ একটি শব পুড়বেই উজ্জয়িনীর শ্মশানে। সেই ভস্ম এনে প্রত্যহ মাখানো হয় মহাকালকে। ঘি গঙ্গাজল চন্দন—কিছু লাগে না তাঁর স্নানে, লাগে মানুষ-পোড়া ছাই। কেউ জানে না সেই স্নানের মন্ত্র।

হয়ত তারা জানে, যারা এখন নিশ্চিন্তে বাড়ছে নারীর গর্ভকোষের মধ্যে ঘোর অন্ধকারে। সেই অন্ধকার ছেড়ে আলোয় শুভাগমন করলেই সব যায় ঘুলিয়ে। ভুলে যায় মহাকালের মহামন্ত্র। যোনিদ্বার দিয়ে এই জগতে পদার্পণ করেই তাই ককিয়ে কেঁদে ওঠে মানুষ।

ব্রহ্মবিদ্যা আগমবাগীশ স্তব পাঠ করতে করতে বড় সড়ক থেকে নেমে আসছেন।

ওঁ যোনিরূপে মহামায়ে সর্বসম্পৎপ্রদে শুভে।
কৃপয়া সর্বসিদ্ধিং মে দেহি দেহি জগন্ময়ী।
সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি-সমন্বিতে।
কৃপয়া সর্বসিদ্ধিং মে দেহি দেহি জগন্ময়ী।
মহাঘোরে মহাকালী কুলাচারপ্রিয়ে সদা।
কৃপয়া সর্বসিদ্ধিং মে দেহি দেহি জগন্ময়ী।
যোনিরূপে মহাবিদ্যে সর্বদা মোক্ষদায়িনী।
কৃপয়া সর্বসিদ্ধিং মে দেহি দেহি জগন্ময়ী।
হে যোনে হর বিঘ্নং মে সর্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে।
আধারভূতে সর্বেষাং পূজকানাং প্রিয়ং বদে।
স্বর্গপাতালবাসিন্যৈ যোনয়ে চ নমো নমঃ।

আগমবাগীশের গলায় খোলে ভাল স্তোত্রটা। গমগম করতে লাগল উদ্ধারণপুরের রঙ্গমঞ্চ। রামহরি পঙ্কা বয়ে নিয়ে এল তাঁর মোট ঘাট। উত্তর দিকের বড় পাকুড় গাছের তলায় মস্ত বড় বাঘছাল বিছিয়ে বসলেন তিনি। বাঁয়ে বসলেন তাঁর শক্তি, সামনে সিন্দুর মাখানো ত্রিশূল পুঁতে।

রামহরির বউকে ডেকে খোঁজ নিলাম কত মাল মজুদ আছে ঘরে, ভাঁটি নামবে কবে। হাতের কাছে তখনও যে দুটো বোতল বসানো ছিল তা-ই নিয়ে নেমে গেলাম গদি থেকে। সিঙ্গী গিন্নী একভাবে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসেই রইলেন সেইখানে।

উদ্ধারণপুরের আকাশ।

ছায়াপথে ঘুরে ফেরেন মায়াবিনী দুই যমজ ভগিনী।

বাসনা আর বঞ্চনা—দুই চিরজাগ্রতা দেবী উদ্ধারণপুর শ্মশানের। গঙ্গার কাকচক্ষু জলে ধরা পড়ে তাঁদের প্রতিবিম্ব, যা দেখে ওঁরা নিজেরাই সভয়ে শিউরে ওঠেন। অবিরাম চিতার ধোঁয়া লেগে লেগে কালোয় কালো হয়ে গেছে ওঁদের মুখ। সেই পোড়া মুখ নিয়ে কেমন করে আর লোকের মন ভোলাবেন তাঁরা!

কালামুখীদের মুখে হাসির আলো ফোটাবার আয়োজন হয়েছে। উদ্ধারণ-পুরের ঘাটের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাঁদের পূজার মন্ত্র—

"শুধ্যন্তাং শুধ্যন্তাং শুধ্যন্তাং—"

নিশীথ রাতের গোপন অনুষ্ঠান—রহস্যপূজায় বসেছেন আগমবাগীশ শ্মশানের ঈশান কোণে। রক্তবস্ত্র পরে, জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে তাঁর শক্তি আসন গ্রহণ করেছেন তাঁর বামে। সামনে শ্রীপাত্র গুরুপাত্র যোগিনীপাত্র ভোগপাত্র আর বলিপাত্র স্থাপন করা হয়েছে।

একে কৃষ্ণাষ্টমী তায় মঙ্গলবার। মোক্ষম যোগাযোগ মিলে গেছে আগম-বাগীশের। মন্ত্রপাঠ করছেন—তত্ত্বশুদ্ধি হবে মন্ত্রের অমোঘ শক্তিতে।

ওঁ প্রাণাপানব্যানোদানসমানা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা
ভূয়াসং স্বাহা।

আমার প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান শোধন হোক, রজগুণশূন্য পাপ-শূন্য জ্যোতিঃস্বরূপ হই যেন আমি।

জ্যোতিঃস্বরূপ হবার প্রধান উপচার আস্ত এক ভাঁটি টিনে ভরে এনে দিয়েছে রামহরি ডোম। সাধক মানুষ সেও, বউকে একখানি রক্তবর্ণ কাপড়

পরিয়ে নিয়ে এসেছে সঙ্গে। মেয়েটাকে রেখে এসেছে পঙ্কেশ্বরের কাছে। আজ রাতে পঙ্কাও ঢুকতে পাবে না শ্মশানে। পঙ্কা হচ্ছে অনধিকারী শক্তিহীন পশু। অবশ্য আমিও তাই। আমারও শক্তি নেই, সুতরাং অধিকার নেই রহস্যপূজায় বসবার। কিন্তু আগমবাগীশ আশা রাখেন যে একদিন আমার পশুত্ব ঘুচবে। বীরভাব জাগবে আমার প্রাণে, সেদিন আমিও একটি শক্তি জুটিয়ে নিয়ে লেগে যাব শোধন-ক্রিয়ায়। তাই আমাকে একরকম জোর করে এনে বসিয়েছেন আগমবাগীশ ওঁদের সামনের আসনে।

বসে আছি আর বেশ বুঝতে পারছি অনেকে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাদের। আজ সন্ধ্যায় উদ্ধারণপুরে পৌঁছে চিতায় উঠে শুয়েছিল যারা, তারা চিতা থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের চার পাশে। দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছে আগমবাগীশের শোধন করার মন্ত্রপাঠ আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে চিতাগুলো থেকে। দুনিয়ার আলো বাতাস আনন্দ ভালবাসা বিষাক্ত করে তুলেছিল ওদের পঞ্চপ্রাণ। শেষ পর্যন্ত সেই অশোধিত নোংরা প্রাণের মায়া কাটিয়ে ওরা পালিয়ে এসেছে উদ্ধারণপুর শ্মশানে। পালিয়ে এসেছে এই আশা বুকে ভরে নিয়ে যে চিতার আগুনে সব শোধন হয়ে যাবে।

কিন্তু তা হবে না, হতে পারে না শোধন চিতার আগুনে। কি করে চব্বিশ তত্ত্বের শোধন করা যায় তার গুহ্য তত্ত্ব জানেন আগমবাগীশ। জানেন তিনি অনেক বিশুদ্ধ মন্ত্র, যে মন্ত্রের আগুনে পুড়িয়ে নিলে অশোধিত তত্ত্বগুলি পাকা হয়ে যায়। আর তখন সেই পাকা তত্ত্বগুলিকে নিয়ে চিতায় চড়লে চিতা থেকে বিষাক্ত কালো ধোঁয়া উঠে আকাশের মুখ কালোয় কালো হবার ভয় থাকে না।

ওঁ পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশানি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।

ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম শোধন হয়ে গেল।

এধারে প্রথম প্রহর শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। উদ্ধারণপুরের আকাশের কালো চোখ আরও কালো হয়ে উঠল, আমার সামনে বসা আগমবাগীশের

শক্তির নিবিড় কালো চোখ দুটির মত। লালে লাল হয়ে আছেন আগমবাগীশের শক্তি। তার মধ্যে বড় বেমানান দেখাচ্ছে হাড়ের মত সাদা ওঁর হাতের শাঁখা দুটিকে। শাঁখাপরা হাত দু'খানির আঙুলে জড়াজড়ি লেগে গেছে। আবার মাঝে মাঝে কাঁপছে হাত দু'খানি। কেঁপে উঠছে তাঁর সারা দেহখানিও। যেন ভিতর থেকে কে ঝাঁকানি দিচ্ছে ওঁকে। ঝাঁকানির চোটেই বোধ হয় ওঁর কালো চোখ দুটিতে ফুটে উঠেছে একটা অজানা আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা। আগমবাগীশের এবারের শক্তিটি নেহাৎ কাঁচা, বলির পশুর দৃষ্টি ওঁর কাজল-কালো অবোধ চোখে।

ওঁ প্রকৃত্যহঙ্কারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রাণি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা।

প্রকৃতি অহঙ্কার মন বুদ্ধি আর শ্রোত্র শুদ্ধ হোক।

হওয়াই একান্ত প্রয়োজন, নয়ত কেমন যেন ধাঁধাঁয় পড়ে যাচ্ছি। আগমবাগীশের শক্তির চক্ষু দুটিই করছে সর্বনাশ, আমার অহঙ্কার মন বুদ্ধিকে কিছুতেই ঘুমোতে দিচ্ছে না। ওঁর ওই অতল চোখের চাহনি যেন অনবরত খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তুলছে আমার প্রকৃতিকে। সামনে বসানো ঘৃত-প্রদীপের উজ্জল শিখাটি অল্প অল্প নাচছে। তার ফলে যেন ঢেউ খেলছে ওঁর শরীরের শীতল শ্যামলতায়। বেশ একটি সকরুণ আবেদন আছে ওঁর মেটে মেটে বর্ণের। যেন মৌন মিনতি জানাচ্ছে—এস, নামো, ডুব দাও। ডুব দিয়ে দেখ জুড়োয় কিনা গায়ের জ্বালা।

সুতরাং ঐ আপদগুলোকে আর একবার ভাল করে শোধন করবার জন্যে হাত বাড়ালাম। একটা মস্ত বড় মাথার খুলিতে ভর্তি করে আগমবাগীশের মন্ত্রগুণে শোধন-করা এক পাত্র কারণ হাতে তুলে দিলে রামহরি। এইটিই বোধ করি পঞ্চত্রিংশৎ পাত্র আজ সকাল থেকে গণনা করলে। রামহরির বউ উঠে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে—"এবার ক্ষ্যামা দাও জামাই।" কি রকম যেন কাকুতি ফুটে উঠল ওর গলায়।

হাঁ—ক্ষ্যামাই দোব এবার। এই পাত্রটিকে শেষ করে—এই রাতের মত ক্ষ্যামা দোব। এই শোধন করা পাত্রটি শেষ করলেই শোধন হয়ে যাবে আমার চব্বিশ তত্ত্ব। তখন ঘুমিয়ে পড়ব। ঢলে পড়ব বিস্মৃতির কোলে। বিস্মৃতি উদ্ধারণপুরের কুহকিনী নিশাচরী।

কিন্তু আজ ত সে আসেনি। এসে দাঁড়ায়নি সে আমার পিছনে। আজ আমার পিছনে হাঁটুতে মাথা গুঁজে ঠায় চব্বিশ ঘণ্টার ওপর বসে আছেন যিনি তিনি কিছুতেই নড়বেন না সেখান থেকে। আজ সন্ধ্যাবেলায় যখন আমি আমার গদি ছেড়ে এসে বসলাম চক্রে, সিঙ্গী গিন্নীও সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে বসলেন আমার পিছনে। ভাগ্য ভাল তাঁর যে চক্রে অনধিকারিণীর উপস্থিতি গ্রাহ্য করলেন না আগমবাগীশ।

সামনে আগমবাগীশের শক্তি আর পিছনে বলরামপুরের সিঙ্গী বাড়ীর সদ্য-বিধবা বউ। এ অবস্থায় পড়লে পঞ্চত্রিংশৎ পাত্রের পরেও চব্বিশ তত্ত্বের নাড়ীর স্পন্দন কিছুতেই বেচালে চলে না। পাত্রটা প্রায় শেষ করে বাকিটুকু সিঙ্গী গিন্নীকে প্রসাদ দিলাম। ঠেলা দিয়ে তুলে পাত্রটা ধরিয়ে দিলাম তাঁর হাতে। বিস্তর পচা বিষ জমা হয়ে আছে ওঁর মনের মধ্যে। ভাল করে ধুয়ে সাফ হয়ে যাক্ উদ্ধারণপুরের পাকা ভাঁটির শোধন-করা তরল আগুনে।

ওঁ ত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবচাংসি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা।

গণ্ডারের মত পুরু কি আগমবাগীশের গায়ের ত্বক! ওঁর চক্ষু দুটিতে কিসের আগুন দপ দপ করে জ্বলছে! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওঁর লকলকে জিহ্বাটি। সেই জিহ্বা দিয়ে উনি ওর পাশে-বসা শক্তির সর্বাঙ্গ লেহন করছেন যেন। উদ্ধারণপুর ঘাটের মাংস পোড়ার গন্ধ আগমবাগীশের থ্যাবড়া নাকে প্রবেশ করে না। ওর শক্তির মেটে মেটে রঙের সজীব মাংসের ঘ্রাণ পান উনি নাকে। মুখ ব্যাদান করে তিনি বিশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। আমার শুম্ভ-নিশুম্ভ কান খাড়া করে শুনছে ওঁর সজীব মন্ত্র-উচ্চারণ।

"ওঁ পাণিপাদপায়ূপস্থশব্দা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা।

"ওঁ স্পর্শরসরূপগন্ধাকাশানি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা।

"ওঁ বায়ুতেজঃসলিলভূম্যাত্মানো মে শুধ্যন্তাং জ্যোতরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা।"

গঙ্গার ওপারে আকাশ থেকে একটি তারা খসে পড়ল। তীর বেগে নামতে নামতে হঠাৎ গেল মাঝপথে মিলিয়ে। এপারে ঐ ওধারের শেষ চিতাটা থেকে ছিটকে পড়ল একখানা জ্বলন্ত কাঠ। অনেকগুলি স্ফুলিঙ্গ লাফিয়ে উঠল আকাশের দিকে। কিছু দূরে উঠে ওরাও মিলিয়ে গেল। আকাশ থেকে যে নেমে এল সে পেল না মাটির স্পর্শ, আর আকাশ ছুঁতে উঠল যারা তারা পেল না আকাশের নাগাল। মহাশূন্য সবই গ্রাস করল।

আমাকেও।

অসীম অনন্ত আকাশ।

অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র মহাবেগে অবিরাম ঘুরে মরছে আপন আপন কক্ষপথে। কেন? কেন তা কেউ জানে না। কেউ বলতে পারবে না কিসের টানে ওরা ঘুরছে, কার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে ওদের ঐ নিরন্তর আবর্তনে।

ক্ষীরোদ সাগর। নিস্তরঙ্গ অবিক্ষুব্ধ অচেতন। শেষনাগ সহস্র ফণা বিস্তার করে ভাসছে। অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত অনন্তদেব, অতি সন্তর্পণে পদসেবা করছেন মহালক্ষ্মী।

সহস্র মুখে সহস্র ফণা দিয়ে বিষাক্ত শ্বাস ত্যাগ করছে নাগেশ নারায়ণের মুখের ওপর। তারই বিষক্রিয়ায় বিশ্বম্ভর আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে আছেন। কালকূটের প্রমত্ত প্রভাবে সর্বাঙ্গ নীল হয়ে গেছে তাঁর। সেই নীলাভায় মহাব্যোম নীলে নীল হয়ে আছে। তার মাঝে উঠেছে প্রলয়ঙ্কর ঝড়। সেই ঝড়েও বাসুকির সহস্র ফণা-নিঃসৃত হলাহলের নিশ্বাস। কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র সেই বিষের মাঝে পড়ে বিষের নেশায় মত্ত হয়ে দুর্নিবার গতিতে অনন্তকাল আবর্তিত হচ্ছে

বহুদূর থেকে ভেসে আসছে আকুল আকূতি।

"ওগো আমায় ছেড়ে দাও। আমার যে ছেলেমেয়ে আছে গো ঘরে। সর্বনাশ কোর না গো আমার, সর্বস্ব কেড়ে নিও না। সব খুইয়ে এখান থেকে ফিরে গিয়ে কোন্ মুখ নিয়ে আমি মা হয়ে দাঁড়াব তাদের সামনে?"

উদাত্ত সুরে শোনা গেল মন্ত্র উচ্চারণ—

ওঁ যোনিবিদ্যাং মহাবিদ্যাং কামাখ্যাং কামদায়িনীং।
তৎসুসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং কামবীজাত্মিকাং পরাং॥

গাল ফুলিয়ে তুবড়ি বাঁশিতে সুর তুলেছে সর্বনিয়ন্তা সাপুড়িয়া। সুরের তালে বাসুকির সহস্র ফণা দুলছে। ঘুমোক সবাই, কিন্তু ঘুমোয় না যেন ফণীন্দ্র। ও ঘুমোলে ওর শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে যাবে যে। তখন আর বইবে না বিষাক্ত ঝড়, নারায়ণের নেশা টুটে যাবে। স্তব্ধ হয়ে যাবে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবেগ। নিমেষে জেগে উঠবে সকলে, অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে জেগে উঠবেন স্বয়ং চক্রপাণি।

কিন্তু ক্রমাগত উঠছে মমন্তুদ আর্তনাদ ধরণীর বুক থেকে। তাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে মহাব্যোমের মহাপ্রশান্তি।

"ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমায় মেরে ফেল না। এই জন্যে আমায় এখানে আনছ, এ যদি বুঝতে পারতাম তাহ'লে মরে গেলেও আমি আসতাম না গো তোমার সঙ্গে, কিছুতেই এখানে মরতে আসতাম না।"

সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে উঠল যুগ্ম মহাদেবী বাসনা আর বঞ্চনার বলি-মন্ত্রধ্বনি।

ওঁ ক্লীঁ কামেশ্বরি মহামায়ে ক্লীঁ কালিকায়ৈ নমঃ।
কুলাকুলাদিবিজ্ঞানে কালীনামতন্ত্রোর্মতে॥

হঠাৎ সাপুড়িয়ার বাঁশির সুরের তাল কেটে গেল। নিমেষে বাসুকির সহস্র ফণা গুটিয়ে গেল। নারায়ণ পাশ ফিরলেন। চমকে উঠলেন পদসেবারতা

মহালক্ষ্মী। আপন কক্ষপথ থেকে গ্রহ-নক্ষত্রগুলো ছিটকে পড়ল। উল্কা বেগে নামতে লাগল ধরার বুকে।

তখনও কোথায় কে দুমদাম করে মাথা খুঁড়ছে আর অবিরাম আর্তনাদ করছে।

"আমায় ছেড়ে দাও, ওগো আমায় যেতে দাও আমার ছেলেমেয়ের কাছে। তারা যে পথ চেয়ে আছে আমার। পূজার প্রসাদ নিয়ে আমি ঘরে ফিরব। সেই প্রসাদ খেয়ে তাদের বাপ ভাল হয়ে যাবে। প্রাণের মায়ায় সে আমাকে তোমার হাতে দিয়েছে। এ সর্বনাশ করতে আমায় নিয়ে আসছ তুমি, তা' জানতে পারলে মরে গেলেও সে আমাকে পাঠাত না তোমার সঙ্গে।"

অচঞ্চল কণ্ঠে তখনও ধ্বনিত হচ্ছে মন্ত্র।

কামদা কামিনীজ্ঞেয়া তন্ত্রমধ্যে মহামতা॥

হাহাকার করে উঠল অসহায়া ধরিত্রী, গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে চূর্ণ বিচূর্ণ হবার ভয়ে আঁতকে উঠল। বুকে যত জোর আছে সব উজাড় করে উন্মাদ সাপুড়িয়া ফুঁ দিলে তার তুবড়ি বাঁশিতে। সেই ধাক্কায় জেগে উঠল শেষনাগ। প্রলয়ঙ্কর বিষনিশ্বাস ত্যাগ করলে। বিষে বিষে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মহাব্যোম। গ্রহ-নক্ষত্রগুলো নেশায় মত্ত হয়ে ফিরে পেল আপন গতিবেগ। মোহাচ্ছন্ন হয়ে আবার ঘুরতে লাগল আপন কক্ষপথে।

নীরন্ধ্র অন্ধকার। অন্ধকারের বুক থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরছে তাজা রক্ত। রক্ত নয়, রক্তাক্ষরে ফুটে উঠছে অন্ধকারের বুকে মহামন্ত্র।

ওঁ সৌঃ বালে বালে ত্রিপুরাসুন্দরি যোনিরূপে মম সর্বসিদ্ধিং দেহি যোনিমুক্তং কুরু কুরু স্বাহা।

উদ্ধারণপুরের আকাশ।

কালো হয়ে উঠেছে আকাশের কালো চোখ। গুমরে গুমরে কাঁদছেন

তাঁরা, মোচড় দিচ্ছে আকাশের মর্মস্থলে সেই সকরুণ বিলাপ। কাঁদছেন উদ্ধারণ-পুরের দুই চিরজাগ্রতা দেবী—বাসনা আর বঞ্চনা। তিথি বার নক্ষত্র সবই মেলবার মত মিলেছিল দৈবাৎ। তবু সুসম্পূর্ণ হল না ওঁদের পূজা। বলিদানে বাধা পড়ল। আগমবাগীশের শোধনক্রিয়া ব্যর্থ হয়ে গেল। এরই নাম বোধ হয় দৈববিড়ম্বনা।

কিন্তু না, অত সহজে ব্যর্থ হয় না কিছুই উদ্ধারণপুর শ্মশানে। সারা দুনিয়া উজাড় হয়ে ব্যর্থতা এসে জমা হয় যেখানে আগুনে পুড়ে চরিতার্থ হবার আশায়, সেখানে বসে কিছু করলে তা ব্যর্থ হয় কি করে! তা'হলে যে দৈব হবে জয়ী, আর যার তুবড়িবাঁশির সুরের তালে দৈব নাচে মাথা দুলিয়ে, সেই সর্বনিয়ন্তা সাপুড়িয়ার বাঁশি বাজানো হবে নিষ্ফল।

শেষ পর্যন্ত স্থানমাহাত্ম্য বজায় রইল। মুখ রক্ষা হল উদ্ধারণপুর ঘাটের।

ধীরে ধীরে মাথা তুললে এক কালনাগিনী। নিজের বিষের জ্বালায় নিজেই জ্বলে পুড়ে মরছে সে। তাই সে চায় শান্তি, চায় বিস্মৃতি, বিষে ডুবে থেকে বিষের জ্বালা ভুলতে চায়।

থরথর করে কেঁপে উঠল উদ্ধারণপুরের আকাশ। স্বেচ্ছায় গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে বলি।

"আমায় নাও ঠাকুর। আমায় নিলে যদি তোমার চলে তা'হলে নাও আমায়। পূর্ণ হোক তোমার পূজা, আমারও জন্ম সার্থক হোক। ও হতভাগীকে আর অভিসম্পাত দিও না ঠাকুর, ও ফিরে যাক ওর ছেলেমেয়ের কাছে। তোমার পূজার প্রসাদে ওর স্বামী নীরোগ হয়ে উঠুক।"

ক্ষীরোদসাগরের নিস্তরঙ্গতা কিছুতেই বিক্ষুব্ধ হয় না। কোনও কিছুতেই পদসেবায় ছেদ পড়ে না মহালক্ষ্মীর। বিষে বিষে নীল হয়ে গেল বিশ্বচরাচর। মহাবিষ্ণু কিন্তু ঘুমে অচেতন।

রামহরির বউয়ের বড় প্রাণ কাঁদে তার ভবিষ্যৎ জামাইয়ের জন্তে। ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বয়ে নিয়ে এল আমাকে আমার গদির ওপর। শুনতে পেলাম রামহরির বউ বলছে—"মুয়ে আগুন মাগীর, আজ সকালে শাঁখা সিঁদুর খোয়ালি, আর রাতটা পোয়াতে তর সইল না তোর, এর মধ্যে নুড়ো জ্বেলে দিলি নিজের মুখে।"

আমায় গদির ওপর তুলে দিয়ে ওরা ঘরে ফিরে গেল। আর প্রবৃত্তি নেই রামহরির—আগমবাগীশের অনুষ্ঠানে থাকবার। বললে—"চল আমরা ঘরকে চলে যাই বউ। ঠাকুরের ধাষ্টামো আর সহ্যি হয় না।"

রামহরির বউ কাকে বললে—"এখানে গোসাঁয়ের কাছে বসে থাক গো ঠাকৃরুণ। রাত পোয়ালে গোসাঁই তোমার ব্যবস্থা করবে'খন।"

আগমবাগীশের অনুষ্ঠানে আর একটি প্রাণীও উপস্থিত রইল না, তাঁর নবলব্ধ শক্তি ছাড়া। চিতা ছেড়ে উঠে গিয়ে যারা দাঁড়িয়েছিল অনুষ্ঠান দেখতে, তারা ফিরে গেল তাদের জ্বলন্ত চিতার ওপর। থাক, যেমন আছে তেমনই থাক ওদের অশোধিত চব্বিশ তত্ত্ব। আর কোনও আক্ষেপ নেই কারও মনে। মহাশান্তিতে চিতায় শুয়ে পুড়তে লাগল সকলে।

কোন্ একটা গাছের ডগায় বসে কেঁদে উঠল একটা শকুন। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুর তুললে অন্য সবাই। সেই নাকী সুরের মড়া কান্না চলতেই লাগল।

তারপর খুব দূরে ভাঁয়রোয় টান দিলে কে।

জাগো—মোহন প্যারে।

কে জাগবে তখন? একমাত্র রাত্রি ভিন্ন আর কারও উদ্ধারণপুরের শ্মশানে জেগে থাকা নিষেধ।

উদ্ধারণপুর ঘাটের নিশীথ রাতের গোপন অনুষ্ঠান—বাসনা আর বঞ্চনার রহস্যপূজা নির্বিঘ্নে চলতে থাকুক। অনর্থক 'মোহন প্যারে'কে জাগাবার জন্যে গলার কসরত করা মিছামিছি মরণের দরজায় জীবনের মাথা খুঁড়ে মরা। তার চেয়ে ঘুমোও। মুছে ফেল জীবনের লক্ষণ উদ্ধারণপুরের ভস্ম চাপা দিয়ে।

পায়ের কাছে মাটিতে অন্ধকারে বসে ছিল যে মূর্তিটি তাকে বললাম—"ঘুমিয়ে পড়। পার ত একটু ঘুমিয়ে নাও এই বেলা।"

বেচারা আশা করেনি যে আমি জেগে আছি। চাপা গলায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—"ওগো আমার কি হবে গো।"

বললাম—"কিছুই হবে না। কাল সকালে লোক সঙ্গে দিয়ে তোমায় বাড়ী পাঠিয়ে দোব।"

আবার কানে গেল মন্ত্র উচ্চারণ।

ওঁ ধর্মাধর্ম-হবির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্না-বর্তনা নিত্যমক্ষ-বৃত্তির্জুহোম্যহং স্বাহা॥

আগমবাগীশ পূর্ণাহুতি প্রদান করলেন।

আলো—আলো—আলো।

আলোয় আলোয় ছেয়ে গেছে উদ্ধারণপুরের শ্মশান। আলোর হাসি চলকে চলেছে গঙ্গার স্রোতে। শেয়াল শকুন কুকুর—সকলের মুখে ছোঁয়াচ লেগেছে সেই হাসির। চিতাগুলো তখনও ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে। মাল সব সাবাড়। বাসি পচা পড়ে থাকে না উদ্ধারণপুর ঘাটে। প্রতিদিন টাট্‌কা নিয়ে কারবার। যা ছিল—তা আর নেই। থাকে না, থাকতে পারে না। অন্ধকার নেই, তার বদলে এসেছে আলো। সুতরাং একদম ভুলে মেরে দাও অন্ধকারের আব্দার। নিজেকে তৈরী করে নাও নতুনের স্বাদ পাবার জন্যে। নতুন হচ্ছে জীবন, বাসি পচা যা কিছু তা হচ্ছে মৃত্যু। তা নিয়ে মাথা ঘামানো, মন খারাপ করা, হায় হায় করাও মৃত্যু। উদ্ধারণপুর শ্মশানে মৃত্যুর প্রবেশ নিষেধ। নতুন জীবনের জয়গান উঠছে উদ্ধারণপুর শ্মশানে। ভাঁয়রোয় শেষ টান দিচ্ছে কে খুব কাছ থেকে।

"উঠ উঠ নন্দকিশোর।"

খন্তা ঘোষ।

ঝাড়া পাঁচ হাত লম্বা খন্তা ঘোষের গলা। লাল টকটকে চারখানা দাঁত-বারকরা খন্তা ঘোষ কালোয়াতি গান গায়। খন্তা এসে গেল। যাক্ বাঁচলাম এবার। খন্তাই করবে একটা ব্যবস্থা। ওই পৌঁছে দেবে'খন বউটাকে ওর স্বামীর কাছে। গোলমাল চুকে যাবে।

উঠে বসলাম গদির ওপর। হঠাৎ কি খেয়াল হল, দু'হাত জোড় করে আলোর দেবতাকে একটি প্রণাম জানালাম: "দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটাও তুমি, তোমার আলো অসহায়তার অন্ত ঘটায়—তাই হে জীবনদেবতা, তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।"

তারপর চোখ খুললাম। মূর্তিমান খন্তা ঘোষ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। আরও গোটা কতক দাঁত বেরিয়ে পড়েছে তার।

"তাহ'লে তুমিও আজকাল ঘুমোচ্ছ গোসাঁই?" দরাজ গলায় হা হা হা হা

হাসতে লাগল খন্তা। একেবারে ষোল আনা জীবন্ত খন্তা ঘোষ—হাসার মত হাসতে পারে অনর্থক উদ্দেশ্যহীন হাসি।

হাসি থামিয়ে তার লম্বা কোটের লম্বা পকেট থেকে টেনে বার করলে একটি চেপ্টা বোতল। বোতলটির মুখ খোলা হয় নি তখনও, ভেতরে টল টল করছে সাদা জল।

"নাও গোসাঁই—চালাও। আসল জাহাজী মাল, এ তোমার ডোম বউয়ের মা গঙ্গার পানি নয় বাবা—এ হচ্ছে গিয়ে—"

মাল সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা চালিয়ে যাবে খন্তা, যদিও নিজে ও কখনও মাল গেলে না। নেশার মধ্যে ওর আছে মাত্র দুটি নেশা। এক—টাকা রোজগার করা, আর দুই—টাকা ওড়ানো। ওই দুটি কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করবার জন্যে ওর মগজে হাজার রকম ফন্দিফিকির খেলা করে। যে কাজে ঝুঁকি কম সে রকম কাজে খন্তা সহজে হাত দিতে চায় না, মোটা লাভের লোভেও না। বলে—"দুর দুর, ওভাবে দু'দশ কুড়ি কামাতে ত বেলতলার ন্যাড়া ভট্‌চাযও পারে, চুনো পুঁটি মেরে শুধু শুধু হাতে গন্ধ করে কে? চেপে বসে থাক না বাবা, বাঘা মাছ ঘাই দেবেই।" হয়ত বাঘা মাছের জন্যে দু'দশ মাস গড়িয়ে চলে গেল। কুছ পরোয়া নেই খন্তার, নেহাৎ অচল হলে চুপচাপ শুয়ে থাকে গিয়ে ওর দিদির আখড়ায় চরণদাস বাবাজীর পাশটিতে। সে সময় খন্তার মাথায় তেল পড়ে, অত লাল দেখায় না দাঁতগুলো, চোখের কোল অত কালো থাকে না। আর মুখের চেহারাও বেশ বদলে যায়। "কুছ পরোয়া নেই" তখন বেঁচে থাকে ওর চোখে! নিতাই বোষ্টমীর সবুজ শিমগাছের দিকে ঠায় চেয়ে থাকার ফলেই বোধ হয় ওর চোখেও সবুজের আভা দেখা যায়।

তারপর একদিন আবার সংবাদ আসে। কাটোয়া শিউড়ি কান্দি বেলডাঙ্গা এমন কি কলকাতা পর্যন্ত ছুটতে হয় খন্তাকে। বড় মাছ ঘাই দিয়েছে, খেলিয়ে তুলতে হবে।

আবার একদিন খন্তা ফিরে আসে। ফিরে কোথাও আসে না সে। তার চলার পথে হয়ত পড়ল উদ্ধারণপুরের ঘাট। তাই খামকা ঢুকে পড়ে শ্মশানে। গায়ে একটা লম্বা কোট, পরনে একখানা দশ বার টাকা দামের কোরা তাঁতের ধুতি, আর এক জোড়া চীনে-বাড়ীর জুতো। জুতো জামা কাপড় সবই নতুন! অর্থাৎ নতুন কেনা হয়েছিল যেদিন, সেদিন অঙ্গে চড়িয়েছে খন্তা। পোষাক-পরিচ্ছদ ও একবারই পরে আর একবারই ছাড়ে, পরা-ছাড়ার মাঝের সময়টুকু

হয়ত বা ছ'মাস ন'মাস বা কয়েক বছরও হতে পারে। খন্তার তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না।

কিছুতেই কিছু আসে যায় না খন্তার। পক্কা এসে জানালে যে দুটো খাসি পাওয়া গেছে। দাম বড় বেশী চাচ্ছে। এক কুড়ির কমে কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

খিচিয়ে উঠল খন্তা—"তবে কি পাঁচ টাকায় দেবে নাকি রে শালা? জানিস, শিউড়িতে চাল উঠেছে এগারোয়। নিয়ে লে খাসি দুটো, সের পনেরো মাল হওয়া চাই। বানিয়ে ফেল ঝটপট্, সিধু ঠাকুরকে চাপিয়ে দিতে বলগে যা।"

বুঝলাম—এখন জাঁকিয়ে দু'চার দিন থাকবে এখানে খন্তা। তার মানে চলল এখন মহোৎসব উদ্ধারণপুর ঘাটে। উদ্ধারণপুর ঘাটে এখন বিকিকিনি বন্ধ। দরমার খোপে বাঁশের মাচায় যারা মনে অঙ্ ধরাবার বেসাতি চালায়, সেই হতভাগীরা ছুটি পাবে কয়েকদিনের জন্যে। চেনা খদ্দের উঁকি দিলেও শুনিয়ে দেবে তাকে—"ফের বাবু এখন, ঘরের ছেলে ঘরে যাও। আমাদের ভাই এসেছে যে, ভাই না গেলে মুখে অঙ্ মাখতে সরম লাগে যে।"

সকলের বড় ভাই খন্তা ঘোষ এসেছে। এসেছে তার অভাগা বোনদের জন্যে এক গাঁটরি কাপড় নিয়ে। এসেই হুকুম দিয়েছে—"খুলে ফেলে দে ওই নচ্ছার সাজ-পোশাকগুলো, গঙ্গা নেয়ে এসে নতুন কাপড় পর সবাই। নতুন উনুন পেতে ফেল বড় বড় কয়েকটা। সকলের রান্নাবান্না একসঙ্গে হবে। রাঁধবে সিধু ঠাকুর। আমরা সবাই প্রসাদ পাব।"

কয়েক বোতল রসায়নও নিশ্চয়ই এনেছে খন্তা ঘোষ। খেলে রক্তের দোষ নষ্ট হয়। সেগুলো সে ভাগ করে দেয়—যাদের শরীর বড্ড ভেঙে পড়েছে তাদের মধ্যে।

আমার মুখের দিকে চেয়ে খন্তা বললে—"অত কি ভাবছ গোসাঁই? তুমিও যদি ভেবে মর তা'হলে আমরা যাই কোথায়?"

বললাম—"না ভাবছি না কিছুই, আগে একটু ধোঁয়া-মুখ করা।"

পকেটে হাত পুরে এক মুঠো সস্তা সিগারেট বার করলে খন্তা। একটা ধরিয়ে চোখ বুজে টানতে লাগলাম।

রক্তবর্ণ লালপাড় শাড়ীপরা কে সামনে দাঁড়াল। মুখের দিকে চেয়ে থ হয়ে রইলাম। কপালে এত বড় সিঁদুরের ফোঁটা, মুখে এক মুখ পান, দুধের মত রঙ, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মূর্তি! কে ইনি?

হঠাৎ মাথার ঘোমটা সরে গেল। কিচ্ছু নেই, সাদা ধপধপ করছে মাথাটাও। ভয়ানক চমকে উঠে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম।

"এবার একটু পায়ের ধুলো দিন বাবা, আমরা বিদেয় হই।"

এ সেই গলার স্বর! আবার ফেরাতে হল মুখ। নিবিড় কালো চোখের পল্লবগুলি আর তার ওপর অতি যত্নে আঁকা ভুরু দুটি—ভাগ্যে কামানো হয় নি। বুকের মধ্যে একটা নিঃশ্বাস ঠেলে উঠল। তাড়াতাড়ি সেটাকে সামলে বলে ফেল্লাম—"কোথায়! কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

সামান্য একটু হাসি খেলে গেল তাঁর ঠোঁটে। চিবুকের নিচে সামান্য একটু টোল পড়ল। দৃষ্টি নত করে উত্তর দিলেন—"আগে আমার ঐ বোনটিকে ওর স্বামীর হাতে পৌঁছে দোব, তারপর চলে যাব কাশীতে।"

নিজের ওপর এতটুকু কর্তৃত্ব নেই আমার। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"আগমবাগীশ! আগমবাগীশ কোথায়?"

নত চোখেই তিনি উত্তর দিলেন জড়তাহীন কণ্ঠে—"ঠাকুর আলাদা গাড়ীতে আগেই রওয়ানা হয়ে গেছেন, তিনি স্টেশনে থাকবেন যতক্ষণ না আমি ওকে ওর বাড়ীতে রেখে ফিরে আসি।"

আমার পায়ের ধুলো নিয়ে নিজের ঘোমটার ওপর হাত রাখলেন। তারপর আর একজনও পায়ের ধুলো নিলে।

খন্তাকে হুকুম করলাম—"বোতলটা খোল এবার খন্তা। গলাটা ভেজাই।"

বাতাস শিঙা ফোঁকে।

বহুদিনের পুরানো শূন্যগর্ভ নরমুণ্ড আর মোটা মোটা ফোঁপরা হাড়ের শিঙায় ফুঁ দেয় বাতাস। নিষুতি রাতে শোনা যায় সেই শিঙাধ্বনি। শুনে শিহরণ জাগে চিতাভস্মের বুকে। জেগে ওঠে তারা, পাখনা মেলে উড়ে যায় বাতাসের সঙ্গে। শকুনরা পাখা ঝাপ্‌টে বিদায়-অভিনন্দন জানায়,আকাশের দিকে মুখ তুলে শিয়ালরা সমবেত কণ্ঠে গান ধরে—"জয়যাত্রায় যাও গো"। গান শুনে ওদের জ্ঞাতি-গোত্র যে যেখানে থাকুক সেখান থেকে উল্লাসে উলুধ্বনি দিতে থাকে।

উদ্ধারণপুরের বাতাসের সঙ্গে শ্মশান-ভস্মের মধুর মিতালি। দুই মিতার জয়যাত্রা সুরু হয়। এপারে শিউড়ি সাঁইথে কাটোয়া কান্দী, ওপারে বেলডাঙা বহরমপুর লালগোলা কৃষ্ণনগর—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে উদ্ধারণপুরের চিতাভস্ম। নামে মানুষের মাথায়, নামে ক্ষেত-খামারের বুকে, নামে সকলের তৃষ্ণার জলের আধার দীঘি সরোবরে। মিশে যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। সবার কাছে চিতা-ভস্মের সাদর আমন্ত্রণ পৌঁছে দেয় উদ্ধারণপুরের বাতাস। কেউ টের পায় না কবে কখন উদ্ধারণপুরের অমোঘ আহ্বান এসে পৌঁছে গেল হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। সেই নির্মম পরোয়ানা অগ্রাহ্য করার শক্তি নেই কারও। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, সবাই গুটিগুটি এগিয়ে আসতে থাকে উদ্ধারণপুরের দিকে।

উদ্ধারণপুরের বিশুদ্ধ সুগন্ধ গায়ে মেখে শৌখীন সমীরণ দিক্‌দিগন্তে উড়ে চলে যায়। রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ নাকি মিশে থাকে হাড় মাংস রক্ত মজ্জা মেদের সঙ্গে। যতক্ষণ না সেগুলোকে চিতায় তুলে জ্বাল দিতে আরম্ভ করা হয় ততক্ষণ গন্ধের হদিশ মেলে না। উৎকৃষ্ট অগ্নিশুদ্ধ মানবীয় সুবাসে সুবাসিত হয়ে উদ্ধারণপুরের মত্ত মারুত ভস্মলিপি হাতে নিমন্ত্রণ করতে রওয়ানা হয়। সেই লিপির মাথায় ভস্মাক্ষরেই লেখা থাকে—

ধর্মাধর্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম।
দহেয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু॥

দিব্যলোকের যাত্রীরা একে একে এসে নামছে। ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ী যুবক যুবতী, সব জাতের সব বয়সের যাত্রী এসে পৌঁছচ্ছে। পারঘাট বেজায়

ভিড়, গান-গল্প হৈ-হল্লা ফষ্টিনষ্টির ফোয়ারা ছুটছে। স্ফূর্তির ঝড় বইছে তাদের মধ্যে, যারা যাত্রীদের ঘাটে পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। প্রকৃত যাত্রীরা কাঁথা-মাদুর-জড়ানো পড়ে রয়েছে এখানে ওখানে। কাঁথা মাদুরের ভেতর থেকেই দিব্যচক্ষে দেখছে এদের হ্যাংলাপনা। হদ্দ বেহায়ার মত কেমন করে চাটছে এরা জীবনের রস, তা দেখে ওদের হিমশীতল শরীর শিউরে উঠছে। রসটুকু নিঃশেষে শুকিয়ে যাবে যেদিন, সেদিন এরাও হবে দিব্যলোকের যাত্রী, সেদিন এরাও বাঁশে ঝুলতে ঝুলতে যাত্রী সেজে আসবে এখানে।

উদ্ধারণপুরের পূবসীমানা থেকে দিব্যলোকের দিব্যপথের সুরু। পশ্চিমের বড় সড়কের ওপর বসে গালে হাত দিয়ে জীবন কাঁদে। দিব্যপথে পা দেবার অধিকার নেই জীবনের। তাই খন্তা ঘোষ সিধু কবরেজের দাওয়াইখানার সামনে জীবন-মচ্ছব দিচ্ছে। জীবনের মুখে হাসি ফোটাবে এই তার বাসনা। হারমোনিয়ম তবলার সঙ্গে নারীকণ্ঠে ভেসে আসছে ওখান থেকে—

"শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি।"

তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে মুটকি সুবাসী মড়াকান্না জুড়েছে আমার গদির সামনে বসে। তার রোজগেরে মেয়ে লক্ষ্মীকে ফুসলে নিয়ে গেছে খন্তা। খন্তা উদ্ধারণপুরে এলেই সুবাসী আমার কাছে মড়াকান্না কাঁদতে বসে। আমি হুকুম করলেই নাকি খন্তা তার মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। তা কাঁদবে বৈকি সুবাসী। মড়ার চুলের পাঁচ গণ্ডা গুছি দিয়ে ছ'কুড়ি রঙ-বেরঙের কাঁটা আর ক্লিপ গুঁজে মস্ত খোঁপা বেঁধে মুখে খড়ি-আলতা মেখে সারা দিন-রাত পথে বসে থাকলেও কেউ ফিরে তাকায় না সুবাসীর দিকে। জীবনের রস ফুরিয়ে এসেছে তার। এই বয়সের সম্বল ছিল মেয়ে। খন্তা ওর বাড়া-ভাতে ছাই দিয়েছে। খন্তাকে শাপমন্দ দিয়ে মাথা খুঁড়ে সুবাসী নিজের মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

একটা ভাঙা মাটির ভাঁড় পড়েছিল সামনে। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়ে তাতে ছটাকখানেক মদ ঢেলে আবার মাটিতে নামিয়ে দিলাম। মরবার ভয়ে সুবাসী আমার গদি ছোঁয় না, কাজেই আমার হাত থেকে ও নেবে না কিছুই।

বললাম—"নে, ওটুকু গলায় ঢেলে দে বেটী। আর কেঁদে কি করবি বল। মেয়ে ত তোকে টাকা পাঠাচ্ছে মাসে মাসে খন্তার হাত দিয়ে। খামকা কাঁদিস নি আর, টের পেলে খন্তা মেরে ধামসে দেবে গা-গতর।"

ভাঁড়টা আলগোছে তুলে নেয় সুবাসী। বাঁ হাতে নাক টিপে ধরে পিছন

দিকে মাথা হেলিয়ে বিরাট হাঁ করে তরল পদার্থটুকু গলার মধ্যে ঢেলে দেয়। দিয়ে বিদঘুটে মুখ করে চোখ বুজে থুতু ফেলতে থাকে।

ওধারে গঙ্গার কিনারায় একটা চিতার পাশে হাতাহাতি হবার উপক্রম, বাছাই বাছাই সম্বোধনের তুবড়ি ছুটছে ওখানে। তড়পানোর চোটে উদ্ধারণপুরের ঘাট সরগরম। কিছুক্ষণ পরে রামহরি আর পংকেশ্বর একজনকে ধরে নিয়ে এল। পিছন পিছন এল হিতলাল মোড়ল, দুকড়ি বায়েন, কঙ্কালি ঠাকুর, আরও অনেকে। যাকে ধরে নিয়ে এল তার বেশ বয়স হয়েছে। নাদুস নুদুস চেহারা, গলায় একগোছা ময়লা পৈতে, নাভির নিচে খাটো নোংরা থান পরা, দু'চোখবোজা লোকটির দুই কশ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। টানতে টানতে নিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে লোকটিকে। ওরা ছেড়ে দিতেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটির ওপর। পড়ে মাটিতে মুখ রগড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

রগড় দেখবার আশায় যে যেখানে ছিল ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়ালো। হিতলাল মোড়ল মাটিতে পড়ে গড় হয়ে উঠে নাকে কানে হাত দিয়ে নিবেদন করলে তার আরজি।

"একটা বিচার করে দেন বাবা। এই ব্যাটা বিট্‌কেল বাম্‌না আমাদের হাড় জ্বালিয়ে খেলে। দু'দুবার এই অলপ্পেয়ে ঠাকুর আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। এবারও সেই মতলব করেছে ব্যাটা। এবার আর ওকে আমরা ছাড়ছি না, টাকা না পেলে ওকেও ওর ছেলের সঙ্গে চিতেয় তুলে দোব।"

কঙ্কালি ঠাকুর হিতলালের হাত জড়িয়ে ধরলে।

"থামকা আর খিট্‌কেল কোর না মোড়ল। কাজ শেষ করে চল ঘরে ফিরে যাই। বাড়ী গিয়ে দশ মন ধান দোব আমি তোমায়।"

এক হেঁচকায় হাত টেনে নিয়ে হিতলাল গর্জে উঠল—"থাম ঠাকুর, ম্যালা ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ করতে এস না বলছি। ঢের জানা আছে তোমাদের মুরোদ। দশ মন ধান কখনও চোখে দেখেছ এক সঙ্গে?"

ইতিমধ্যে ঘটে গেল মহা অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। যে ব্যক্তিটি উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে মুখ রগড়াচ্ছিল সে গড়াতে গড়াতে গিয়ে হিতলালের পা জড়িয়ে ধরেছে। আর যাবে কোথা—তিড়িং করে আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল মোড়ল। ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে আনলে একখানা তিন হাত লম্বা পোড়া কাঠ। সেখানা মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে লাফাতে লাগল।

"খুন করে ফেলব আজ বামুনাদের। মা-গঙ্গা সাক্ষী করে আমার পা ধরলে শালা বামুনা, আমার চোদ্দ পুরুষকে নরকে ডোবালে। আজ আর ওদের আমি জ্যান্ত ফিরতে দিচ্ছি না ঘাট থেকে—"

পিছন থেকে রামহরি ছিনিয়ে নিলে কাঠখানা, পঙ্কা জড়িয়ে ধরলে ওর কোমর। যা মুখে এল তাই বলে চেঁচাতে লাগল হিতলাল। দেখাদেখি দুকুড়ি বায়েনও গরম হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে খপ করে কঙ্কালি ঠাকুরের কাপড় ধরে ফেললে।

"টাকা না পেলে আজ এক শালাকেও ফিরতে দিচ্ছি না এখান থেকে।"

একটি বছর আষ্টেকের ছেলে এক পাশে দাঁড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। এক মাথা রুক্ষ চুল, কোমরে একফালি ন্যাকড়া জড়ানো, রোগা ডিগডিগে ছেলেটির কচি মুখখানিতে, দু'চোখের অসহায় দৃষ্টিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে নিদারুণ আতঙ্ক আর অবসাদ। তার অবস্থা দেখে মনে হ'ল বহুক্ষণ বোধ হয় এক কোঁটা জলও গলা দিয়ে নামে নি। দু'পায়ের হাঁটু পর্যন্ত কাদামাটি মাখা, পা দুটো বেশ ফুলেও উঠেছে। বুঝতে বাকি রইল না যে ভাগ্যদেবতা একটু মজার খেলা খেলছেন ছেলেটির সঙ্গে।

একটা খালি বোতলের গলা ধরে ঝাঁ করে ছুঁড়ে মারলাম আকাশের দিকে। বোতলটা ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল গঙ্গার জলে। আর একটা হাতে তুলতেই ঝপ করে সবাই বসে পড়ল। আর টুঁ শব্দটি নেই কারও মুখে।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম—"কিরে, কি ভেবেছিস সব ?"

কারও মুখে রা নেই।

দাঁত কিড়িমিড়ি করে দাঁড়িয়ে উঠলাম গদির ওপর। কোথা থেকে শুম্ভ নিশুম্ভ ছুটে এল বিকট ঘেউ ঘেউ করে। যারা রগড় দেখতে জুটেছিল তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলে। সামনে বসে রইল হিতলাল দুকড়ি কঙ্কালি। বুড়ো লোকটাও ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ছেলেটা এসে জাপটে ধরলে হিতলালকে। হিতলাল দু'হাতে তার মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরলে। রামহরি পঞ্চেশ্বর চিৎকার করে উঠল—"জয় বাবা কালভৈরব, জয় বাবা পাগলা ভোলা।"

কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম ওদের দিকে। তারপর আবার হুঙ্কার ছাড়লাম একটা।

"জয় মা শ্মশানচণ্ডী, আজ তুই রক্ত খাবি মা রক্তখাকী !"

হিতলালের বুকের ভেতর ছেলেটা ডুকরে কেঁদে উঠল।

সেই এক সুরে বলে গেলাম—"পঙ্কা, ছুটে যা। ডেকে আন খস্তাকে, দু'কুড়ি টাকা আনতে বলিস সঙ্গে।"

পঙ্কা ছুটল।

"দুকড়ে, তোর বড্ড বাড় হয়েছে, আমার সামনে বামুনের গায়ে হাত দিলি!"

দুকড়ি নিজের হাঁটুতে মুখ গুঁজে কান্না জুড়ে দিলে।

"মোড়লের পো—ঐ ছেলেটা কার?"

হিতলাল কোনও রকমে উচ্চারণ করলে—"দোহাই বাবা, এই ছেলেটার ওপর নজর দিও না বাবা। আমাদের এই ঠাকুরের বংশে বাতি দিতে আর কেউ নেই গো। গত দু'সনে আমরা ছ'বার যাওয়া আসা করলাম ঠাকুরের জন্যে। ঠাকুরের ঘর ভরা ছেলে-বউ নাতি-নাতনী সব উজোড় হয়ে গেল। আজ নিয়ে এসেছি ঠাকুরের বড় ব্যাটাকে। এই একরত্তি ছেলেটাকে রেখে সে-ও চোখ বুজলে। দু'সন ম্যালোরিতে ভুগছিল, শেষে রক্ত—"

আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম—"চোপরাও ব্যাটা চামার। তা টাকা না বুঝে পেয়ে তোরা বইতে গেলি কেন ঠাকুরের মড়া? গাঁয়ের বাইরে শ্মশান ছিল না?"

এবার হিতলালও রুখে উঠল।

"কি করি বলুন গোসাঁই বাবা! হাড় মাস জ্বালিয়ে খেলে ঐ নচ্ছার বামুনা। আমরা যত ওকে বোঝাই যে, ঠাকুর, তোমার ঘরে এক বেলার খাবার নেই, তোমার কেন শখ হয় সকলকে গঙ্গায় দেবার, ততই ঠাকুর হাতে পায়ে ধরতে আসে। এই করে দু'দুবার ফাঁকি দিয়েছে। এবার এই নাতির মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করলে যে ঘাটে পৌঁছেই টাকা মিটিয়ে দেবে। কে ওর বড়লোক যজমান আছে সে নাকি টাকা নিয়ে ঘাটে আসবে।"

আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম—"চোপরাও ব্যাটা গো-হাড়গেল। এই নে মহাপ্রসাদ। গিল্‌গে যা ওধারে বসে। এত ছোট নজর তোর, তোরা না শ্মশানকালীর সন্তান! মায়ের দয়ায় কিসের অভাব তোদের শুনি? গাঁয়ের বামুন, গঙ্গায় দিয়ে গেলি, একটা সৎ কম্ম করলি। এর ফল দেবে তোদের মা শ্মশানকালী। সে বেটীর কি চোখ নেই নাকি মনে করেছিস? তোদের গাঁয়ের বামুন, তোদের আপনার লোক, ফেলবি কোথায় তাই শুনি?"

হিতলাল দু'হাত জোড় করে নিলে বোতলটা। কঙ্কালিকে বললে—"খুড়ো, এইবার এই বাচ্চা ঠাকুরের মুখে কিছু দাও বাপু। এও কি জল না খেয়ে

মরবে নাকি? বাপের মুখে আগুন দেবার পর ত আজ আর এক ঢোঁক জলও খেতে পাবে না।"

খন্তা এসে দাঁড়ালো সামনে

"হুকুম কর গোসাঁই, কোন্ শালাকে লম্বা করতে হবে!"

"দু'কুড়ি টাকা ফেলে দে খন্তা। বামুন ঘাটে এসে চিতেয় উঠছে না। মোড়লের পো, টাকা নিয়ে এখানকার কাজকম্ম করে গাঁয়ে ফিরে তোমাদের ঠাকুরকে একটু দেখো। খন্তা, ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়া। ওকে নতুন কাপড় চাদর পরিয়ে দিস যাবার সময়।"

এক মুঠো দলাপাকানো নোট আমার গদির ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে দৌড় দিলে খন্তা।

রামহরি আর পঙ্কা আর একবার চিৎকার করে উঠল।

"জয় মা শ্মশানকালী, জয় বাবা কালভৈরব।"

উদ্ধারণপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

মানবহৃদয়ের যজ্ঞবেদীতে—স্বার্থবুদ্ধির সমিধ্ দিয়ে স্বয়ং বিশ্বদেব অগ্ন্যাধান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখানো হয় পূর্ণাহুতির মহামন্ত্রটি।

ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতং তৎসর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ঞ্চ সকলং সম্যক শ্রীমৎ শ্মশানকালিকায়ৈ সমর্পিতম্ ওঁ তৎসৎ॥

গিজ্তা গিজাং—গিজ্তা গিজাং। নাম সংকীর্তন আসছে।

কয়েক গণ্ডা খোল খত্তালের আওয়াজ ছাপিয়ে হুহুংকার উঠছে—বল হরি হরি বোল। কোনও বড়মানুষ আমিরী চালে চুলায় চড়তে আসছেন। ঐ চালটুকু ছাড়া সব চালাকি বিসর্জন দিয়ে আসছেন। চালাকি পোড়ানো যায় না চুলায়।

ছুটল রামহরি পঙ্কেশ্বর শুম্ভ-নিশুম্ভ। খোল খত্তালের সামনে খই কড়ি পয়সা কুড়োতে কুড়োতে ডোমপাড়ার গুষ্টিগোত্র সবাই ছুটে আসছে। তাদের রুখতে হবে। শ্মশানের ভেতর হুড়মুড় করে নেমে পড়বার আগেই তাদের ফেরাতে

হবে। শ্মশানের সীমানার মধ্যে যা পড়বে ত ছোঁবার অধিকার নেই বড় সড়কের ওপর ওদের রুখতে না পারলে কি আর রক্ষে আছে। কানা কড়িটা পর্যন্ত চোখে দেখা যাবে না, চিল-শকুনের মত ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে সব।

বড় সড়ক থেকে নেমে আসছে শোকযাত্রা। বহু লোক অতি সাবধানে নামিয়ে আনছে একখানি চকচকে পালিশকরা খাট। খাটে বহুমূল্য মশারি খাটানো। মশারির চারধারে ঝুলছে ফুলের মালা। বড় বড় ধুনুচি নিয়ে নামছে কয়েকজন। ধুনা গুগ্‌গুল চন্দনকাঠের গন্ধে উদ্ধারণপুরের সুগন্ধ লজ্জায় মুখ লুকালো। শিয়ালগুলো উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো, শকুনগুলো বহু উর্ধ্বে উঠে পাখা মেলে চক্কর দিতে লাগল আকাশের গায়ে। আমার গদির পিছনে লুকিয়ে পড়ল শুম্ভ-নিশুম্ভ। শ্মশানের মাঝখানে সন্তর্পণে নামানো হল খাটখানা। সঙ্গে সঙ্গে চরমে গিয়ে পৌঁছল গিজ্‌তা গিজাং। খোল খত্তাল ধেই ধেই করে নাচতে লাগল খাট ঘিরে। বল হরি হরি বোল—মুহুর্মুহুঃ চিৎকারের চোটে কানের পর্দা ফাটবার উপক্রম। যার নাম ধুম-শোক, প্রিয়জনবিয়োগসম্ভূত-সন্তাপের মহাসমারোহ কাণ্ড।

তৈরী হয়ে নিলাম। ঢকঢক করে সামনের বোতলটা খালি করে ফেললাম। মাথার মাঝখানে একটা মস্ত বিঁড়ে পাকালাম জটা জটা চুলগুলো দিয়ে। পাকিয়ে শিরদাঁড়া টান করে হাঁটু মুড়ে গদির মাঝখানে বসে রইলাম।

কেউ না কেউ আসবেই এধারে। নয়ত ওদের এত জাঁকজমক সব ব্যর্থ হয়ে যাবে যে। উদ্ধারণপুরের ঘাটে জাঁকজমকের সাক্ষী শেয়াল শকুন রামহরি পক্কা আর আমি। শেয়াল শকুন জাঁকজমকের রসাস্বাদনে অক্ষম। বরং মড়াটা না পুড়িয়ে ঝলসে ফেলে রেখে গেলে ওরা বাহবা দিত। রামহরি পক্কা ভাবছে খাট বিছানা বেচে কত টাকা মারবে। একমাত্র আমিই ওদের ভরসা। যুগযুগান্ত মড়ার বিছানায় বসে গাইতে থাকব ওদের কীর্তিকাহিনী। সুতরাং আমাকে হাতে রাখতেই হবে।

হঠাৎ ঝপ করে থেমে গেল খোল খত্তালের আওয়াজ। ধেই ধেই করে যারা নাচছিল তারা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। কতক মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল গঙ্গার জলে, বাকি সকলে পড়ি-ত-মরি করে উঠে গেল বড় সড়কের ওপর। কয়েক বোঝা মাল মশলা, কয়েকটা বড় বড় হাঁড়ি, ডেক কড়াই আর মশারি-ঢাকা খাটখানা পড়ে রইল শ্মশানের মাঝখানে। জন পাঁচ-ছয় লোক

খাটের দিকে নজর রেখে পিছু হেঁটে আসতে লাগল আমার গদির দিকে। একা রামহরি ডোম অনেকটা তফাৎ দিয়ে খাটখানার চারপাশে ঘুরতে লাগল আর মাঝে মাঝে এক এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে কি সব বিড় বিড় করে বলতে বলতে মশারির গায়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল।

কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে আছড়ে পড়ল পক্কা।

"গোসাঁই বাবা, বাঁচাও গো, রক্ষে কর আমাদের।"

পিছু হেঁটে আসছিল যারা তারা ঘুরে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সকলে চেয়ে রইল আমার দিকে। সজোরে ধমক দিলাম পক্কাকে—

"উঠে দাঁড়া হারামজাদা। ন্যাকামি রাখ। কি হয়েছে কি? অমন করে আঁতকে মরছিস কেন? হল কি তোর ছেরাদ্দ?"

ধীর সংযত কণ্ঠে জবাব এল—"ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কি হয়েছে, খাটের ওপর শব পাশ ফিরেছে। আমরা সবাই দেখেছি।"

বক্তার দিকে চাইলাম। অতি সুশ্রী চেহারা। রঙ রূপ চোখের চাহনি কণ্ঠস্বর পরিচয় দিচ্ছে যে ইনিই হুজুর। খালি পা, গায়ে একখানি গরদের চাদর জড়ানো, শরীরে অনাবশ্যক মেদ নেই। দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়—এই মানুষটি হুকুম করতে জন্মগ্রহণ করেছে, হুকুম তামিল করতে নয়।

কয়েক মুহূর্ত তিনি এবং আমি পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। তাঁর পিছন থেকে কে একজন ভীতি-বিহ্বল খোশামুদে গলায় বলে উঠল—"একটিবার উঠুন বাবা কৃপা করে। আমাদের হুজুরের—"

বক্তার দিকে মুখ ফেরালেন হুজুর। কথা আটকে গেল তার গলায়।

আমার দিকে ফিরে সামান্য একটু হাসবার চেষ্টা করলেন হুজুর। তারপর সহজ গলায় বললেন—"অবশ্য আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমাদের অন্যায় হবে—"

আর বাড়তে দিলাম না তাঁর বক্তব্য। তড়াক করে লাফিয়ে পড়লাম গদি থেকে। বললাম—"দাঁড়িয়ে থাকুন এখানেই। এক পা নড়বেন না।" বলতে বলতে ছুটে গেলাম খাটের পাশে।

আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল রামহরি। বন্ধ হল তার মন্ত্র পড়া। হাত তুলে ইশারা করলাম তাকে গদির কাছে যেতে। বিনা ওজরে ধুলো মুঠো ফেলে সে সরে গেল।

তখন মশারির ভেতর নজর করে দেখলাম।

সত্যিই ত! দিব্যি ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে মড়া। গলা থেকে পা পর্যন্ত

ফুল আর ফুলের মালায় ঢাকা। শুধু মাথার পিছনটা দেখা যাচ্ছে। মেয়ে কি পুরুষ তা বোঝা গেল না।

খাটের ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। মশারির বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা গেল না। মশারি তুলে ভেতরে মাথা গলিয়ে দেখলাম। একটি বৃদ্ধা, খাটো করে চুল কাটা, কপালময় শ্বেতচন্দন লেপ্‌টানো, বহুমূল্য গরদের চাদর চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন। ছোটখাটো শুকনো মানুষটি, বোধ হয় এমন কিছু রোগভোগও করেননি।

তাঁর সামনে থেকে ফুলগুলো সরিয়ে ফেললাম। একটি ছোট পাশ বালিশ। কিন্তু এ কি! পাশ বালিশটি অনেকটা নেমে গেছে। বালিশের নিচে হয়েছে বেশ একটি ছোটখাট গর্ত। তাড়াতাড়ি খাটের তলায় হাত দিয়ে দেখলাম। ঠিক সেইখানের ব্যাটমটা গেছে সরে।

তৎক্ষণাৎ মালুম হল ব্যাপারটা। ফুল মালা দিয়ে পাশ বালিশটা তাড়াতাড়ি ঢেকে দিয়ে দু'হাতে শুধু মৃতদেহটা তুলে নিলাম। তারপর মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে ঘুরে এসে দাঁড়ালাম খাটের এপাশে।

আমার গদির কাছ থেকে কেউ এক পা নড়ে নি, সেখান থেকে চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ে আছে আমার দিকে। দেখে মনে হল যেন পাথরের প্রতিমূর্তি, শ্বাস-প্রশ্বাসও বইছে না কারও।

হাঁকার দিলাম—"রামহরে পক্কা এগিয়ে আয় এধারে! এখনই খুলে ফেল খাট বিছানা সব। খুলে সরিয়ে ফেল এখান থেকে। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন আপনারা। এক পা এগোবেন না।"

রামহরি পক্কা দৌড়ে এল। মড়া নিয়ে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম ওঁদের সামনে। একবার সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখে হাঁটু গেড়ে বসে শুইয়ে দিলাম মড়াটা মাটির ওপর। শুইয়ে দিয়ে মড়ার গায়ে হাত রেখে বললাম—

"আসুন একজন, ছুঁয়ে বসে থাকুন এঁকে!"

কেউ এগোয় না। হুজুর একবার সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। দেখে স্বয়ং এগিয়ে এসে মাটির ওপর বসে পড়লেন মড়ার পায়ের কাছে। ডান হাতখানি রাখলেন মড়ার পায়ের ওপর।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কে ইনি?"

"আমার মা।"

"জানেন না, শ্মশানে শবদেহ নামিয়ে ছুঁয়ে থাকতে হয়?"

উত্তর না দিয়ে নত চোখে মায়ের পায়ের দিকে চেয়ে রইলেন।

সহসা হুজুরের সঙ্গীরা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। হুজুর মাটির ওপর বসে পড়েছেন এ দৃশ্য তাঁরা সহ্য করেন কেমন করে! সকলে এক সঙ্গে এগিয়ে এসে বসে পড়লেন হুজুরের পাশে। একজন বলে উঠলেন—"আহা-হা, তুমি এখানে বসে পড়লে কেন বাবাজী? আমরা থাকতে তুমি কেন—"

তার দিকে চেয়ে তার মুখ বন্ধ করলেন হুজুর। সংযত কণ্ঠে হুকুম দিলেন—"এবার ডাকুন সকলকে, এখন ত আর কোনও ভয় নেই!"

ওধারে চেয়ে দেখলাম, রামহরি আর পক্কেশ্বর মশারি খুলে বিছানা নামিয়ে খাট খুলতে সুরু করেছে। নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে গিয়ে বসলাম গদির ওপর চেপে।

ছুটতে ছুটতে এল খন্তা ঘোষ।

"কি হল? হয়েছে কি গোসাঁই?"

"তোর কেন মাথা-ব্যথা তা জানবার? নে গলাটা ভেজা এবার। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে এধারে।"

হুজুর হুকুম দিলেন একজনকে—"খুড়ো, এনে দাও ওঁকে দুটো বোতল! বসে থেকো না হাঁ করে।"

বকের মত লম্বা গলা আর লম্বা ঠ্যাং একটা বাঁকাচোরা লোক লাফাতে লাফাতে ছুটল যেখানে মোটঘাট পড়ে আছে। সেখান থেকে তার খ্যান্‌খেনে গলা শোনা গেল।

"কোথায় গেল সব আবাগীর ব্যাটারা? রাখলে কোথায় মালের বাক্সটা ছাই?"

ততক্ষণে আবার হুড়মুড় করে সকলে নামতে সুরু করেছে বড় সড়ক থেকে। বল হরি হরি বোল দিয়ে ফাটিয়ে ফেললে উদ্ধারণপুরের আকাশ।

আসল স্কটল্যাণ্ডের পানীয় দুবোতল এসে নামল গদির সামনে।

"খোল্ একটা খন্তা। মা বেটী অনেকক্ষণ গেলেনি কিছু। জয় মা ভীমা ভবানী।"

দূর থেকে পক্কা রামহরি চিৎকার করে উঠল—"জয় বাবা শ্মশান-ভৈরব—জয় বাবা সাঁই গোসাঁই।"

অনেকক্ষণ ধরে অনেকের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল জয়ধ্বনি। বোতলে মুখ লাগিয়ে অর্ধেকটা শেষ করে ফেললাম।

খেল্ খেল্ খেল্।

ভেলকি-বাজির খেল্। ভাঁওতা-বাজির বিজয়বৈজয়ন্তী উড়ছে উদ্ধারণপুরের

ঘাটে। ভৌতিক ব্যাপার, ভুতুড়ে কাণ্ড সব। জলন্ত চিতার ওপর মড়া উঠে বসে, খাটের ওপর মড়া পাশ ফিরে শোয়, উদ্ধারণপুর ঘাটের আনাচে কানাচে নরকঙ্কাল ধেই ধেই করে নাচে। ঐ যে বড় নিম গাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্মশানে ঢোকবার পথের মুখে, কতবার কত মড়া ঐ গাছটার ডাল ধরে দোল খেয়েছে। একবার একটা মড়া ত উঠেই বসে রইল গাছে পাঁচ দিন পাঁচ রাত। লালগোলা থেকে লালু ফকির এসে ধুলো-পড়া দিয়ে সেই মড়া নামায়। এ সমস্ত ব্যাপার ঘটত তখনকার দিনে, যখন ওই 'এল্' লাইন খোলে নি। লোকে 'এল্' গাড়ি চেপে ফস করে গয়া গিয়ে পিণ্ডি দিতে পারত না। অতন মোড়ল দেখেছে সে সব কাণ্ড। এখনও জল-জ্যান্ত বেঁচে রয়েছে মোড়ল। বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা কর গিয়ে তাকে।

অতন মোড়ল বলবে, তুড়ি দেওয়া আর তুড়ে দেওয়ার মধ্যে এতটুকু তফাৎ নেই বাপ। এইমাত্র যে গোবেচারার নাকের ডগায় তুড়ি দিয়ে একেবারে উড়িয়ে দিলে তাকে, পরমুহূর্তেই সে মরে গিয়ে আবার জ্যান্ত হয়ে তোমায় তুড়ে দিতে পারে। একেবারে চাক্ষুস সব দেখা কিনা অতন মোড়লের, কাজেই মোড়ল যা বলে সে সব কথা একেবারে ফেলনা নয়।

খন্তাও বললে সেই কথা।

বললে—"ওই রাঙা মুলো গোবর গণেশটাকে চিনে রাখ গোসাঁই। ওই মিটমিটে শয়তান একবার তুড়ি দিতে চেয়েছিল চরণদাস বাবাজীর নাকের ডগায়। তখন আমি তুড়েছিলাম ব্যাটা ছুঁচোকে। আবগারি দারোগা দু'টি হাজার গুণে নিয়ে তবে ওর ঘাড় থেকে হাত তুলে নিয়েছিল। হারামজাদা রক্ত-শোষা জোঁক, মান্ধাতা-আমলের তৈরী গাঁ-জোড়া ইঁটের পাঁজার ভেতর মুখ লুকিয়ে থাকে, দিন রাত ফরাসে গা গড়ায় আর ছুঁচোর মতলব ভাঁজে। ওই মাকাল ফলের জন্মে লোকে ঝি-বউ নিয়ে শান্তিতে বাস করতে পারে না গাঁয়ে। ইচ্ছে করছে, দি ব্যাটাকে ওর মায়ের সঙ্গে চিতেয় তুলে। মা-ব্যাটা দু'জনে গোল্লায় যাক্ এক সঙ্গে। লোকের হাড় জুড়োক।"

খন্তার কপালের ওপর কয়েকটা নীল শির দাঁড়িয়ে উঠেছে, নাকের গর্ত দুটো আরও মোটা দেখাচ্ছে, দাঁতগুলো আরও অনেকটা বেরিয়ে পড়েছে। যেন একটা ক্ষ্যাপা ঘোড়া, ঐ দাঁত দিয়ে দেবে এক কামড় আমার ঘাড়ে।

বললাম—"মালটা কিন্তু বড় খাসা এনেছে রে। খোল্ দেখি আর একটা বোতল, টেনে নি বাকীটুকু।"

খপ্ করে বোতলটা তুলে নিয়ে মারলে আছাড় খন্তা ঘোষ। বোতলটা চুরমার হয়ে গেল, মালটুকু শুষে নিলে উদ্ধারণপুরের শুকনো ভস্ম। আমার দিকে এক নজর রক্তচক্ষু ফেলে দুমদাম করে চলে গেল খন্তা। বিশুদ্ধ বিলিতী মালের স্বর্গীয় সুবাসে উদ্ধারণপুরের বাতাস মাতাল হয়ে উঠল।

ভারি দমে গেল মনটা। লোকটা না হয় মাকাল ফল, রাঙা মূলো, ছুঁচো শয়তান, তা'বলে তার দেওয়া বোতলটা কি এমন দোষ করলে যে আছাড় মারতে হবে মাটির ওপর! লোকটার ভেতরে যাই থাকুক, বোতলের ভেতরে ত খাঁটি মাল ছিল। নাঃ, খন্তাটা চিরকালই গোঁয়ারগোবিন্দ রয়ে গেল।

নীলাঞ্চলের ঘোমটা-ঢাকা নীলাঞ্জনা সন্ধ্যা সেদিন এসে পৌঁছল না উদ্ধারণপুরের ঘাটে। বাসকসজ্জায় সজ্জিতা রাত্রি গঙ্গার ওপারে দাঁড়িয়ে রাগে হতাশায় ফোঁপাতে লাগল। এত জোড়া চোখের সামনে দিয়ে এতগুলো অত্যুজ্জ্বল আলোর চোখ-ধাঁধানো জলুসের মাঝখানে কি করে অভিসারে আসে বেচারা চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে! এল না সুপ্তি, জেগে রইল উদ্ধারণপুরের শ্মশান, জেগে রইল গঙ্গা, আর একান্ত নির্দয় ক্ষমাহীন সত্যের মত তন্দ্রাহীন চোখে বসে রইলাম আমি—আমার সেই তিন হাত পুরু গদ্দির ওপর চেপে। মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুরের জননী চন্দন কাঠের চিতার ওপর চড়ে মহাসম্মানের সঙ্গে পুড়তে লাগলেন। যে বহুমূল্য গরদের চাদরখানি চাপা দিয়ে এসেছিলেন তিনি, সেখানি তখন বিছানো হয়েছে আমার গদ্দির ওপর। চাঁপা ফুলের গন্ধ বার হচ্ছে তা থেকে, আর ওধারে চন্দন কাঠ পোড়ার গন্ধে উদ্ধারণপুরের বাতাস ঘুলিয়ে উঠেছে।

শেষ পর্যন্ত সবই নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল। বড় বড় গামলায় এসেছিল রসগোল্লা, ঝোড়ায় ঝোড়ায় এসেছিল লুচি আর বাক্স ভর্তি এসেছিল বিলিতী মদ। সব গেল ফুরিয়ে, চিতা নিভে এল, আরও গোটা দুই বোতল দিয়েছিলেন ওঁরা আমাকে, তাতে আর কিছু রইল না। একশ কলসী জল দিয়ে ধোয়া হল চিতা। দুধের মত সাদা করে ধুতে হবে কিনা, কারণ কুমার বাহাদুরের মা আবার যদি জন্মান কোথাও তবে যেন রাজরানীর রূপ নিয়েই জন্মান।

ম্লানমুখী শুকতারা বিদায় নিচ্ছে উদ্ধারণপুরের আকাশ থেকে। কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিচ্ছে। আঁধার পর্দার আড়ালে রোজ যে খেলা দেখানো হয় উদ্ধারণপুর ঘাটে, সৌভাগ্যবতী শুকতারা ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে তার দিকে। ওই তার একমাত্র সাক্ষী। কিন্তু বড় নিরাশ হতে হয়েছে বড় লোকের মায়ের জন্যে, সেদিন আর কোনও কিছুই দেখতে পেল না শুকতারা। তার বদলে আলো গান হৈ হল্লায় বেচারার মেজাজ বিগড়ে গেছে।

চমকে উঠলাম।

কোথায় পালিয়ে গেল এক গণ্ডা বিলিতী বোতলের মহামহিম মর্যাদা। কান পেতে শুনতে লাগলাম—

"পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াই
পাড়ার লোকে মন্দ কয়।
ও সে পরের মন্দ পুষ্প-চন্দন
অলঙ্কার পরেছি গায়।"

নেমে আসছে বড় সড়ক থেকে। একতারা আর খঞ্জনী বাজছে। আবার শোনা গেল নারীকণ্ঠ—

"গৌর-প্রেমে হইয়াছি পাগল
ঔষধে আর মানে না।
চল সজনী যাইগো নদীয়ায়।"

তারপর নারীপুরুষ দ্বৈত-কণ্ঠে—

"ও সে গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দংশিয়াছে আমার গায়।"

কাছে এসে পড়েছে। খালি বোতল-কটা লুকিয়ে ফেলে কুমার বাহাদুরের মা'র গায়ের গরদখানা গদি থেকে তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে বেশ ভক্তিযুক্ত হয়ে বসলাম।

এসে পড়ল দু'জনে আমার সামনে। মাথা দুলিয়ে নাচতে লাগল চরণদাস—

"ও সে গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দংশিয়াছে আমার গায়।"

দু'চোখ বোজা নিতাই হেলেদুলে ঘুরতে লাগল তার চারদিকে—

"ও সে পরের মন্দ পুষ্প-চন্দন অলঙ্কার পরেছি গায়।"

উদ্ধারণপুরের আলো।

আলো আঁকে আলপনা।

গঙ্গার কিনারায় ঝাঁকড়া পাকুড় গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আলো-আঁধারি রঙের পোঁচ টানে উদ্ধারণপুরের খামখেয়ালী পটুয়া। সাদা হাড় আর কালো কয়লার ওপর উদ্ভট সব কল্পনার কারসাজি খেলিয়ে আপন প্রিয়ার চোখে ধুলো দিতে চায়।

আলোর প্রিয়া ছায়া।

ছায়া আসে নাচতে নাচতে। নির্ঝঞ্ঝাট নির্বিকার নির্বিরোধী ধ্বংসের বুকে চটুল চরণে নাচে রূপসী আলোক-প্রেয়সী। প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠে এক একটি স্বর্ণকমল। ফুলে ফুলে ঢাকা পড়ে যায় অবিনশ্বর ধ্বংসের শাশ্বত স্বরূপ। রাশি রাশি প্রস্ফুটিত স্বর্ণকমলের মাঝে আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে।

আলোক-মিথুন নৃত্য দেখতে অলক্ষ্যে এসে দাঁড়ায় অসংখ্য ছায়াদেহ। নৃত্যের ছন্দে দোলা ওঠে সেই সব রক্তমাংসবর্জিত ছায়া দিয়ে গড়া কায়ার বুকে। তারাও নাচে, নাচে এক অশরীরী অশ্লীল নাচ। সেই নাচের হুল্লোড়ে রাশি রাশি স্বর্ণকমলের মাঝে হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হয় একটি কন্যা।

আশা।

ছায়ার গর্ভে আলোকের ঔরসে তার জন্ম। ভূমিষ্ঠ হয়েই ককিয়ে কেঁদে ওঠে সেই মেয়েটি। কচি কচি হাত দু'খানি বাড়িয়ে জননীকে আঁকড়ে ধরতে চায়।

সভয়ে দূরে সরে যায় ছায়া। আপন গর্ভজাতা কন্যার নাগালের বাইরে পালায়। আলোর আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

কন্যার কুৎসিত কান্নায় শিউরে ওঠে আলো। ঘৃণায় বিদ্বেষে কালোয় কালো হয়ে যায় তার মুখ। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে একটা অস্বাভাবিক দ্যুতি।

আলোর চোখের আঁচে শুকিয়ে যায় স্বর্ণকমলগুলি, তার সঙ্গে শুকিয়ে যায় তার কন্যাটিও। আলোক-কন্যা আশা ভস্মীভূত হয় আপন পিতার চোখের আগুনে। তার সঙ্গে অশ্লীলতাও ভস্ম হয়ে মিশে যায় উদ্ধারণপুরের ভস্মের সঙ্গে।

হয় কি ষোল আনা ভস্মসাৎ ?

কিছুতে হয় না, হতে পারে না। উদ্ধারণপুরের ভস্মের গর্ভে আশা আর অশ্লীলতা ধিকিধিকি পুড়ছে। ছাই চাপা আগুন—একটু হাওয়া পেলেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে।

জ্বলে ওঠে মানুষের দুই চক্ষে।

গঙ্গার কিনারায় ঝাঁকড়া পাকুড় গাছটার তলায় জ্বলছে দুটি চক্ষু। চক্ষু দুটিতে আশা আর অশ্লীলতা ফণা ধরে নাচছে। শ্বেতবরণী সাপিনী দুটি। শ্বেতবরণী সাপিনীর চোখে চোখে বিষ। চোখ দিয়ে ছোবলায় ওরা। যাকে ছোবলায় তার আর হুঁশ জ্ঞান থাকে না।

নিতাই বোষ্টমী দু'চোখ বুজে নেচে নেচে ঘুরছে আর মন্দিরা বাজাচ্ছে।

"ও সে গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দংশিয়াছে—"

করলে দংশন নিতাইকে। বিষে জর্জরিতা নিতাই মন্ত্রমুগ্ধা ফণিনীর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার কণ্ঠস্বর গেল স্তব্ধ হয়ে, হাতের মন্দিরা গেল থেমে। এক দৃষ্টে সে চেয়ে রইল আশা আর অশ্লীলতার দিকে। একেবারে অচৈতন্য বেহুঁশ।

বাবাজী তখনও চোখ বুজে মাথা দুলিয়ে গাইছে—

"চল সজনী যাইগো নদীয়ায়।"

কোথায় সজনী! কে যায় নদীয়ায় তার সঙ্গে! সজনীর সাড়া মেলে না। সাড়া না পেয়ে চোখ মেলে চাইলে বাবাজী।

পরমুহূর্তেই তার একতারায় অন্য সুরের ঝঙ্কার উঠল। নিতাইয়ের চতুর্দিকে নেচে নেচে ঘুরতে লাগল চরণদাস।

"মধুবনেতে কালো বাঘ এসেছে
রাধে যাসনে যাসনে।
কদম্বতলে সে যে থানা করেছে
রাধে যাসনে যাসনে।"

বাঘের বর্ণ কিন্তু কালো নয়। নিতাইয়ের মতই বর্ণ বাঘের। প্রায় কাঁচা হলুদের রঙ। সন্ত কাছা গলায় দিয়েছে। পাতলা ফিনফিনে কাপড় আর চাদরে গায়ের রঙ চাপা পড়েনি। অবিন্যস্ত ভিজে কোঁকড়ানো চুল কপাল

ছাপিয়ে মুখের ওপর নেমেছে। ক্লান্তিতে বিরক্তিতে চেহারাটা হয়ে উঠেছে করুণ। মায়ের শোকে হুজুরকে যেমন দেখানো উচিত ঠিক তেমনই দেখাচ্ছে। ছোটলোকেরা শোকে বুক চাপড়ে কাঁদতে পারে, কিন্তু হুজুর তা পারেন না। কাজেই তিনি হয়ে উঠেছেন আরও গম্ভীর, শোকের মহিমায় আরও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছেন হুজুর।

ধীর পদে এগিয়ে এলেন তিনি। ওদের পাশ দিয়েই চলে এলেন। এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে।

চরণদাস তখনো গাইছে—

"পথে যেতে আছে ভয়
একা যাওয়া ভাল নয়
রমণী-হরিণীধরা ফাঁদ পেতেছে,
রাধে যাসনে যাসনে।"

আর "যাসনে যাসনে!"

কে শোনে কার মানা!

ত্রস্ত পদে এগিয়ে এল নিতাই। এসে দাঁড়ালো তাঁর পাশে। চোখ দুটি ছলছল করছে বোষ্টমীর, নাকের ডগাটি লাল হয়ে উঠেছে। রুদ্ধকণ্ঠে ডাক দিলে—"কুমারবাবু!"

মুখ ঘুরিয়ে চাইলেন কুমার। অতি মৃদুস্বরে বললেন—"হাঁ বোষ্টমী, মাকে আজ রেখে গেলাম এখানে।"

বোষ্টমীর গলা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

"কিন্তু রানী-মা যে বলেছিলেন, মা যে আমায় কথা দিয়েছিলেন—"

নত চোখে উত্তর দিলেন কুমার—"আমি জানি সে কথা। তোমায় নিয়ে বৃন্দাবনে যাবেন বলেছিলেন মা। যাও তোমরা বৃন্দাবনে, আমি খরচ দোব।"

নিতাইয়ের মাথা নুয়ে পড়েছে তখন।

শেষ পদটি গাইছে চরণদাস।

"ও বাঘের চোখে চোখে হলে দেখা
নিশ্চয়ই মরণ লেখা গো—"

আমার দিকে চেয়ে বললেন কুমার—"এবার আমাদের আদেশ দিন, আমরা যাই, যদি কখনও প্রয়োজন হয়, অধমকে স্মরণ করবেন কৃপা করে।"

মুখ তুলে ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে নিতাই,"বউরানী! বউরানী। এখন—"

হাসলেন কুমার। উদ্ধারণপুরের ঘাটে যে রকম হাসি মানায়, সেই জাতের হাসি হাসলেন তিনি।

অবিশ্বাস্য রকম নিস্পৃহ কণ্ঠে বেশ থেমে থেমে বললেন—"আর ত ফিরবে না সে বোষ্টমী। আমার মত মানুষকে পা দিয়ে ছুঁতেও যে তার ঘেন্না করে।"

বড় সড়কের ওপর একসঙ্গে বহু কণ্ঠ গর্জন করে উঠল।

"বল হরি হরি বোল।"

অর্থাৎ সাঙ্গপাঙ্গরা তাদের হুজুরকে ডাক দিচ্ছে।

জোড় হাতে আমায় প্রণাম করে কুমার পা বাড়ালেন। ছায়ার মত নিতাই চলল তাঁর পিছু পিছু।

চরণদাসের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেছে। একতারা হাতে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে—"পেসাদ দাও গোসাঁই। বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেছে। ধোঁয়া দিয়ে না তাতালে চলছে না আর।"

তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

বাবাজীর মসীবর্ণ মসৃণ মুখের চামড়া বড্ড বেশী শুকিয়ে গেছে যেন। কোনওকালেই চরণদাসের গোঁফ দাড়ি কিচ্ছু নেই, মনে হয় ঐ সমস্ত আপদ কোনওদিন গজায়ও নি ওর মুখের ওপর। বয়স ও দেহের তুলনায় মুখখানি বেশ একটু মেয়েলী ধাঁচের বলে মনে হয়। অহর্নিশ গাঁজা টানার ফলে আঁখি দুটিও বেশ ঢুলু ঢুলু হয়ে থাকে। মনে হল, এ যেন সেই চোখ সেই মুখ নয়। হাতের কাঁধের বুক পিঠের সদাজাগ্রত পেশীগুলোও যেন কেমন ঢিলে ঢিলে দেখাচ্ছে।

হাতের একতারা আর কাঁধের ঝুলিটা একান্ত অবহেলায় মাটিতে ফেলে তার পাশে বসে পড়ল চরণদাস। দেহটাকে পায়ের ওপর খাড়া রাখবারও আর শক্তি নেই যেন তার। বসে পড়ে মাথা হেঁট করে দু'হাতে কপালটা সজোরে টিপে ধরে রইল।

গদির তলায় খুঁজতে খুঁজতে এক চাপড়া গাঁজা বার করলাম। চরণদাস চেয়েও দেখে না, মাথাও তোলে না। কাজেই নিজে টিপতে লাগলাম গাঁজাটা।

উদ্ধারণপুরের আলো।

আলো জ্বালায় আগুন।

যে আগুন চিতার বুকে দাউ দাউ করে জ্বলে আর হাড় মাংস খায়, এ

আগুন সে আগুন নয়। চিতার আগুনের রঙ লাল, আলোর আগুনের রঙ সাদা। চিতার আগুনের দিকে চেয়ে থাকলে চোখ জ্বালা করে না, আলোর আগুনে চোখ ঝলসে যায়। চিতার আগুনের বুকভরা করুণা, একবার তার বুকে আত্মসমর্পণ করলে নিঃশেষে শেষ করে ছাড়ে। আলোর আগুনের বুকে দয়া নেই, মায়া নেই। সে আগুন শুধু জমায়, টলটলে তরল পদার্থকে জমিয়ে কঠিন করে ছাড়ে। এমন কঠিন করে ছাড়ে যে তখন সেই পদার্থের ওপর ভেতর নিরেট নীরন্ধ্র অন্ধকারে একেবারে বোবা হয়ে যায়।

আর একবার বড় সড়কের ওপর হুঙ্কার শোনা গেল।

"বল হরি হরি বোল।"

দূরে সরে যেতে লাগলো ওখানকার সোরগোলটা। হাতের তেলোয় টিপতে লাগলাম রসকষশূন্য গাঁজাটুকু। নরম করতে হবে, দু' ফোঁটা জল চাই। কিন্তু জল কোথায়—আমার দু'হাত পুরু গদির ওপর। দোব নাকি কয়েক ফোঁটা বোতলের জল!

না, এ জিনিসের সঙ্গে ও জিনিস অচল। এ বড় সাত্ত্বিক জাতের দ্রব্য, দু' ফোঁটা কাঁচা গো-দুগ্ধ দিয়ে টিপতে পারলে তবে এর পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা হয়। গো-দুগ্ধ অভাবে মনুষ্য-দুগ্ধ! তাই করেছিলেন একবার আগমবাগীশ। তাঁর শক্তির কাছ থেকে দুধ চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে বানিয়েছিলেন এই কালভৈরবের ভোগ। অতন মোড়ল নাকি স্বচক্ষে দেখেছিল আর প্রসাদও পেয়েছিল সেই কলকের। তারপর থেকে অতন যখন আসে তখন রামহরির বউ দেয় তাকে কয়েক ফোঁটা দুধ।

অন্য চেষ্টাও করে দেখেছে অতন মোড়ল। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। কাজেই রামহরির বউ দুধ দেয়। অতন মোড়ল ন্যাংটা চণ্ডীর দেয়াসি, তিন তুড়ি দিয়ে ডাকিনী নামাতে পারে। সে চাইলে কোন্ সাহসে না বলবে রামহরির বউ!

চরণদাস বাবাজী কিন্তু জল দিয়েই গাঁজা ডলে। কারণ নিতাই বোষ্টমী পাষাণে বুক বেঁধেছে

"আমি পাষাণে বাঁধিয়া বুক
নীরবে সহি যে দুঃখ গো
আমার বন্ধু যদি পারিত গো জানতে।"

ফিরে আসছে নিতাই। বন্ধুকে বিদেয় দিয়ে ফিরছে। বড় সড়ক থেকে নেমে আসছে নিমগাছতলা দিয়ে।

"সখী গো
কেমনে ভুলিব প্রাণকান্তে।"

আহা, প্রাণকান্তের জন্যে বেচারীর বুক মুচড়ে গলা দিয়ে সুর বার হচ্ছে।

"অভাগী রাধারে ভুলে
বন্ধুয়া রইল গোকুলে গো
বিধি আমায় জনম দিল কান্‌তে।"

চরণদাসের পিছনে এসে দাঁড়ালো নিতাই। বোধ হয় নেহাৎ অভ্যাস-দোষেই হাত বাড়িয়ে একতারাটা তুলে নিলে চরণদাস। চোখ বুজে মাথা হেঁট করেই বসে রইল সে। শুধু একটা আঙুল ঠিক তালে তালে চলতে লাগল একতারার ওপর। ওর পিছনে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মন্দিরায় বোল তুলে নিতাই গাইলে—

"আমি অবলা কুলের বালা
কত বা সহিব জ্বালা গো—"

একতারা হাতে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো বাবাজী। মন্দিরার সঙ্গে একতারা তখন সমানে ঝঙ্কার দিচ্ছে।

আবার নিতাই গাইলে—

"আমি অবলা কুলের বালা
কত বা সহিব জ্বালা গো—

বাবাজী আর থাকতে পারলে না। তখনও তার দু'চোখ বোজা, মাথা দুলিয়ে শরীর দুলিয়ে সে গেয়ে উঠল—

"এক জ্বালা বাঁশের বাঁশী
আর এক জ্বালা বসন্তে।"

তারপর দু'জনের গলা মিলে গেল—

"সখী গো—
কেমনে ভুলিব প্রাণকান্তে।"

তখনও পর্যন্ত শুকনো গাঁজাটা রয়েছে আমার হাতের তেলোয়। সেটার

দিকে নজর পড়তে নিজের ওপর বিরক্তিতে ভরে গেল মনটা। না, এ জিনিস থেকে রস বার করা আমার কর্ম নয়। চরণদাস বাবাজী পারে, পাষাণ থেকেও রস ঝরাতে পারে ও। জল দুধ কিছুই ওর লাগে না। লাগে যা তার নাম মধু। চরণদাসের মধু জমা আছে নিজের বুকের মধ্যে। তাই দিয়ে ও পাষাণ-বাঁধা বুকেরও মধু ক্ষরণ করতে জানে।

দূর ছাই, গাঁজাটুকু টেনে ফেলে দিলাম একটা চিতার দিকে।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

ঘাটের উত্তর সীমায় আকন্দ গাছের জঙ্গলের সামনে উঁচু ঢিবির ওপর অজস্র লেপ কম্বল তোশক কাঁথার তৈরী রাজপাট। রাজপাটে বসে রাজঠাট বজায় রেখে চলতে হয়। রাজতন্ত্রে হৃদয়-দৌর্বল্যের স্থান নেই। মায়া-মমতা প্রেম-প্রীতি মান-অভিমান মিলন-বিরহ এই সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাণ্ডকারখানা রাজধর্মের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। এগুলোকে বাদ দিয়ে যা থাকে তার নাম রাজঠাট।

উদ্ধারণপুরের আকাশ বাতাস আলো ষোল আনা রাজঠাট বজায় রাখে। আকাশে ওঠে কান্নার রোল—"ওগো আমার কি হ'ল গো, আমায় ছেড়ে কোথায় তুমি গেলে গো!" বাতাসে শোনা যায় গান—"কেমনে ভুলিব প্রাণকান্তে!" আর উদ্ধারণপুরের আলো—আলো ক্ষুব্ধ আক্রোশে জলতে থাকে—"কোথা গেল ছায়া?" ছায়া নেই। ছায়া অন্তর্ধান করেছে। আলোক-প্রিয়া আপন বল্লভের অঙ্গের আঁচে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রাজশক্তির আলো ছায়া সহ্য করতে পারে না।

খন্তা ঘোষ সইতে পারে না কান্না। কোথা থেকে তেড়ে এসে এক ধমক লাগালে।

"আঃ, কান ঝালাপালা হয়ে গেল বাপু তোমাদের মড়াকান্নার জালায়। এখানে এসে যে একটু জুড়োব তারও উপায় রাখলে না তোমরা। গেলেই পারতে তোমাদের প্রাণকান্তর সঙ্গে। পালকির পাশে দাঁড়িয়ে আঁচলে চোখ মুছছিলে ত। ফিরে এলে কেন আবার? একবার যাব বললে সে তোমাদের দু'জনকেই পালকিতে তুলে নিয়ে যেত। খামকা এখানে নেচে নেচে মড়াকান্না জুড়েছ কেন?"

কটাং করে একতারার তার গেল কেটে। একটা মন্দিরা খসে পড়ল বোষ্টমীর হাত থেকে। চেঁচাতে লাগল খন্তা ঘোষ।

"তোমাদের জাতের ত কিছু আটকায় না। ঘরভাঙানো তোমাদের ব্যবসা। যাও না যাও, গিয়ে ওঠ ঐ বাবুর মান্ধাতা-আমলের ভূতুড়ে বাড়িতে। চোদ্দ পুরুষ যাতে ভূতের নাচ নাচতে পারে সেই জন্যে অত বড় বাড়ি বানিয়ে গিয়েছিল ওর ঠাকুরদাদার বাবার বাবা। এখন সব দিকে সুবিধে, সেই বউ ছুঁড়িও সহ্য করতে না পেরে বাবুর মুখে লাথি মেরে পালিয়েছে। এক আপদ ছিল মা, তিনিও গেলেন। এবার বাবুর পোয়া বারো। এমনও হতে পারে, বাবু মোহন্তকে তাঁর বৃন্দাবনের ঠাকুরবাড়ির সেবায়েত করে সেখানে পাঠিয়ে দেবেন। এখানে নিরালায় নির্ঝঞ্ঝাটে বোষ্টমীর কাছে দুটো রাধা-কেষ্টর প্রেমকথা শুনবেন বাবু। আর—"

চিলের মত চিৎকার করে উঠল নিতাই।

"খন্তা—"

উদ্ধারণপুরের আলো ঠিকরে বার হচ্ছে নিতাইয়ের দু'চোখ দিয়ে। যে আলোর আগুনে টলটলে তরল পদার্থ জমে কঠিন হয়ে যায়।

হঠাৎ একেবারে খাঁড়ার চোপ পড়ল খন্তার গলায়। অদ্ভুতভাবে সে সামান্যক্ষণ চেয়ে রইল নিতাইয়ের মুখের দিকে। তারপর আমার দিকে ফিরে আমাকেই একটা ধমক লাগিয়ে দিলে।

"মজা করে নাচ গান দেখে ত সময় কাটাচ্ছ। ওপারে দারোগা এসে বসে আছে যে তোমার জন্যে। তোমাকে ধরে নিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছিল সেপাইদের। তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা করে বসিয়ে রেখে এসেছি। নাও, এখন চল আমার সঙ্গে। একটা দুটো নয়, তিনটে মানুষ খুন হয়েছে, সে সম্বন্ধে তোমায় জিজ্ঞেস-পড়া করবে দারোগা সাহেব।"

আঁত্‌কে উঠলাম—"খুন! কে হল? কোথায়?" বলতে বলতে লাফিয়ে পড়লাম গদি থেকে।

"চল্ চল্, দেখি গিয়ে, কে আবার খুন হল কোথায়?"

ওপাশ থেকে হেঁড়ে গলায় কে বললে—"আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না বাবা, আমিই এসে গেছি।"

খাকী কাপড়ে মোড়া সাড়ে-তিন-মনী একটা সচল মাংসপিণ্ড সামনে এসে

দাঁড়ালো বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে। দুই থাবা কচলাতে কচলাতে হেঁ হেঁ করে হাসতে লাগল বিদ্‌ঘুটে হাসি। নিরীহ হরিণের বুকের ওপর চেপে বসে হায়নারা বোধ হয় এই জাতের হাসি হাসে।

"আমিও আপনার একটি অধম সন্তান বাবা। এ অধমের নাম হচ্ছে সাধুরাম সমাদ্দার। লোকে বলে সমাদ্দার দুঁদে দারোগা। দুঁদে না হলে কি পুলিশের কাজে উন্নতি করতে পারে রে বাবা। কিছুতেই পারে না। অন্য দারোগা যেখানে সাত ঘটি জল খাবে, সমাদ্দার সেখানে এক চালে বাজিমাৎ করে দেয়। এই যে একটি ঢিলে দু'টি পাখী বধ করে বসলাম, এ কি খেলৃত অন্য কারও মাথায়? এই বেটা খন্তারও ত দুঁদে বলে নামডাক আছে। ও বেটাও ত ধরতে পারলে না আমার মতলব। দিব্যি ফাঁদে পা দিলে। আর আমিও চলে এলাম ওর পিছু পিছু। আড়ালে দাঁড়িয়ে স্বকর্ণে শুনলাম, খন্তা কি বললে আপনাকে। স্বচক্ষে দেখলাম, খুনের কথা শুনেই কি ভাবে আপনি আঁত্‌কে উঠে ছুটেছিলেন পুলিশের কাছে। ব্যাস্‌, হয়ে গেল। সমাদ্দারের এক আঁচড়েই সব সাফ হয়ে গেল। কি রে বেটা ঘোষের পো, হাঁ করে চেয়ে আছিস যে মুখের দিকে! মাথায় ঢুকল কিছু?"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে খন্তা শুধু মাথা নাড়লে।

দারোগা সাহেব আবার হাসতে লাগলেন তাঁর সেই হায়না মার্কা হাসি। হাসির চোটে পেটের মাংসপিণ্ড ওঠানামা করতে লাগল। হাসি সামলে বললেন—"সাধে কি লোকে বলে যে চারকুড়ি বয়স না হ'লে তোদের মগজে কিছুই ঢোকে না। এই মগজ নিয়ে লোক চরিয়ে খাস কি করে—এ্যাঁ! এটুকু আর বুঝলি না যে খুন সম্বন্ধে তোর বা গোসাঁই বাবার যদি কিছু জানা থাকত তাহলে তুই বেটা এসেই গোসাঁইকে সটকাবার মন্তর দিতিস। আর বাবাও কে খুন হল তা জানবার গরজে পুলিশের কাছে ছুটতেন না।"

ফাঁক পেয়ে আমিই জিজ্ঞাসা করে বসলাম, "কিন্তু কে খুন হল? কোথায় হল খুনটা?"

দারোগা সাহেব তাঁর ধামার মত মাথাটা এপাশে ওপাশে দোলাতে দোলাতে বললেন—"সে আমরা জানতে পারবই। লোক তিনটে এই শ্মশান থেকে ফিরে যাচ্ছিল। তাদের থানা থেকে তুলে থানায় পাঠিয়ে দিয়েছি। ডাক্তারবাবু আমাদের খুব কাজের মানুষ। যে করে হোক ওদের তাজা করে তুলবেনই। আজ হোক, কাল হোক, জ্ঞান ফিরে আসবেই ওদের। এমন

কিছু বেশী চোট নয়। বেমক্কা লাঠি ঝেড়েছে ওদের ঠ্যাঙে। আশ্চর্য কাণ্ড হচ্ছে তিনজনেরই ঠ্যাং ভেঙেছে একভাবে। যারা ভেঙেছে তারা টাকা-কড়ি কাপড়-চোপড় কিছুই নেয় নি।"

খন্তা বললে—"শ্মশান থেকে যারা ফিরে যাচ্ছিল তাদের কাছে থাকবেই বা কি হাতি-ঘোড়া। তারা যে শ্মশান থেকে ফিরছিল এ আপনারা জানলেন কি করে?"

সমাদ্দার সাহেব বললেন, "রাস্তায় যে গ্রামে তারা রাত কাটিয়েছে সেই গ্রামের লোকে বললে। আরে বাপু, সন্ধান না করেই কি এখানে এসে পড়েছি আমি? অত কাঁচা ছেলে নই। বাবার কাছেই একেবারে এসে গেলাম। বাবাকে দর্শন করাও হল। পুলিশের চাকরি করি হাজার ইচ্ছে থাকলেও ত সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করতে পাই না। বাবার কৃপা হলে হয়ত লোক তিনটের পরিচয়ও পেয়ে যাব। মানে লোক তিনটেকে হয়ত বাবা চিনে ফেলতেও পারেন।"

বললাম—"দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারব। কবে মার খেয়েছে তারা, কোথায় মার খেয়েছে?"

"কবে যে মার খেয়েছে তা ত বলতে পারব না বাবা। শক্তিপুরের মাঠের পশ্চিম দিকে বাঁধা বটতলার ওধারে একটা খানার ভেতর ওদের পাওয়া গেছে পরশু দুপুর বেলা। একজনের গলার পৈতে রয়েছে, আর এই এতবড় একটা সোনার কবচ ছিল তার গলায়। দেখুন ত বাবা এই কবচটা। এতবড় একটা কবচ গলায় ঝুলিয়ে যে মড়া পোড়াতে এসেছিল তার ওপর সকলের নজর পড়বেই।"

বলতে বলতে প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কালো সুতোয় বাঁধা একটা সোনার কবচ বার করলেন তিনি। দূর থেকে ওটা দেখেই আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম—"জয়দেব, জয়দেব ঘোষাল। বিষ্টুকুরির জয়দেবকে আমি ঐ কবচ তৈরী করে দিয়েছিলাম। ওটা গলায় ঝুলিয়েই ও সেদিন ওর পাঁচবারের বউকে পোড়াতে এনেছিল। কবে যেন? কবে যেন এল জয়দেব?"

মনে করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম।

দুঁদে দারোগা সমাদ্দার নিজের উরুর ওপর একটি বিরাশি সিক্কা ওজনের থাপ্পড় মেরে বললেন—"ব্যাস ব্যাস, কাম ফতে হো গিয়া। আর আপনাকে কষ্ট দোব না বাবা। ওতেই আমার কাজ হয়ে গেল। বিষ্টুকুরির জয়দেব ঘোষাল। ব্যাস, এর বেশী আর জেনে লাভ নেই পুলিশের। ডায়রিতে লিখে

রেখে দোব। জ্ঞান হলে জয়দেবরা যদি কারও নাম করে ত তাকে ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করা যাবে তখন। মাতাল তিনটেকে কারা ঠ্যাঙালে তার জন্যে পুলিশের মাথাব্যথা নেই। যাক্ গে যাক্, ও সমস্ত নোংরা ব্যাপার।"

সাধুরাম সমাদ্দার ঠ্যাং-ভাঙার প্রসঙ্গটা একেবারে চুকিয়ে দিয়ে ভুঁড়ির ওপর থেকে আধ বিঘত চওড়া চামড়ার পেটিটা খুলে ফেললেন। খুলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

বললেন—"এখন একটু বসি বাবার চরণের তলায়। শালার এমন কপাল নিয়ে এসেছি যে মরবার ফুরসৎটুকুও জোটে না কপালে। আজ যখন এসে পড়েছি তখন জুড়িয়েই যাই প্রাণটা।"

বিনয়ের অবতার মোহন্ত চরণদাস তাড়াতাড়ি তার বগলে-ঝোলানো সরু মাদুরখানা খুলে পেতে দিলে। বহু কষ্টে তার ওপর দেহভার রক্ষা করলেন দারোগা সাহেব।

খন্তা তার সব ক'খানা দাঁত বার করে বললে—"তা'হলে এখন একটু ইয়ের ব্যবস্থা করি হুজুর ?"

হুজুর বললেন—"আলবৎ করবি। বাবার প্রসাদ না পেয়ে কি উঠব নাকি মনে করেছিস এখান থেকে ? খাঁটি জিনিস আনবি রে ব্যাটা, এমন জিনিস আনবি—যা জ্বলে। বাবার মুখের মহাপ্রসাদ পাব আজ। শালার রাজারাজড়ার কপালে যা কখনও জোটে না সেই জিনিস খেয়ে আজ আমার জন্ম সার্থক হবে।"

খন্তা ছুটল।

এধারে ওধারে চেয়ে দেখলাম। নিতাই গেল কোথা ? বোধ হয় গঙ্গায় গেল মুখ হাত ধুতে।

যাক্ গে—নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে বসলাম গদ্দির ওপর।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

ঘাটের প্রান্তে অবিশ্রান্ত কপাল কুটছে গঙ্গা। কপাল কুটছে আর কাঁদছে। অভিমান উথলে উঠছে ছলাৎ ছলাৎ করে। গঙ্গা সঙ্গের সাথী করে নিয়ে যেতে চায় উদ্ধারণপুরের ঘাটকে। নিয়ে যাবে সাগরে, সাগরের অতল তলে গিয়ে আশ্রয় নেবে দু'জনে।

সাগরের অতল তলে মড়া নিয়ে শেয়ালে শকুনে ছেঁড়াছিড়ি করে না, জ্যান্ত মানুষের তাজা রক্ত-মাংসের লোভে মানুষে মানুষে কামড়া-কামড়ি করে না

সেখানে। হাহাকার হাংসাপনা রেষারেষি পৌঁছতে পারে না সাগরের জলের তলে। মুক্তির নির্মল আনন্দে শুক্তিরা ঘুরে বেড়ায় সেখানে। তাই ত তারা দিতে পারে মুক্তার জন্ম। আসল মুক্তায় কলঙ্ক পড়ে না কখনও। উদ্ধারণপুরের কালো মাটির কলঙ্ক ঘোচাবার জন্যে গঙ্গা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে চায় সাগরে।

গঙ্গার কিনারায় একেবারে জলের ধারে গালে হাত দিয়ে বসে নিতাই একমনে শুনছে গঙ্গার কান্না। বেচারী আজ সাথীহারা। চরণদাস গেছে খন্তা ঘোষের মচ্ছবে খোল বাজাতে। কেষ্ট যাত্রার দল খুলবে খন্তা ঝুমুরী মেয়েদের দিয়ে। তাতে যদি ওদের পোড়া পেটের দাবি মেটে তাহলে আর মুখে "অঙ্" মেখে মানুষের মনে "অঙ্" ধরাবার ফাঁদ পাততে হবে না ওদের।

নিতাইয়ের বাইরেটাই রঙিন। দুধে-আলতার রঙে ছোপানো ওর বাইরেটা। ভেতরটা অন্ধকার, উদ্ধারণপুরের রাতের মত অন্ধকার। সেই অন্ধকার রাতেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওর বাইরেটার রঙ্! গদির ওপর বসেই বেশ দেখতে পাচ্ছি, একেবারে জলের ধার ঘেঁষে বসে আছে নিতাই। সন্ধ্যা থেকে ঠায় একভাবে বসে আছে ওখানে।

আর এক প্রাণীও জেগে নেই শ্মশানে। শুম্ভ-নিশুম্ভ ঘুমচ্ছে, শেয়াল-শকুনরা কে কোথায় লুকিয়ে শুয়ে পড়েছে, চিতাও একটা জ্বলছে না কোথাও। এরকম নিঝুম নিস্তব্ধ হয় না কখনও উদ্ধারণপুরের ঘাট। রাতে জ্যান্ত মানুষ থাকে না কেউ বটে, কিন্তু যারা জ্যান্ত নয় তারা ত থাকে তাদের অশরীরী শরীর নিয়ে আমার চার পাশে। আজ যেন তারাও নেই কেউ। বড় একা একা মনে হতে লাগল নিজেকে। ওই গঙ্গার কিনারায়-বসা রক্ত-মাংসের মানুষটির মত একা একা মনে হতে লাগল।

ডাক দিলাম—"সই, ও সই!"

মাথা তুলে মুখ ঘুরিয়ে চাইলে আমার দিকে। তারপর উঠে এল। গদির সামনে দাঁড়িয়ে বললে—"আমায় ডাকছ?"

বললাম—"তোমায় ডাকব না ত আর ডাকব কাকে? কে আর আছে এখানে।"

অনেকগুলো আধপোড়া কাঠ দিয়ে একটা ধুনি করে রেখে গেছে রামহরি। ওটাকে খোঁচালে আলো পাওয়া যায়। এই হচ্ছে আমার আলোর ব্যবস্থা।

গদির ওপর বসে যাতে খোঁচাতে পারি তার জন্যে হাতের কাছে একখানা লম্বা সরু বাঁশও রেখে যায় রামহরি। বাঁশ দিয়ে খোঁচাখুঁচি সুরু করলাম ধুনিটাতে।

একটু চুপ করে থেকে নিতাই বললে—"কি জন্যে ডেকেছ বললে না ত?"

তাই ত! কি জন্যে ডাকলাম ওকে? কেন ওকে ডেকে তুলে আনলাম ওখান থেকে? কেন? কি বলবার আছে আমার? বলব কি ওকে এখন? কিছু না বলতে পারলে ও ভাববে কি?

ধুনিটা এবার বেশ জলে উঠল। আগুনের লাল আভা পড়ল নিতাইয়ের মুখের ওপর। সেদিকে একবারটি চেয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। নিয়ে আবার একমনে খোঁচাখুঁচি করতে লাগলাম ধুনিটায়।

খিলখিল করে হেসে উঠল নিতাই। বললে—"কি করে খুঁচিয়ে আগুন জ্বালাতে হয় তাই দেখাবার জন্যে ডাকলে বুঝি আমাকে?"

তাড়াতাড়ি চাপা দিতে চেষ্টা করলাম ওর প্রশ্নটায়—"না না, তা কেন, তা কেন। মানে একলাটি ওভাবে বসে আছ ওখানে, মানে ওধারে সাপখোপের ভয়ও ত আছে।"

একান্ত ভালমানুষি গলায় নিতাই বললে—"ও তাই বল, সাপখোপের ভয় আছে বুঝি জলের ধারে। কিন্তু তোমার ঐ গদির ভেতরেও ত অনেকগুলো সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে গোসাঁই।"

বাঁশটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল আমার। সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, "সাপ! সাপ থাকবে আমার গদির ভেতর লুকিয়ে?"

"কেন? থাকতে নেই নাকি? আছে গোসাঁই আছে, সাপ আছে সর্বত্র, কোনটা ছোবল দিতে আসে, কোনটার ছোবলাবার ক্ষমতা নেই, কোনটা নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে শেকড়-বাকড় মন্ত্রতন্ত্রের জোরে। বিষ আছে, ছোবলাতে জানে অথচ কিছুতে ছোবলাতে পারে না, তেমন খেলা দেখানোই ত পাকা সাপুড়ের ওস্তাদি গোসাঁই।"

নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। নিতাইয়ের মুখে দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ। যা বলবার ত বলে শেষ করবেই ও।

অল্প একটু হেসে কপালের ওপর থেকে চুলগুলো এক হাতে সরিয়ে দিয়ে ও বললে—"গোসাঁই, খুঁচিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বড় মজা পাও তুমি। আগুন জলে আর তার তাপে তুমি গরম হও। কিন্তু এমন একজাতের আগুন আছে যা বরফের মত শীতল। সে আগুন একবার যদি জলে ওঠে তাহ'লে ঐ মড়ার গদি,

যার ওপর বসে তুমি রাজঠাট বজায় রাখছ, সেই গদি এমন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে উঠে পালাতে পথ পাবে না। তেমন আগুনের নাম শুনেছ কখনও ?"

অনেকটা সময়ে কেটে গেল। একভাবে চেয়ে রইল নিতাই আমার মুখের দিকে, বোধ হয় উত্তরের আশাতেই চেয়ে রইল।

অনেক চেষ্টায় অনেক কষ্টে শুধু বলতে পারলাম—"কিন্তু কি করেছি আমি তোমার সই ?"

ধীরে সুস্থে ওজন করে এক একটি কথা বলতে লাগল নিতাই—"কই না, কিছুই ত করনি। কিছু করবার গরজ আছে নাকি তোমার ? কেন কিছু করতে যাবে আমার জন্যে ? সুখে বসে আছ তুমি রাজসিংহাসনে, পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি সাত দরজায় ঝাঁটা লাথি খেয়ে। আমার মত রাস্তার কুকুরের জন্যে তুমি কিছু করতে যাবে কেন ? তোমার সুখশান্তির ব্যাঘাত হবে যে তাহলে।"

আঁকড়ে ধরবার মত একটা কিছু পেয়ে বর্তে গেলাম। বেশ অনুতপ্ত হয়েও উঠলাম। বললাম—"তা তোমরা রাগ অভিমান করতে পার বৈকি আমার ওপর। সত্যিই তোমাদের জন্যে কিচ্ছু করতে পারি নি আমি। বাবাজী ফিরে এলে আজ রাত্রেই পরামর্শ করে দেখব তিনজনে। সত্যিই তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে এই দেশে। কাশী বৃন্দাবন শ্রীক্ষেত্র এই রকম কোনও ধামে-টামে যদি একটি আখড়া হয় তোমাদের, যেখানে শান্তিতে বসে সাধন ভজন করে তোমরা জীবনটা কাটাতে পারো, তার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে এবার আমাকে। ও আমি খুব পারব সই। একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। এত বড়লোক ভক্ত আছে আমার, সবায়ের কাছ থেকে কিছু কিছু নিয়ে তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবই কোনও তীর্থস্থানে। আর যাতে কারও দরজায় গিয়ে তোমায় না দাঁড়াতে হয় তার জন্যে--"

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল নিতাই—"কি ! কি বললে ? টাকাকড়ি ভিক্ষে চাইছি আমি তোমার কাছে ? আমাকে টাকাকড়ি সোনাদানা দেবার লোকের বড় অভাব পড়েছে, না ?"

"না না না বোষ্টমী। সে কথা বলছি না আমি। চরণদাস আমায় প্রায় বলে কিনা, কোনও তীর্থস্থানে গিয়ে যদি জীবনটা শান্তিতে কাটানো—"

দাঁতে দাঁত চেপে নিতাই বললে—"তীর্থস্থানে গিয়ে শান্তিতে জীবন কাটাক না চরসদাস বাবাজী, কে তাকে আটকে রেখেছে ! মরা গাছ ও, ওর শান্তিতে

আমার কি? ওর বেঁচে থেকে লাভ কি? শকুনের মত আগলে বসে আছে কেন আমায়? কি সম্বন্ধ ওর সঙ্গে আমার?”

একটু রসিয়ে বলবার চেষ্টা করি—“আহা, তাও ত বটে। কি এমন সম্বন্ধ চরণদাস বাবাজীর সঙ্গে তোমার? আচ্ছা সই, তোমাদের শাস্ত্রে এই অবস্থার নামটা যেন কি! খণ্ডিতা না প্রোষিতভর্তৃকা?”

অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর শোনাল নিতাইয়ের গলা: “গোসাঁই—ভুল করছ। না-বোঝার ভান করে আমায় ঠকাতে পারবে না তুমি। ঐ মড়ার গদির ওপর বসে গর্বে অহঙ্কারে তুমি মানুষকে মানুষ বলে মনে কর না। কিন্তু এই অহঙ্কার যেদিন তোমার ভাঙ্‌বে, সেদিন—আচ্ছা দেখা যাক্—”

কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো নিতাই। আগুনের আভা পড়ল ওর পিঠের ওপর। সামান্য একটু সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে যেন! কিন্তু ওকি? কাঁদছে যে!

কেন কাঁদছে নিতাই? এমন কি বললাম যার জন্যে ও অমন করে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল?

আমার গলার মধ্যেও যেন একটা কি ঠেলে উঠতে লাগল। একটা কিছু বলতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। কিছুতেই একটিও কথা বার হল না গলা দিয়ে।

হঠাৎ একখানা পর্দা উঠে গেল চোখের সামনে থেকে।

ঐ যে নারী, একাকিনী—অন্ধকারে শ্মশানে দাঁড়িয়ে কান্না সামলাবার চেষ্টা করছে, মনে হল—এ কান্না নতুন কান্না নয়।—অনেকদিনের জমানো অনেক কান্না আজ শ্মশানের তাপে গলে ঝরছে। মনে হল, এই দুনিয়ায় এমন কেউ নেই ওর, যাকে ও ঐ বেদনার সামান্য অংশও দিতে পারে। তা যদি পারত তাহ'লে এতটা করুণ এতটা নিষ্ঠুর বলে মনে হত না ওর ঐ নিঃশব্দ রোদনকে।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

সে রাত্রে অনেক অশ্রু ঢেলেছিল নিতাই উদ্ধারণপুর ঘাটের ভস্মে। সাক্ষী ছিলাম একমাত্র আমি। একটি চিতাও জলছিল না সে রাত্রে উদ্ধারণপুর শ্মশানে। মড়ার বিছানার স্তূপের ওপর মড়ার মত কাঠ হয়ে বসে রইলাম। নির্বিকার নিরাসক্ত নিরপেক্ষ সাক্ষীর আদর্শ হয়ে। একটি আঙুল তুলতে পারিনি। একটি বাক্য গলা দিয়ে বার হয়নি আমার। যেন একটা বিষের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম।

উদ্ধারণপুরের অশ্রু।

অশ্রাব্য অশুদ্ধ অশুচি বুকফাটা হাহাকারের বিয়োগান্ত বিভীষিকা নয়, অনিবার্য অন্তর্দাহের পায়ে বিফল বিলাপের বিহ্বল মাথা-কোটাকুটি নয়, করুণাহীন কাঠফাটা রোদে ঝুলো তালগাছের হা-হুতাশ চুয়ানো গাঁজলাওঠা তপ্ত তাড়ি নয়। উদ্ধারণপুরের অশ্রুতে ঝরে মাধ্বী মধু। আকণ্ঠ পান করেও গায়ে মাথায় জ্বালা ধরে না। দেহ-মনের তন্ত্রীগুলো প্রসন্ন প্রশান্তিতে জুড়িয়ে শীতল হয়ে যায়।

উদ্ধারণপুরের অশ্রু।

একূল ওকূল দুকূল-নাশিনী উচ্ছ্বসিতা উর্মিমালা নয়—অন্তঃসলিলা অনুরক্তির অনিরুদ্ধ অন্তর্বেদনা।

লেলিহান লালসার রুচিহীন রোমন্থন নয়—মূর্তিমতী মমতার মুমূর্ষু মিনতি। বিক্ষত বিক্ষোভের বিগলিত বিজ্ঞাপন নয়—বিকৃত বিড়ম্বনার ব্যথিত বাড়বানল। কিছুই সিক্ত হয় না উদ্ধারণপুরের অশরীরিণী অশ্রুতে, নরম হয় না উদ্ধারণপুরের সাদা হাড় আর কালো কয়লা। সে অশ্রুতে অনুভূতির অনুনয় থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু উদ্দীপনার উত্তাপ নেই। উদ্ধারণপুরের অশ্রু কিছুই ভাসিয়ে নিতে পারে না, শুধু খানিক নাকানি-চোবানি খাইয়ে হায়রান করে ছাড়ে।

উদ্ধারণপুরের অশ্রু।

অশ্রু নয়, অশ্রুমুখী অনুশোচনা। শ্মশানের ধোঁয়াটে আকাশে নিষ্প্রভ নীহারিকাপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে থাকলে যে ভাষাতীত ভাষ্য বুকের মাঝে গুমরে ওঠে, সেই ভাষায় আশার কথা শোনাতে চায় উদ্ধারণপুরের অশ্রুমুখী অনুশোচনা।

বলে—"জানলে গোসাঁই—পিঁপড়ের পাখা গজালে সে মরবেই। না পুড়লে যে তার স্বস্তি নেই জীবনে। তাতে আগুনের দোষ কি? আগুন ত তাকে উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে সাধতে যায়নি।"

নড়ে চড়ে বসি। ধড়ে প্রাণ এল ওর কথা কানে যেতে। তাড়াতাড়ি দুটো খোঁচা দিয়ে ধুনিটাকে আরও চাঙ্গা করে তুলি।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে বোষ্টমী। আমার মড়াপোড়া কাঠের ধুনি থেকে লাল আভা

পড়েছে তার ভিজে মুখ-চোখের ওপর। নিশীথিনী-নিন্দিত চক্ষু দুটির অতলস্পর্শী চাউনিতে জ্বলছে দু'টি নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা—প্রত্যাশা আর প্রদাহ। কিন্তু এতটুকু উষ্ণতা নেই সেই চাউনিতে, পাখা-গজানো কোনও হতভাগা ঝাঁপ দেবে না সেই আগুনে। ও দীপ কাছে টানতে জানে না, শুধু দূরে সরিয়ে রাখে।

কিন্তু সাধ্য নেই সেই চোখের ওপর চোখ রাখার, মোচড় দিয়ে ওঠে বুকের মধ্যে। কোথায় যেন একটা বোবা বেদনা টনটন করে ওঠে।

মুখ ঘুরিয়ে বলি—"মাঝে মাঝে অমন করে ভয় দেখাও কেন সই? যে মরে আছে তাকে মেরে কি সুখ পাও তুমি?"

আরও দু'পা এগিয়ে এল নিতাই। একটু সামনে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললে—"কি দিয়ে বিধাতা তোমায় গড়েছিল গোসাঁই? কি ধাতুতে তৈরী তুমি? সুখের কথা মুখে আনতে লজ্জা করে না তোমার? তোমায় ভয় দেখাব আমি! ভয় কি বস্তু—তা তুমি জান? লজ্জা ঘেন্না ভয় এই সব আপদ বালাই আছে নাকি তোমার শরীরে?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণভাবে বোঝাই ওকে—"সহজ কথা কিছুতেই সোজাভাবে নিতে পার না তুমি সই? মড়ার গদির ওপর যে শুয়ে আছে সেই মড়ার সঙ্গে খামকা ঝগড়া করে নিজে দুঃখ পাও। কাঞ্চন নজরে ধরে না তোমার, কাঁচ নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে নিজের হাত-পা কেটে জ্বলে পুড়ে মরছ। কি অশুভ লগ্নেই যে তোমার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হয়েছিল!"

খপ্ করে আমার কথাটাই পাল্টে দেয় বোষ্টমী—"মনে পড়ে গোসাঁই? এখনও তোমার মনে আছে সেই দিনটিকে। তোমায় আমায় দেখা হবার সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি এখনও মন থেকে মুছে যায় নি তোমার?"

খপ্ করে প্রশ্ন করা সহজ কিন্তু টপ্ করে তার জবাব যোগায় না আমার মুখে। আগুনের দিকে চেয়ে উত্তর খুঁজতে থাকি। আমার মড়া-পোড়া কাঠের ধুনির লাল আগুনের মাঝে কি লুকিয়ে আছে নিতাইয়ের প্রশ্নের উত্তর? না এতদিনে নিঃশেষে ছাই হয়ে গেছে উদ্ধারণপুরের আঁচে।

যায়নি।

অত সহজে কিছুই মুছে যায় না মনের মুকুর থেকে। যে বস্তু নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায় চিতার আগুনে, সেই বস্তুই বুকের আগুনে পুড়ে আরও লাল, আরও উজ্জ্বল, আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া কেমন করে ভোলা যায় সেই

অতি বিখ্যাত পুণ্যধামটির কথা, যেখানে মানুষ এখনও দলে দলে ছুটছে শান্তি পাবার আশায়, সংসার-জ্বালায় জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে পাপ-তাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে মানুষ যেখানে গিয়ে আছড়ে পড়ছে আজও। ধর্ম যেখানে ওজন-দরে বিক্রি হয়, টাকা আনা পাই দিয়ে পাইকারী দরে মাল কিনে আড়ত খোলা যায় যেখানে, যে আড়ত থেকে অনায়াসে হরিনামের হট্টগোলের আড়ালে তাজা রক্ত-মাংসের ভেজাল-দেওয়া-মধুর রসের জোর কারবার চলে।

কি করে ভোলা যায় আড়তদারদের মূল আড়কাঠি খাঁদু বোষ্টমীর পৌনে এক হাত লম্বা সেই শ্রীমুখখানি, আর সেই মুখের ঠিক মাঝখানে এক আনার ফালি দেওয়া কুমড়োর মত সেই গোপীচন্দন-চর্চিত নাসিকাটি। সেই মুখে সেই আশ্চর্য নাকটির দু'পাশে অতটুকু দুটি চক্ষু—সত্যিই দেখবার মত বস্তু। সকালে বিকেলে আড়তের চালাও হলে যখন হরিনামের নামতা পড়া চলে, কয়েক শত পনেরো থেকে পঁচাত্তর বছর বয়সের সাদা থানপরা হতভাগিনী সারবন্দী বসে সপ্তাহান্তে পেট-মাপা চাল নুন পাবার আশায় সুর করে নামতা মুখস্থ করে, তখন তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সর্দারনী খাঁদু সেই এক হাত লম্বা মুখখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নজর রাখে কোনও পড়ুয়া ফাঁকি দিচ্ছে কিনা। একঘেয়ে প্রাণহীন চিৎকার বন্ধ করে মাথা হেঁট করে বসে আছে কিনা কেউ। ফাঁকি দিক বা না দিক তাতে কিছু আসে যায় না। খাঁদু বোষ্টমীর কুতকুতে চোখের কুনজর যার ওপর গিয়ে পড়বে তার আর রক্ষে নেই। সারাটা সকাল বিকেল প্রাণপণে চেঁচালেও গদি-ঘরের খেরো-বাঁধানো লাল খাতায় তার নামের পাশে ঢ্যারা পড়বে। অর্থাৎ সে-সপ্তাহের চাল নুনের বরাদ্দ থেকে অর্ধেকটা ছাঁটা হয়ে গেল।

নামে রুচি আর জীবে দয়া—কলির জীবের জন্যে এই সহজ পন্থাটি বাতলে দিয়ে যিনি জগৎকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে তাঁর সেই প্রেম নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে কি চমৎকার ফাঁদ পাতা যাবে। আর সেই ফাঁদে পা দেবার জন্যে বাঙলার নিভৃত পল্লী থেকে দলে দলে হত-ভাগিনীরা ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে পোড়া পেটের দায়ে। টাকা জুটলে জীবে দয়া দেখাবার জন্যে জীব খরিদ করা যায়, এবং তাদের দিয়ে নামে-রুচির ফলাও কারবারও ফাঁদা যায়। এ বড় অদ্ভুত যন্ত্রটা চালু থাকবার রসদ যন্ত্রটাই জুটিয়ে চলেছে। আখের রস জ্বাল দেওয়া হচ্ছে আখের ছিবড়ে দিয়ে। মাছের তেলে মাছ ভাজা যাকে বলে।

নিতাই দাসী তখনও নিতাই হয়নি, আর পাঁচটা গাঁয়ের মেয়ের মত ওরও

একটা ঘরোয়া নাম ছিল নিশ্চয়ই। সেই নামটুকুমাত্র সম্বল করে খাঁদু বোষ্টমীর নজরে পড়ে গেল সে। খাঁদু তার বাৎসরিক সফরে গিয়েছিল গ্রামে। প্রতিবারের মত এবারও দু'একটি অসহায়া বিধবা যুবতীকে ধর্মপথে টেনে আনার সৎবাসনা নিয়ে দেশে গিয়েছিল সে। গুটি পঁচিশেক নগদ টাকার লোভ সামলাতে না পেরে নিতাইয়ের কাকা তাঁর পিতৃমাতৃহীন ভাইঝিটিকে খাঁদু বোষ্টমীর হাতে গৌর-গঙ্গা করবার জন্যে সমর্পণ করে দায়মুক্ত হলেন। তারপর যথাকালে যথানির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে নাম গানের আখড়ায় নাম লেখালে নিতাই। গদি-ঘরের লাল খেরোবাঁধানো মস্ত খাতায় তার নতুন নাম উঠে গেল নিতাই দাসী। সবই সুশৃঙ্খলে সমাধা হয়ে গেল, যেমনটি ঘটা উচিত ঠিক তেমনিভাবে বিনা ওজর-আপত্তিতে ঘটে গেল সবকিছু। গদিঘরে বসে তিলক চন্দন তুলসী মালায় বিভূষিত ভক্তবর আখড়ার মালিক দেখলেন মুঠোর মধ্যে যায় এমন একটি কোমর। আরও যা দেখলেন তাতে তিনি নেপথ্যে খাঁদু বোষ্টমীকে তারিফ না করে পারলেন না। কিন্তু কে জানত যে—যে-ফুলে মধুতে টস্‌টস্‌ করছে, তার কাঁটায় অত বিষ!

ধর্মপ্রাণ আখড়া-পরিচালকের বিরাট অট্টালিকায় ভাগবত পাঠ শোনাবার জন্যে খাঁদু নিয়ে গেল তার ছোট্ট শিকারটিকে। কিন্তু শিকার ছোট্ট হলে কি হবে, জাল কাটতে জানে সে। ফলে ঘটে গেল এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার। সেই অসময়ে সকলের শ্রদ্ধেয় শহর-বিখ্যাত গুণী ব্যক্তিটির শান্তিকুঞ্জের সামনে বিরাট ভিড় জমে গেল। দারোয়ানদের কাবু করে মার মার শব্দে মানুষ ঢুকে পড়ল বাড়ীর ভেতরে। পাওয়া গেল নিতাইকে, অক্ষত অবস্থাতেই পাওয়া গেল। নখ আর দাঁত এই দুটি অহিংস অস্ত্রের সাহায্যে সে বাঁচিয়েছে নিজেকে। তার ওপর আর যা করেছে তার জন্যে তামাম মানুষ তাকে মাথায় তুলে নাচতে লাগল। পাঁচ-পঞ্চাশ বছরের নাদুসনুদুস সেই ভক্তপ্রবরটিকে জন্মের মত কানা করে দিয়েছে নিতাই, দু' হাতে তার দু' চোখ খাব্‌লে তুলে নিয়েছে।

কেলেঙ্কারি যতদূর হবার হয়ে গেল। ক্রমে লোকের উচ্ছ্বাসে ভাঁটার টান দেখা দিল। তখন পিছিয়ে গেল সকলে। কে নেয় মেয়েটার ভার? সহজে কেউ এগোয় না ও-মেয়ের দিকে হাত বাড়াতে। যারা এগোয় তাদের নজর দেখে নিতাই দন্তনখর বার করে। তারপর খোলা রাজপথ। এ হেন চরম দুর্দিনে, যখন একগাছা খড়কুটো ধরতে পারলেও নিতাই বর্তে যায় তখন এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি। আমার নিতাইয়ের চার চোখের মিল হয়ে গেল।

মনে মনে কি মতলব ভেঁজে সেদিন নিতাই সেই পুণ্যধামের শ্মশানের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল তা সে-ই জানে। হঠাৎ আমার নজর পড়ল তার ওপর। নজর না পড়ে পারে না। ঢাকবার মত সম্পদ রয়েছে অথচ তার উপযুক্ত আবরণ-টুকুও নেই, রুক্ষ চুল, বদ্ধ পাগলের মত চোখ-মুখের অবস্থা—একটি বহ্নিশিখা শ্মশানসুদ্ধ সকলের লোলুপ চাউনিকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি দেখলাম—কি দেখেছিলাম ওর মধ্যে আজও বেশ মনে আছে। আমার মনে হয়েছিল যে চিবুবার মত এক মুঠো কিছু, আর এক পেট ঠাণ্ডা জল ওকে তখুনি দেওয়া প্রয়োজন। ভুলে গেলাম নিজের হীন অবস্থার কথা, নেংটি-চিমটে-কলকে-সম্বল হাড়হাভাতে শ্মশানচারীর চালাকি নিমেষের মধ্যে ছুটে গেল আমার দেহ-মন ছেড়ে। আমার সেই বীভৎস মূর্তি নিয়ে সোজা উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ওর সামনে। বলেছিলাম—মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ছোট্ট একটা অনুরোধ—"এস আমার সঙ্গে।"

চোখ তুলে নির্জলা নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে কয়েকটি মুহূর্ত চেয়ে ছিল নিতাই আমার দিকে। তারপর কয়েকবার আমার আপাদমস্তকে সে বুলিয়েছিল তার সেই অস্বাভাবিক বুভুক্ষু দৃষ্টি। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। বলেছিল—"চল—কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে।"

আমার মত আর যে-কটি ফালতু মানবসন্তান শ্মশানে পড়ে মজা লুটছিল, তাদের ঠোঁটকাটা টিপ্পনীর ঝড় গায়ে না মেখে নিতাইয়ের পিছু পিছু মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এসেছিলাম সেইদিন সেই শ্মশান থেকে।

কিন্তু তারপর ?

রাজপথ শ্মশান নয়, রাজপথের ইজ্জৎ আছে। তার বুকের ওপর দিয়ে নেংটি-চিমটে-সম্বল শ্মশানচারী পিছনে একটা জলন্ত যৌবন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে না। অযথা ফেউ লেগে গেল। এল একটা মর্মান্তিক ঘৃণা নিজের ওপর। ওর পাশে নিজেকে মনে হল হীনতম হীন চরম অপদার্থ জীব, তুচ্ছাতিতুচ্ছ রাস্তার ঘেয়ো কুকুর বলে মনে হল নিজেকে। শ্মশানে বসে যা বাগিয়েছিলাম তাই দিয়ে তাড়াতাড়ি ওকে কিনে দিলাম দই মিষ্টি খাবার। হাত পেতে নিলে নিতাই, গঙ্গার ধারে বসে ধীরে সুস্থে গিললে সব খাবার। গিলে আঁজলা আঁজলা জল খেয়ে এল গঙ্গায় গিয়ে। ফিরে এসে ছেঁড়া আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে সেই প্রথমবার ওর রহস্যময় ভঙ্গিমায় জিজ্ঞাসা করলে—"কি গো ঠাকুর, সম্বল ত তোমার ফর্সা হয়ে গেল। এবার আমার ক্ষিদে পেলে খাওয়াবে কি ?

জবাব—হাঁ—তৎক্ষণাৎ দিতে পেরেছিলাম তার জবাবটি। বলেছিলাম—"তুমি সঙ্গে থাকলে কোনও কিছুর অভাব হবে নাকি ?"

তারপর আর কোনও কথা নয়, ছেঁড়া আঁচল পেতে আমার পাশে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়েছিল নিতাই। ওর শেষ কথা দুটি এখনও বাজছে আমার কানে—"তাহ'লে আমি এবার ঘুমিয়ে নিই একটু। তুমি বসে পাহারা দাও আমাকে। দেখো, যেন শেয়াল শকুনে থাবলে না খায়।" বলে সত্যিই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আর চোরের মত কিছুক্ষণ পরেই পালিয়ে গিয়েছিলাম আমি।

দীর্ঘ পাঁচটা বছর পিছলে পার হয়ে গেল। এঘাট ওঘাট সে-ঘাট—সাত ঘাটের পানি গিলে শেষে উদ্ধারণপুরের ঘাটে এসে পৌঁছে গেলাম। সগৌরবে আসীন হলাম এই রাজঘাটের রাজপাটে। ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শিখলাম। নিজেকে নিজে রাজাধিরাজ জ্ঞানে পূজো করতে সুরু করলাম। ছোট্ট নিতাই কোথায় তলিয়ে গেল। চাপা পড়ে গেল যুগযুগান্ত ধরে সঞ্চিত উদ্ধারণপুরের শ্মশানভস্মের তলায়।

তারপর আচম্বিতে একদিন মন্দিরা আর একতারা বেজে উঠল আমার রাজপাটের সামনে। কষ্টি-পাথরে কোঁদানো চরণদাসকে নিয়ে চুড়ো-বাঁধা নিতাই বোষ্টমী এসে দাঁড়ালো উদ্ধারণপুরের ঘাটে। কি গান যেন গাইছিল ওরা সেদিন ? হাঁ—মনে পড়েছে—

"কুল মজালি ঘর ছাড়ালি
পর করিলি আপন জনে।
বঁধু তোর পিরিতির এই কি রীতি,
কাঁদি নিশি নিরজনে॥"

ঝিমিয়ে-পড়া আগুনটার দিকে চেয়ে—নিজেই ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। চমকে উঠলাম। আবার কথা বলছে চুড়ো-বাঁধা নিতাই বোষ্টমী। আরও কাছে সরে এসে প্রায় আমার গদি ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে সে।

ও কি! কৌতুক না পরিহাস? না অন্য কিছু নাচছে বোষ্টমীর দুই কালো চোখে! কোথায় যেন একবার দেখেছিলাম ঐ চাউনি!

হাঁ—মনে পড়েছে, দেখেছিলাম একটা বেঁজির চোখে। রাধু মল্লিক আমার ছোটবেলার বন্ধু। তার পোষা বেঁজিটি সদাসর্বদা তার কাঁধের ওপর চড়ে থাকত। ঠাট্টা করে আমরা সেই বেঁজির নাম রেখেছিলাম মল্লিকা। একবার মল্লিকা একটা হাত-দেড়েক লম্বা গোখ্‌রোকে ঘিরেছিল। ফণা-ধরা সাপটার সামনে দাঁড়িয়ে গায়ের রোঁয়া ফুলিয়ে ঠিক ঐ দৃষ্টিতে চেয়েছিল তার শত্রুর দিকে। দূর থেকে সেই সাপে-নেউলের খেলা দেখেছিলাম আমরা।

বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠল। বহুদিন পরে আবার নিতাইয়ের সামনে নিজেকে একান্ত অসহায়, হীনতম হীন, চরম অপদার্থ জীব বলে মনে হল। দেড় হাত পুরু মড়ার বিছানার মৃত মর্যাদা বুঝি গোল্লায় যায় এবার!

শেষবারের মত শেষ চেষ্টা করলাম নিজেকে বাঁচাবার। শেষবারের মত একবার চতুর্দিকে নজর ফেলে দেখলাম, না, একটাও চিতা জ্বলছে না, একটি প্রাণীও পুড়ছে না কোনও চিতার ওপর। কেউ নেই যে আমায় রক্ষা করে।

অবশেষে আত্মসমর্পণ। যা খুশি ওরা করুক এবার। আর পারি না।

বললাম—"সই, বস না একটু আমার পাশে। তোমার কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নিই। উঃ, কতকাল যে ঘুমোইনি! একা একা বড্ড ভয় করে এখানে, চোখের পাতা এক করতে পারি না কিছুতে। উঃ—"

বলে দু' চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম গদির ওপর।

সফল হল আমার আত্মসমর্পণ। অসঙ্কোচে বসে পড়ল নিতাই আমার পাশে। তুলে নিলে আমার মাথাটা নিজের কোলে। খুব ধীরে ধীরে বোলাতে লাগল তার হাতখানি আমার চোখে কপালে। ঝল্‌সানো মাংস পোড়ার গন্ধ নয়, এ গন্ধে কেমন যেন নেশা ধরে যায়। গন্ধটা আসছে নিতাইয়ের নরম হাতের আল্‌তো স্পর্শ থেকে। সন্তর্পণে চোখ বুজে পড়ে রইলাম ওর সেই নরম কোলে মাথা রেখে।

অনেকক্ষণ পরে গুনগুনিয়ে উঠল ওর গলা। সামান্য ঝুঁকে পড়েছে নিতাই, ওর ঈষৎ তপ্ত মৃদু শ্বাস পড়ছে আমার মুখের ওপর। চাপা গলায় গাইতে লাগল—

এ কি! এ যে সেই সুর! সেই গান!

"জ্বালা হল মোহন বাঁশি
আর জ্বালা তোর রূপের রাশি
আমার নয়ন মন উদাসী
বিনা কালা দরশনে।
কুল মজালি ঘর ছাড়ালি
পর করিলি আপন জনে।
বঁধু তোর পিরিতির এই কি রীতি
কাঁদি নিশি নিরজনে॥"

নিরজনে কাঁদে কে!

কেন কাঁদে? কাঁদবার মত কোথাও একটু স্থানও কি মেলেনি?

কেন কাঁদতে আসে উদ্ধারণপুরের ঘাটে?

কাঁদে আমার রাজশয্যা।

লেপ তোশক কাঁথা আর কাঁথা তোশক লেপের স্তূপের ভেতর থেকে গুমরে উঠছে কান্নার কলরোল। ওরা কাঁদে, কারণ ওদের ফেলে রেখে তারা চলে গেছে। একদা যারা এই সব লেপ তোশক কাঁথার সঙ্গে জড়িয়ে স্বপ্নের জাল বুনত তারা আর নেই। আছে শুধু তাদের স্বপ্ন—শয্যার প্রতি অণু-পরমাণুতে মেশানো।

তাই এরা কাঁদে। কাঁদে আর আমাকে শোনায় এদের দুঃখের কাহিনী। শোনায় এদের মর্মছেঁড়া সুখের কাহিনীগুলিও। শোনায় কে কবে ওদের ওপর শুয়ে কার গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে কি কথা শুনিয়েছিল, কবে কোন্ বঁধুয়া তার বিরহিণীর মান ভাঙাতে কি ছলনায় ছলেছিল,—একজনের নিবিড় আলিঙ্গনের মাঝে শুয়ে অপরের স্মৃতি বুকে নিয়ে বিষের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে কাটত কার রাত। লেপ তোশক কাঁথারাও কাঁদতে জানে, নিরজনে কাঁদে তারা। শুধু আমি শুনি তাদের কান্না আর শুনি নির্লজ্জ লোলুপতার উলঙ্গ ইতিহাস। রক্ত মাংস মজ্জা মেদের জন্যে রক্ত মাংস মজ্জা মেদের কাঙালপনা। সে ইতিহাস রাগ-অভিমান ছল-চাতুরী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর হা-হুতাশ দিয়ে গড়া, আগাগোড়াটাই বিড়ম্বনাময়। কবিরা সেই বিড়ম্বনা দিয়ে গান রচনা করেন—

"আমার এ-কূল ও-কূল দু-কূল গেল
অকূলে ভাসি এখনে ॥"

অকূলেই ভেসে গেছে তারা। এই উদ্ধারণপুরের ঘাট দিয়েই করেছে সবাই শেষ যাত্রা। সে যাত্রার এ-কূল ও-কূল দু-কূলই নেই। কিছুই সঙ্গে নিতে পারে নি। সব পড়ে আছে এ কূলে। এমন কি প্রতি রাতের প্রতিটি প্রেম-অভিমান বিরহ-মিলন সোহাগ-ভালবাসা আর ছলা-কলা,—এই সমস্ত তিক্ত-মধুর লীলা-খেলার জলজ্যান্ত সাক্ষী—লেপ কাঁথা তোশকগুলিকেও সঙ্গে নিতে পারে নি। রেখে গেছে আমার জন্যে এই শয্যা, যে শয্যার সর্বাঙ্গে কিলবিল করছে কোটি কোটি জীবাণু, ক্ষুধার্ত আর বিষাক্ত কামের জীবাণুগোষ্ঠী! আর সেই জীবাণুগোষ্ঠীর সঙ্গে শুয়ে আমি গান শুনছি।

"একি হল, হায় রে মরি—
ধৈরজ ধরিতে নারি—
আমি পলকে প্রলয় হেরি—
এমনে বাঁচি কেমনে ॥"

কেমনে বাঁচা যায়?

ক্ষুধার্ত জীবাণুর বিষাক্ত দংশনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি?

উপায় ব্যবধান।

উপাধান সেই ব্যবধান রচনা করেছে। নিতাইয়ের নিখুঁত নিটোল বাম উরুর ওপর ডান কানটা চেপে শুয়ে আছি। বাঁ কানের ঠিক এক বিঘত উঁচু থেকে নিতাই গান ঢেলে দিচ্ছে। অতএব জীবাণুর ক্রন্দন আর কানে যাচ্ছে না। কিন্তু শান্তি নেই তাতেও। সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর গাইছে বোষ্টমী। সামান্য একটু চাপ পড়ছে আমার মাথায়, অতি কোমল নিতাইয়ের বুকের চাপ। কিন্তু শীতলতা নেই সেই মৃদু স্পর্শে। নিতাইয়ের নিটোল উরু আর বোধ হয় তার বুকও জলছে। সর্বাঙ্গ জলছে তার। সে গাইছে—

"উপায় কি বলিতে—
অঙ্গ জলে কৃষ্ণ-পিরিতে।"

যে অঙ্গ জ্বলছে কৃষ্ণ-পিরিতে সেই অঙ্গ হল আমার উপাধান। সুতরাং শান্তি কোথায় ?

দুধে-আলতায় গোলা রঙের নিটোল নিখুঁত শিল্পকলা, কাঁচা মাংসের অপরূপ ভাস্কর্য। মানুষের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে দুধের মত সাদা সামান্য আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। গলাবন্ধ কাঁধকাঁটা শেমিজ আর সাদা থান, ও আবরণে কিছুই আবৃত হয় না। প্রতিটি রেখা আরও তীক্ষ্ণ আরও প্রখর হয়ে ওঠে। আরও দুর্বার হয়ে ওঠে ওর আকর্ষণ, মানুষ বড় বেশী সচেতন হয়ে ওঠে নিজের সম্বন্ধে ওর দিকে চেয়ে। এই কাঁচা মাংসের পাকা শিল্পকলা যেন গ্রাস করতে চায় মানুষের মন বুদ্ধি আর হিতাহিত জ্ঞানকে।

লক্ষ কোটি ক্ষুধার্ত জীবাণু মারামারি করছে আমার উপাধানে। প্রতি মুহূর্তে গ্রাস করছে একে অপরকে, প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি প্রাণের বিনাশ আর কোটি কোটি প্রাণের জন্ম। এই অসাধ্য সাধন হচ্ছে যে অমোঘ মন্ত্রবলে সেই মন্ত্রটি শুনছি আমি ডান কান দিয়ে, যে কানটা চাপা আছে নিতাইয়ের নিটোল নিখুঁত উরুর ওপর। শুনছি—

ওঁ ব্রহ্মাণ্ডরসসম্ভূতমশেষরসসম্ভবং।
আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষ রসমাবহ॥
অখণ্ডৈকরসানন্দ কলেবর সুধাত্মনি।
স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র নিধেহ্যকুলরূপিণি॥
অকুলস্থামৃতাকারে সিদ্ধজ্ঞানকলেবরে।
অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি॥

শ্রীপাত্র। প্রাণস্পন্দিত মহাপাত্র। এই পাত্রের মন্ত্রপূত বারি-সিঞ্চনে নিষ্প্রাণ উপচারে প্রাণ সঞ্চার হয়। এই পাত্র অতি নিখুঁত আর অতি সুদর্শন হওয়া চাই। এই 'আপূরিতং মহাপাত্রং' যথাবিহিতরূপে স্থাপন করতে পারলে সাধকের সিদ্ধি লাভ হয় সাধনায়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্বটুকু জেনে মানুষ এ-কূল ও-কূল দু-কূলের জন্যে আর হা-হুতাশ করে না।

কিন্তু আমার পোড়া কপালে শ্রীপাত্র জুটলেও তা স্থির থাকতে চায় না। চলমান চঞ্চল শ্রীপাত্রে পূজা সুসম্পূর্ণ হয় না আমার।

ঝাঁ কানে ঢালতে থাকে বিষ নিতাই বোষ্টমী—

"বন্ধু আমার চিকণ কালা
সঙ্কেতে বাজায় বাঁশি কদমতলা
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশি—"

অসম্ভব রকম নড়ে উঠল আমার শ্রীপাত্র। লাফিয়ে উঠে বসলাম গদির ওপর। আমার একটা হাত সজোরে চেপে ধরেছে নিতাই। অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে আমার চোখের দিকে। তার দুই চোখে ফুটে উঠেছে সন্ত্রাস। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, একেবারে কাঠ হয়ে গেছে সে।

একটু পরে আরও কাছে, প্রায় আমার কানের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে খুব চুপি চুপি বললে—"শুনছ গোঁসাই? শুনতে পাচ্ছ?"

আমিও কাঠ হয়ে গেছি। কি শুনব? কি শুনে অত ভয় পেয়েছে ও?

"শুনছ না কিছু? ঐ যে একটা কচি বাচ্চা কাঁদছে—ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছে—। এইবার শুনছ?"

কান ঠিক করে তাক করলাম। হাঁ, এবার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। গঙ্গার ভেতর থেকে আসছে ছোট ছেলের কান্নার শব্দ। ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া।

ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—ওয়া।

ঠিক একটা কচি ছেলে কাঁদছে। আওয়াজটা আসছে গঙ্গার ভেতর থেকে।

এ কি ব্যাপার! কেউ ফেলে দিয়ে গেল নাকি কচি ছেলে? কোথা থেকে এলো ঐ কচি শিশু মহাশ্মশানে?

"শুনছ গোঁসাই? এবার শুনতে পাচ্ছ ঐ ডাক? আমায় ডাকছে, আমায় যেতে হবে। তোমাকেও যেতে হবে গোসাঁই। কিছুতেই আমি ছেড়ে যাব না তোমায় এখানে। নিশ্চয়ই তারা টের পেয়েছে। তোমাকে সুদ্ধ টানাটানি করবে। চল গোসাঁই, ওঠ শিগ্‌গির। এখুনি এসে পড়বে তারা।"

দু'খানি হাত দিয়ে চেপে ধরেছে নিতাই আমার ডান হাতখানা। বেশ বুঝলাম ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে সে।

উৎকণ্ঠায় উত্তেজনায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর।

"ওঠ গোসাঁই, নেমে পড় এখান থেকে। এখনও উপায় আছে। চল এখনিই নেমে পড়ি গঙ্গার জলে, চল—"

হঠাৎ চুপ করে স্থির হয়ে রইল কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে রইল বড় সড়কের দিকে। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে আমিও চেয়ে রইলাম।

"ঐ যে, ঐ দেখ, ঐ তারা আসছে, আলো দেখা যাচ্ছে।"

টপ করে নেমে দাঁড়াল গদির সামনে বোষ্টমী। তখনও দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছে আমার একখানা হাত। এবার আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম বড় সড়কের ওপর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যেন এগিয়ে আসছে অনেকগুলো আলো। তারপর কানে গেল অনেক লোকের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। সত্যিই কারা এগিয়ে আসছে এধারে।

কিন্তু এত রাত্রে কার এত বড় সাহস হল শ্মশানের মধ্যে নামবার? কে ওরা? কি উদ্দেশ্যে আসছে এধারে?

"আমাদের ধরতে আসছে গোসাঁই, নিশ্চয়ই ওরা ধরতে আসছে আমাদের। এস নেমে। এখনও উপায় আছে, চল পালাই।"

"কে ধরতে আসছে? কেন আসছে ধরতে?"

কয়েকটি মুহূর্ত চুপ করে রইল নিতাই। তারপর কান্নায় আর মিনতিতে ভেঙে পড়ল তার কণ্ঠস্বর।

"সব তোমায় বলব গোসাঁই। সব তুমি জানতে পারবে। এখন নেমে এস। চল পালাই।"

দু'হাতে সজোরে টান দিলে আমার দু'হাত ধরে।

আরও শক্ত হয়ে বসলাম। হাত ঘুরিয়ে ছাড়িয়ে নিলাম নিজের হাত দু'খানা। বললাম—"পালাও তুমি সই। আমার দরকার নেই পালাবার। কোনও অন্যায় করিনি আমি। কেউ ধরতে আসছে না আমাকে।"

মাথা হেঁট করে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিচু হয়ে ওদের ঝোলা দুটো, একতারাটা আর সরু মাদুর দু'খানা তুলে নিয়ে দ্রুতপদে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। গঙ্গার দিক থেকে তখনও কচি ছেলের কান্না শোনা যাচ্ছে—ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া।

ঠিক সেই মুহূর্তে বড় সড়কের ওপর শোনা গেল খন্তার গলা।

"শেষবারের মত সাবধান করছি দারোগাবাবু। খবরদার নেমো না রাতে শ্মশানের ভেতর। ডাকিনী যোগিনী নিয়ে খেলা করেন বাবা এখন। কখনও এক প্রাণী নামে না শ্মশানে সন্ধ্যার পর। মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরবে কেন খামকা।"

প্রচণ্ড এক দাবড়ি শোনা গেল।

"চোপরও ব্যাটা ছুঁচো। ফের একটি কথা কইবি ত তোকে শুদ্ধ চালান দোব। সেই ছুঁড়ি বোষ্টমীকে নিয়ে এখন কেলি করছেন তোর ভৈরব বাবা। ব্যাটা ভণ্ড সাধু, ডাকাতের সর্দার। সেই হারামজাদা বোষ্টম বাবাজীকে দিয়ে মানুষ খুন করায় আর ঐ ছুঁড়িকে দিয়ে মানুষকে ফাঁদে ফেলে। অনেকদিন ধরে আমি লক্ষ্য করেছি ঘুঘুদের চালচলন। আজ গুষ্টিসুদ্ধ সব ধরা পড়বে।"

আরও কাছে এসে পড়ল। এবার নামছে বড় সড়ক থেকে। নিমগাছতলা আলোয় আলো হয়ে উঠল। একজন দু'জন নয়, এক পাল মানুষ নেমে আসছে।

কিন্তু তাদের জন্য বসে অপেক্ষা করার সময় একদম নেই বাবা শ্মশানভৈরবের। অগত্যা নেমে আসতে হল সেই গদি থেকে। বহির্বাস খুলে রেখেই আসতে হল।

শ্মশানের দক্ষিণ দিকে সদ্য-নেভানো একটি চিতার ওপর রাশীকৃত কালো কয়লা বেদীর মত উঁচু হয়ে রয়েছে। আজকের মত ঐ আসনেই বসতে হবে।...

ওধারে আমার গদির সামনে থেকে হাঁকার শোনা গেল।

"কই, গেল কোথায় সে হারামজাদা? ভেগেছে হারামজাদীকে নিয়ে! এই পাঁড়ে, তুম দেখো উধারমে, দো আদমী দেখো পিছুমে, আউর তিন আদমী আও হামারা সাথ। আর এই শালা বামনা, কোথায় তারা? দেখা শিগ্‌গির কোথায় লুকলো তারা?"

সিধু কবরেজের গলা শুনতে পেলাম। সে কাঁই কাঁই করে উঠল—"আজ্ঞে হুজুর, ছিল ত তারা এখানেই। বোষ্টমী ছুঁড়ি ত আগাগোড়াই ছিল এখানে। বাবাজী বেটা এই কিছুক্ষণ আগে খোল বাজিয়ে এল ওখান থেকে।"

একসঙ্গে বহু নারীকণ্ঠ ঝাঁজিয়ে উঠল—"নুড়ো জ্বেলে দোব মুখপোড়া ঘাটের মড়ার মুখে। খেংরে বিষ ঝেড়ে দোব বামনার। দাঁড়া না মুখপোড়া, আগে যাক্ তোর দারোগা বাবা, তারপর আমরা তোর কি খোয়ার করি ছাখ্।"

সমাদ্দার দারোগা হুংকার দিলে আর একটা, "চোপরও হারামজাদীরা, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোব এখনিই।"

সমবেত কণ্ঠে হারামজাদীরাও রুখে উঠল—"আয় না আয়, এগিয়ে ছাখ্ না রক্তখেকোর ব্যাটা—"

সকলের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে শোনা গেল খন্তা ঘোষের গলা—"দারোগা বাবা,

আগে প্রাণ বাঁচাও নিজের। তোমার সব বিদ্যে এবার গোল্লায় গেছে। বাবা অদৃশ্য হয়েছেন, সেখান থেকে তোমার ঘাড় ছিঁড়ে রক্ত খাবেন এবার।”

অশ্রাব্য ভাষায় আবার গালাগালি দিয়ে উঠল সাধুরাম সমাদ্দার। দিয়ে গজরাতে লাগল—“তখনই ধরতাম শালা-শালীদের। ভাবলাম দেখাই যাক না ব্যাটার ভিটকিলিমি—রাতে ছুঁড়িটাকে পর্যন্ত ধরব, যখন কেলি করবে তার বাপের সঙ্গে। তাই দু'পাত্র টেনে দাঁত-ছিরকুটে পড়ে রইলাম। কে জানত শালা আমার চেয়ে ধড়িবাজ। ঠিক সটকেছে—আমার নাকের ডগা থেকে!”

এবার রুখে উঠল ময়না। ময়না সবচেয়ে কম বয়সের ঝুমরী মেয়ে। দারোগা ওর ঘরেই পড়ে ছিল এতক্ষণ। চিলের মত গলা ময়নার, সে চেঁচাতে লাগল প্রাণপণে—“তোর মুখে ছাই পড়ুক অল্লপ্পেয়ে মিনসে, শেয়াল শকুনে ছিঁড়ে খাক তোর জিব। যে মুখে তুই বাবার নামে ও-সব কথা বলছিস সে মুখ দিয়ে যেন গু-রক্ত ওঠে। হে মা শ্মশানকালী, যেন তেরাত্রি না পেরোয় মা—”

যা মুখে এল তাই সুর করে আওড়াতে লাগল ময়না। এধারে মস মস জুতোর শব্দ শোনা গেল গঙ্গার দিক থেকে। একটু পরে দু'মূর্তি লাঠি ঘাড়ে করে আলো নিয়ে বেদীটার সামনে এসে উপস্থিত হল! পরমুহূর্তেই আর্তনাদ করে উঠল ওরা। লাঠি আলো ছিটকে চলে গেল এক দিকে। বিকট চীৎকার করতে করতে ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলে।

সমস্ত শ্মশান নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় কি সব আলোচনা হল ওখানে। শেষে দু'তিনটে আলো নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল কয়েকজন।

সামনে সমাদ্দার দারোগা। ডান হাতে বাগিয়ে ধরে আছে পিস্তলটা। ডাইনে বাঁয়ে ঘন ঘন চাইতে চাইতে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে জনা-দশ-বারো মানুষ। বেদীর সামনে এসে পৌঁছল সকলে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। দারোগা সাহেব বু বু বু বু করে তোৎলাতে লাগলেন। তোৎলাতে তোৎলাতে পিস্তল হাতে টলতে লাগলেন। দুম দুম করে দুটো আওয়াজ হল। দু'বার আগুনের শিখা দেখা দিল পিস্তল থেকে। তারপর দারোগা সাহেব দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়লেন গাছ-পড়া হয়ে।

ওধার থেকে ঝুমরী মেয়েরা আকাশ ফাটিয়ে হাহাকার করে উঠল।

শ্মশানের একেবারে দক্ষিণ সীমায় একটা নেভানো চিতার রাশীকৃত পোড়া কাঠকয়লার ওপর উলঙ্গ এক মূর্তি বসে আছে। একখানা মড়ার হাড়, বোধ

হয় কারও কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত, তার মাঝামাঝি কামড়ে ধরে আছে, মুখের দু'ধারে বেরিয়ে আছে হাড়খানা। আর দুটো আধ-খাওয়া মড়ার মাথা ধরে আছে দু' হাত দিয়ে বুকের কাছে। লোকটি শিবনেত্র, যেন এতটুকু বাহ্যজ্ঞান নেই তার।

এই বীভৎস দৃশ্য দেখেই দারোগা সাহেব আর সামলাতে পারেননি নিজেকে।

ধীরে ধীরে সামনে পেছনে দুলতে লাগল সেই মূর্তিটি। রামহরি পণ্ডা আর খন্তা ঘোষ বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল—"জয় বাবা শ্মশানভৈরব, জয় বাবা মহাকাল।"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম চিতার ওপর। তখনও মুখে সেই মানুষের হাত কামড়ে ধরে আছি, দু'হাতে আছে দুই মড়ার মাথা। সেই অবস্থায় নেমে এলাম চিতার ওপর থেকে। নেমে এসে মড়ার মাথা দুটো নামিয়ে রাখলাম দারোগার পিঠের ওপর। তারপর মুখ থেকে হাড়খানা নামালাম। পরম আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলাম ওদের দিকে। খুব চুপি চুপি যেন নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করলাম—"কে ? কে তোরা ?"

উত্তর নেই কারও মুখে। সবাই এক পা দু'পা পিছিয়ে গেল। আমি এগোলাম এক পা দু'পা করে। আর একটু গলা চড়িয়ে বললাম—"কি চাস তোরা এখানে ? কেন এ সময় মরতে এলি এখানে তোরা ?"

দুর্দান্ত খন্তা ঘোষের গলা দিয়ে মেনী বেড়ালের সুর বার হল।

"বাবা গো, দয়া কর বাবা, আমি তোমার অধম সন্তান খন্তা গো বাবা। আমাকে চিনতে পারছ না তুমি ?"

গ্রাহ্যও করলাম না ওর কথা। আরও দু'পা এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। ধীরে সুস্থে চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম—

"হায় হায় রে, কেন মরতে এলি তোরা এখন শ্মশানে। এখন যে আমি বলিদান দেব মা চামুণ্ডার। যা যা যা, এখনও পালা এখান থেকে। ঐ দেখ্ রক্ত খাবার জন্যে তাথৈ তাথৈ নাচছে ডাকিনী-যোগিনীরা। ঐ দেখ্ মা এসে দাঁড়িয়েছে। যা যা যা, এখনও পালা এখান থেকে। নয়ত সবাইকে নিবেদন করে দেব আমি। কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাবে সব—"

নিমেষের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল শ্মশান। সমাদ্দারের সাড়ে-তিন-মনী বপুটা

টেনে হেঁচড়ে তুলে নিয়ে গেল ওরা। দু'দে দারোগা সাধুরাম সমাদ্দার অচৈতন্য বেহুঁশ অবস্থায় প্রস্থান করলেন। পিস্তলটা কিন্তু তখনও তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন হাতের মুঠোয়।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

মহাশ্মশানের মহাশয্যার ওপর আবার গিয়ে বসে পড়লাম। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে তখনও বার হচ্ছে সেই হাড়খানার গন্ধ। দু'হাতের চেটোয় চটচট করছে মানুষের পচা মাংস।

একটা বোতল তুলে নিলাম গদির পাশ থেকে। তারপর সেই বোতলের জলন্ত জল দিয়ে হাত দুটো ধুয়ে একটা কুলকুচো করলাম। বাকিটুকু ঢেলে দিলাম গলায়। গলা দিয়ে নামতে লাগল জলতে জলতে সেই তরল পানীয়।

কিন্তু তবু যেন তেষ্টা মিটল না। সেই শয্যা, সেই সব-কিছু ঠিক রয়েছে। কিন্তু কোথা গেল আমার উপাধান ? এই ত ছিল, এখনও আমার ডান কানটা আর ডান গালটা যেন চাপা রয়েছে সেই উপাধানে! এখনও যেন ঈষৎ তপ্ত মৃদু শ্বাস পড়ছে আমার বাঁ গালের ওপর। আর অতি নরম একটা চাপ বোধ করছি মাথায়।

চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম গদির ওপর। লক্ষ কোটি জীবাণুর ক্রন্দন নয়, মর্মে মর্মে অনুভব করলাম জীবনের স্পন্দন।

কানে বাজতে লাগল সেই সুর—

"সই লো তার কাজল আঁখি
ডাকে আমায় ইশারাতে থাকি থাকি।"

উদ্ধারণপুরের হাসি।

সে হাসির চাউনি বড় তেরছা। সেই তেরছা চাউনির মদির সংকেতে মানুষ নাহোক নাস্তানাবুদ হয়। জাঁহাবাজ জুয়াড়ীর হিসেবের জারিজুরি জড়িয়ে জট পাকিয়ে যায়। ফলে তখন সে যা তা দর হেঁকে ফস্ করে ফতুর হয়ে বসে। বাঘা বাটপাড় বুক উজাড় ক'রে কান্না ঢেলে দিয়ে সেই মূল্যে উদ্ধারণপুরের তেরছা হাসি কিনে নিয়ে ঘরে ফেরে।

দারোগা সাধুরামের একটি সাধু উদ্দেশ্য ছিল বুকের মধ্যে। ঠিকে-ভুল করবার মানুষ নন তিনি। উপায়ও ঠাওরেছিলেন সঠিক। উদর বোঝাই উৎসাহ উগরে দিয়ে কিনতে চেয়েছিলেন উদ্ধারণপুরের হাসি। অর্ধেক রাতে শ্মশান থেকে নিতাইয়ের তাজা দেহটা ছোঁ মেরে নিয়ে সটকাতে পারলে তাঁর অনেক দিনের মনের সাধ মিটত। কিন্তু সে সাধে ছাই পড়ল। ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন উদ্ধারণপুরের তেরছা হাসির ঠসক দেখে।

উদ্ধারণপুরের হাসি।

সে হাসির ঠসক বড় ঠাণ্ডা। সংশয় আর সন্ত্রাসের মিশ্রণে যে সুর্মা তৈরী হয় সেই বেরঙ্ সুর্মায় সুশোভিত উদ্ধারণপুরের হাসির আঁখিপল্লব। সে আঁখি-পল্লব সিক্ত হয় না কখনও। সেই নির্জলা নির্নিমেষ নয়ন দুটির সঙ্গে নয়ন মিললে মানুষ নিজেকে নিতান্ত নিঃসহায় নিঃসঙ্গ নিঃস্ব জ্ঞান করে।

কিন্তু এমন চোখও আছে যে চোখের পর্দা নেই। অতন মোড়লের রক্তবর্ণ চোখ দুটো হেলে-গরুর মত এত বড় বড়। সে চোখের চোরা চাউনিতে চিতার ক্ষুধা। ও চোখ অনেক দেখেছেন—অনেক চেখেছেন। মোড়লের নিজের কথায় 'পেত্যক্ষ' করেছেন। ঠসক দেখিয়ে ঠকানো অসম্ভব অতন মোড়লের দৃষ্টিকে। মোড়লের চোখের ওপর চোখ পড়লে উদ্ধারণপুরের হাসির চোখও চুপসে যায়।

আমঅতন আর তার উপযুক্ত ভাইপো আমজীবন। ওরা দুজনেই একটা দল। ভাগ দেবার ভাবনায় আর কাউকে দলে রাখে না। পাঁচ ক্রোশ ভুঁই ঠেঙিয়ে স্রেফ দু'জনে বয়ে এনেছে ওদের মাল। মোড়লের পাকা হাতের পাকা কাজ। বাঁশের সঙ্গে মড়া আর মাদুর এমনভাবে জড়িয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে এনেছে

যে কার সাধ্য সন্দেহ করবে, ওর ভেতর আস্ত একটা মানুষের হাড়-মাংস লুকিয়ে রয়েছে। একেবারে জলের ধারে বোঝা নামিয়ে বাঁশখানা খুলে নিয়ে খুড়ো ভাইপো এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। আকর্ণব্যাদিত হাঁ করে মোড়ল একচোট বাহবা দিয়ে নিলে আমায়।

একটা কাজের মত কাজ দেখিয়েছি আমি, মোড়লের মনের মত কাজ একটি করে ফেলেছি এতদিনে। একেবারে চক্ষু চড়কগাছে উঠে গেছে সকলের। যৎপরোনাস্তি খুশী হয়েছে মোড়ল। এই জাতের এক-আধটা খেল্ মাঝে-মধ্যে না দেখালে জব্দ থাকবে কেন মানুষ ? আর এ সমস্ত না হ'লে যে শ্মশানচণ্ডীর মাহাত্ম্যে মরচে ধরে যাবে দিন দিন।

অর্থাৎ!

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম ওদের শ্রীমুখ দু'খানি। নাঃ, এতটুকু ধোঁকার ধোঁয়া নেই ওদের চোখেমুখে কোথাও। অর্থাৎ আমার এত চোখালো চালটাও বানচাল হয়ে গেল ওদের খুড়ো-ভাইপোর চোখে। ওদের চোখে ধুলো দেওয়া অসম্ভব।

বেশ একটু চোট লাগল আমার যোগ-বিভূতিগুলোর গায়ে। অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা, এঁরা আটজন আমার আট দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে গা-জ্বালানে হাসি হাসতে লাগলেন আমার দিকে চেয়ে। কিন্তু উপায় কি ? মোড়ল যে অনেক "পেত্যক্ষ" করেছেন, মানুষের দুধে তামাকের তোয়াজ করে তিনি নেশা করেন। তাঁর চোখে নেশা ধরানো সহজ কথা নয়।

সুতরাং গদির তলা হাতড়ে বার করলাম আমার তামাকের পুঁটলি। নিঃসম্বল হয়ে সবটুকু তুলে দিলাম মোড়লের হাতে। আরও খুশী হলেন মোড়ল মশায়। থেবড়ে বসে পড়লেন সেখানেই। ভাইপোকে হুকুম করলেন বাঁশখানার সদ্‌গতি করে আগুন আনবার জন্যে। জল নেই, দুধও নেই, শুকনো তামাক খানিকটা তাঁর বিরাট থাবার নিষ্পেষণে জব্দ হয়ে গেল। সেই ফাঁকে গোটা কতক সদুপদেশও দিলেন আমায়।

"জানলে গো গোসাঁই-বাবা, এবার তোমায় শিখিয়ে দোব মড়া-খেলানোর মন্তরটা। সে বিদ্যেটি একবার শিখে লাও যদি তা'হলে যমেও ডরাবে তোমায়। তবে বড় কঠিন ব্যাপার বাপু! যার তার কম্ম লয় সেসব কাজে হাত দেওয়া।"

একান্ত বাধিত হয়ে দাঁত বার করে হাসতে চেষ্টা করলাম। যদিও ভাল

করে জানি যে কিছুতে ও বিদ্যে দেবে না মোড়ল কাউকে। আর দিলেও কোনও লাভ হবে না আমার। কারণ মড়া খেলাতে গেলে উপযুক্ত আধার চাই। একবার মাত্র মোড়ল বলেছিল আমায়, উপযুক্ত আধারের লক্ষণ কি কি। ডোম চাঁড়ালের মেয়ে হওয়া চাই। বয়স বিশ-বাইশের বেশী হলে চলবে না। ছেলেমেয়ের মা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শরীর বেশ 'টন্‌কো' থাকা আবশ্যক। বেশী রোগে ভুগে মরেছে, হাড়গোড় বেরিয়ে গেছে এ রকম হ'লে চলবে না অর্থাৎ খুব তাজা হওয়া চাই মড়াটা।

উপযুক্ত আধারের লক্ষণাদি শুনে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। ও-রকম সর্বগুণান্বিতা পাত্রী জুটছে কোথায় ?

এবং যতক্ষণ না জুটছে ততক্ষণ মোড়ল কিছুতে দেবে না সেই গুহ্য মন্ত্রটি—যে মন্ত্রবলে সেই সর্বসুলক্ষণা মৃতা যুবতী নড়েচড়ে উঠে বসবে। উঠে বসে দু'হাত বাড়িয়ে দেবে। অর্থাৎ সোজা কথায় দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরবে তাকে, যে মন্ত্রবলে সেই মড়াকে জ্যান্ত করবে।

এরই নাম মড়া-খেলানো। মড়া-খেলানো যার তার 'কম্ম' নয়। আর উপযুক্ত আধার না হলে মড়া মড়াই থেকে যাবে। কিছুতে খেলবে না কোনও খেলা।

অতন মোড়ল পারে। পারে মৃতা যুবতীর বুকে প্রাণস্পন্দন আনতে। পারে যে একথা সবাই জানে, সবাই বিশ্বাস করে। কিন্তু কেউ কখনও চাক্ষুষ করে নি। করবে কি করে ? সে যে বড় গুহ্য ব্যাপার, লোকচক্ষুর অগোচরে ঘটবার মত—গুহ্যাতিগুহ্য কাণ্ড-কারখানা সেসব। উপযুক্ত বিশ্বাসী পাত্র না পাওয়ার দরুনই মোড়ল কাউকে দিতে পারছে না তার গুহ্য বিদ্যে।

তার নিজের ভাইপো আমজীবন, ভাইপোর মত ভাইপো। শুধু কাঠামোখানিই নয়, খুড়োর মত গায়ের রঙ, গলার স্বর সবই তার আছে। ছায়ার মত সে ফেরে খুড়োর পেছনে। তবু সে কিছু পায় নি। মোড়ল বলে—"সবুর হও গো, আগে বাড়ুক খানিক। দিন ত আর পালিয়ে যেচ্ছে না। আগে ভয়-ডর ঘুচুক, নয়ত আঁতকে কাঠ হয়ে যাবে যে।"

তামাককে হাতের তেলোর চাপে নরম তুলতুলে বানিয়ে যত্ন করে তুলে দিলে মোড়ল কলকেতে। এবার আগুন চাই।

'কই র‍্যা—আগুন কই—আন না হয় চকমকিটা।"

জবাব নেই।

চড়তে শুরু করল মোড়লের মেজাজ।

আবার এক হাঁকার—"ম'লি নাকি র‍্যা ড্যাকরা—রা কাড়িস নে ক্যানে?"

রা কাড়া হল ওধার থেকে। রা নয়, একেবারে রাসভনিন্দিত কণ্ঠে রোমহর্ষণ রোদন-ধ্বনি উঠল গঙ্গার দিক থেকে।

"হেই—আমকাকা গো দেখ'সে—আমাদের মাল কুথায় পাচার হয়েছেন।"

কান নয়, ঘাড় খাড়া করে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল মোড়ল। তারপর তামাক সুদ্ধ কলকেটা পেট-কাপড়ে গুঁজে হন্তদন্ত হয়ে ছুটল গঙ্গার দিকে।

উদ্ধারণপুরের হাসি।

হাসির চোখে পর্দা নেই। সে হাসি হাসবার নিয়ম মানে না। স্থান কাল পাত্রের বাছবিচার নেই তার। সে হাসি ভবিতব্যের ভিটকিলিমিকে ভেংচি কাটে, পুরুষকারের পৌরুষকে হাঁ করে গিলতে তাড়া করে। ছোবল মারে অহংকারের আবদারের মুখে। তার চুম্বনে চির-রহস্যের চিরন্তন চাতুরী চিরনিদ্রায় ঢুলে পড়ে।

হাঁক ডাক হুংকারে সরগরম হয়ে উঠল উদ্ধারণপুরের ঘাট। এল রামহরি, এল পঞ্চেশ্বর, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন সিধু ঠাকুর। ময়না, সুবাসী, কালো, ভোমরা আর বাতাসী খাঁদু, ওরা কেউ নামল না শ্মশানে। বড় সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে দেখতে লাগল শ্মশানের ভেতর কি হচ্ছে। নেমে এল রামহরির বউ মেয়ে কাঁখে করে। ডোম গুষ্টির বাকী রইল না কেউ আসতে। বড় বড় লাঠি বাঁশ দিয়ে ধপাধপ পিটোতে লাগল সকলে আশপাশের ঝোপঝাড়। আর সকলের সব রকম হট্টগোল ছাপিয়ে ওরা দুই খুড়ো-ভাইপো, আমঅতন আর আমজীবন দাপিয়ে বেড়াতে লাগল উদ্ধারণপুরের ঘাট।

দেশছাড়া হয়ে ছুটতে লাগল শেয়ালগুলো। শকুনগুলো চক্কর মারতে লাগল আকাশের গায়ে। সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ তাদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল।

এল না শুধু খন্তা ঘোষ।

আসবে কি করে?

সংজ্ঞাহীন সাধুরামের অনড় অচল অঙ্গখানি নিয়ে সে বেচারা হিমশিম

খাচ্ছে রাত থেকে। সমাদ্দারের শাগরেদরা ছুটেছে থানায়। আসবেন সমাদ্দারের স্ত্রী পুত্র আত্মীয়স্বজন। হোমরাচোমরা বড় সাহেবরাও এসে পড়তে পারেন সদর থেকে। তারপর কার কপালে কি ঘটবে না ঘটবে সে ভাবনায় সকলেরই মুখ চুন হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আবার ঘটল এই কাণ্ড। মাদুর-চাটাইমোড়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আস্ত একটা মানুষের ধড়-মুণ্ড হাত-পা সমস্ত লোপাট হয়ে গেল দিনদুপুরবেলায় শ্মশানের ভেতর থেকে।

কেলেঙ্কারি আর কাকে বলে!

এধারে এক ফোঁটা গলা দিয়ে গলেনি কাল রাত থেকে। শেষ রাত থেকেই তোড়জোড় করে সব সরিয়ে ফেলেছে রামহরির বউ। বড় বড় হুজুররা আসছেন। এ সময় সাবধান হওয়া ভাল। সরকারী ভাটিখানা নয়, কাজেই আইন মেনে চলতে হয়।

হায় আইন! আইন-আক্রোশের অষ্টপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় উদ্ধারণপুরের ঘাটে এসে ডেরা গেড়েছি। সেখানেও শান্তি নেই, আইনের আগুন সেখানেও সকলকে জিভ বার করে তেড়ে আসছে।

তেড়ে আসছে আইন আদালত।

আমাদের সিধু ঠাকুর আইনজ্ঞ মানুষ। সর্বপ্রথম তিনিই সচেতন করলেন সকলকে। তাঁর কাঁকড়া জাতীয় মুখ কাঁচুমাচু করে সামনে এসে দাঁড়ালেন দু' হাত কচলাতে কচলাতে। মাটির দিকে তাকিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলেন তাঁর আরজি।

"হুজুররা আসছেন বাবা। এ সময় এই খিট্‌কেলটা আবার—"

থেমে গেলেন। একেবারে লজ্জাবতী লতাটি। এ কেলেঙ্কারির জন্যে যেন উনিই ষোল আনা দায়ী। নেকামি দেখে গা জ্বলে উঠল। তেড়ে উঠলাম—"হুজুররা আসছেন ত করতে হবে কি আমাকে? পাদ্য অর্ঘ্য সাজিয়ে বসতে হবে নাকি?"

মরমে মরে গেলেন একেবারে কবরেজ মশায়। বহু কষ্টে শুধু বলতে পারলেন—"আজ্ঞে, একটা লাস লোপাট হয়ে গেল কিনা, তাই বলছিলুম। মোড়ল মশায়রা এ সময় যদি একটু চেপে যেতেন। লাসটার কথা হুজুরদের কানে না উঠলে—"

এতক্ষণে আমার মগজেও ঢুকল মামলাটা। চাঙ্গা হয়ে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। সত্যিই ত! লাস লোপাট হওয়ার সঙ্গে যে উদ্ধারণপুরের সুনাম দুর্নাম জড়িয়ে

আছে। উদ্ধারণপুরের ঘাটে লাস আনলে যদি তা লোপাট হবার সম্ভাবনা থাকে তবে যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এ ত সোজা কথায় কারবারই নষ্ট, যাকে বলে—এতগুলো মানুষকে পথে বসতে হবে।

চিৎকার করে ডাক দিলাম—"রামহরে, পঙ্কা, এধারে আয়। বড় মোড়ল—আগে শুনে যাও আমার কথা। আর এই, এই ব্যাটারা ঠ্যাঙ্গারের গুষ্টি, থামা শিগ্‌গির তোদের বাঁশ-বাজী। দূর হয়ে যা এখান থেকে। নয়ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলব সব কটা মাথা।

থামল সকলে। রামহরে পঙ্কা এগিয়ে এল। বড় মোড়ল তখনও দু'হাতে নিজের বুক চাপড়াচ্ছে, আর যা মুখে আসছে তাই আওড়ে গাল পাড়ছে অদৃশ্য শত্রুকে, যে শত্রু তার এতবড় অপমানটা করলে।

বড় মোড়লকেই জিজ্ঞাসা করলাম—"ফাটক খাটতে চাও এই বয়সে?"

বন্ধ হল বুক চাপড়ানো আর গলাবাজী। হাঁ কিন্তু বন্ধ হল না। হাঁ করে চেয়ে রইল আমার দিকে মোড়ল।

সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলাম আইনের মারপ্যাঁচটুকু। আইন যাঁদের হাতে সেই হুজুররা এলেন বলে। এখন বুঝে দেখ সকলে, মাদুরে জড়ানো লাস উধাও হয়েছে শুনলে সেই হুজুররা কি ছেড়ে কথা কইবেন? সুতরাং যদি ভাল চাও—

ভাল সবাই চায়। তার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া গেল। রামহরে পঙ্কা আর রামহরির বউ বেটী ছাড়া এক প্রাণী আর রইল না শ্মশানে। যেখানে দু'মিনিট আগে রই-রই চলছিল সেখানটা হঠাৎ নীরব নিস্তব্ধ নিশীথ রাতের শ্মশানে পরিণত হল। আমঅতন আর ভাইপো আমজীবন মাথা নিচু করে শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকের মত গঙ্গায় গিয়ে নামল। গঙ্গা থেকে উঠে কোনও দিকে না চেয়ে সোজা প্রস্থান। মড়া খেলানো যার কাছে ছেলেখেলা, সেও জ্যান্ত খেলাতে ভয় পায়।

উদ্ধারণপুরের হাসি।

হাসির চটুল চাউনিতে চতুরালির চমকানি। ক্ষুরধার ক্ষুরের ওপর রোদ পড়লে যেমন চোখ-ধাঁধানো চমকানি লাগে সেইরকম চমকানি লাগে উদ্ধারণ-পুরের চটুল চাউনির দিকে চাইলে। ক্ষুরধার ক্ষুরের ধারালো দিকটার ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটাও হয়ত সম্ভব কিন্তু উদ্ধারণপুরের চটুল হাসির চতুরালির

ধারে কাছে ঘেঁষতে গেলে কেটে দু'খণ্ড হবার ভয়। সে চাউনির চোরাবালিতে পড়লে পাকা পাটুনীরও পরিত্রাণ নেই।

আর খন্তা ঘোষের দাঁতালো হাসির পেছনে যে দুর্জ্ঞেয় দুরভিসন্ধি লুকিয়ে থাকে তার লীলাখেলা বোঝা উদ্ধারণপুরের উগ্রচণ্ডীরও অসাধ্য।

মুখে গালা লাগানো মা-কালী মার্কা দুটো বাজারে-বোতল বগলে করে খন্তা দেখাতে এল তার দু'গণ্ডা দাঁতের দেমাক। দূর থেকেই দরাজ গলায় হেঁকে বললে—"খন্তা ঘোষ লুকোছাপার ধার ধারে না, এ বাবা খাস আবকারি আঁচে ভিয়ান করা ভদ্রলোকের পাতে দেবার মাল। আইনে আটকায় কোন্ শালা? নাও গোসাঁই—গণ্ডুষ করে ফেল এটুকু। গলাটা ভিজিয়ে নাও চট করে। বাবার বাবারা এলেন ব'লে; তাঁদের মুখ দর্শন করলে গলা দিয়ে আর নামতে চাইবে না কিছু।"

প্রসন্ন হলাম।

খন্তা ঘোষের নজর থাকে সব দিকে। এইজন্যে ওকে এত ভাল লাগে। বললাম—"কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ? এধারে শ্মশানও যে শুকিয়ে উঠল, শয়তানদের জ্বালায় শেয়াল শকুনগুলোও পালিয়েছে শ্মশান ছেড়ে। কাল থেকে চিতাগুলো আছে নিবে। কারবার গুটোতে হবে এবার দেখছি।"

রামহরির বউ ব্যবসা বোঝে। সে বললে—"হক কথা বললে জামাই। চিতে সব ঝিমিয়ে পড়েছেন। ওনাদের না চেতালে আমাদের দিন চলা বন্ধ। কাল মঙ্গলবার, আমি খরচা দোব। কাল রেতে তুমি মা শ্মশানকালীর পূজা দাও চিতের ওপর।"

রামহরি দাবড়ি দিলে বউকে—"তুই মুখ থামা ত সীতের মা। খামকা বকে মরিস্ ক্যানে। আগে দেখ, থানা পুলিসের হুজ্জৎ কতদূর গড়ায়।"

"গড়িয়ে গিয়ে পড়বে ঐ মা গঙ্গার জলে।" খন্তা ঘোষ খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল, "বলে—'কত হাতি গেল তল—এখন মশা বলে কত জল!' ঘাবড়াচ্ছ কেন বাবা ডোম! তোমাদের কারবার মারে কে? আগে এসে পৌঁছক কে আসছে! এসে পৌঁছলে দেখবে মা গঙ্গার দয়ায় সব গঙ্গাজল হয়ে যাবে।"

ইতিমধ্যে একটা বোতলের গলা ভেঙে নিজের গলাটা ভিজিয়ে নিয়েছি। বোতলের শেষটুকু ওদের শালা-ভগিনীপতিকে প্রসাদ দিলাম। আর একটা বোতল তুলতে দেখে খন্তা এক খামচা দলাপাকানো নোট বার করলে পকেট

থেকে। নোটের দলাটা পঞ্চার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—"গুণে দেখ্ পঞ্চা, কত আছে? যে ক'টা বোতল হয় ওতে, নিয়ে আয় কেলো শুঁড়ীর দোকান থেকে। মাল কিছু মজুদ রাখা ভাল। বাবারা এলে দেখতে পাবেন, বেআইনী কারবার নেই বাবা উদ্ধারণপুরের ঘাটে।"

ভগিনীপতির হাত থেকে বোতলটা নিয়ে দু' ঢোঁক গলায় ঢেলে পঞ্চা ছুটল। কানে-গোঁজা আধ-পোড়া সিগারেটটা নামিয়ে মুখে গুঁজে খন্তা দেশলাই জ্বাললে। রামহরির বউ করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নিবনো চিতাগুলোর দিকে। খাঁ-খাঁ করছে চিতাগুলো। কাঠ নেই, আগুন নেই। নেই আগুনের ওপর হাড় মাংস। ঘুমিয়ে পড়েছে উদ্ধারণপুরের ঘাট। যজ্ঞি-বাড়ীর লোকজন খাওয়ানো গেছে চুকে। ভিয়ানকররা বিদেয় নিয়েছে। পড়ে আছে শুধু ভিয়ানের চুলোগুলো। আত্মীয়-কুটুম্বরাও সব চলে গেছে। উৎসবের উৎসাহ উত্তেজনা আর নেই। বাড়ীর মানুষ কে কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছে। যেদিকে তাকাও—একটা বুক চাপা রিক্ততা। ঠিক সেই অবস্থা উদ্ধারণপুরের ঘাটের! অবস্থা দেখে আমার মনটাও কেমন দ'মে গেল। দ'মা মনে দম দেবার জন্যে দ্বিতীয় বোতলটাও গলায় ঢেলে দিলাম।

দম ফুরিয়ে গেছে, ঝিমুচ্ছে উদ্ধারণপুরের ঘাট।

আমরা চারজন—আমি, খন্তা, রামহরি আর সীতের মা—আমরা গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছি। উপায় ঠাওরাচ্ছি কি করে বজায় রাখা যায় উদ্ধারণপুরের ঠাট। কিন্তু সীতের কোনও ভাবনা-চিন্তা নেই। সে তার মায়ের কাঁকালে বসে গালে ঢুকিয়ে দিয়েছে নিজের ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত। মেয়েটা জন্মেছে চোষবার জন্যে। হয় চুষছে মায়ের বুক, নয় চুষছে নিজের হাত। একটা না একটা কিছু চুষবেই।

খন্তা ঘোষও চুষছে। সদা পরিদৃশ্যমান আটখানি দাঁতের ফাঁকে ডান হাতের তিনটে আঙুলের মাথা ঢুকিয়ে চুষছে খন্তা ঘোষ। ঐ আঙুল তিনটির সাহায্যে সে ধরে আছে ক্ষয়ে-যাওয়া সিগারেটের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশটুকু। সব কিছুর ষোল আনা দাম উসুল করা তার স্বভাব।

সেই জন্যেই বলে—'স্বভাব না যায় ম'লে—ইল্লত না যায় ধুলে।'

উদ্ধারণপুর ঘাটের স্বভাবও পালটাবে না কিছুতে, সাদা হাড় আর কালো কয়লার ইল্লতও ঘুচবে না, দুধ দিয়ে ধুলেও ঘুচবে না।

বহুদূরে শোনা গেল—"বল হরি—হরি বোল।"

চমকে উঠল রামহরির বউ। আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল রামহরি। ওদের মেয়ে মুখ থেকে হাত বার করে বড় সড়কের দিকে চেয়ে রইল। কোথা থেকে শুম্ভ-নিশুম্ভ বেরিয়ে এসে প্রাণপণে ছুটে গেল বড় সড়কের দিকে। শকুনগুলো এতক্ষণ ডানা মেলে পড়ে ছিল গঙ্গার ধারে, তারা ডানা গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে দু'টো শেয়াল আকন্দ-জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওধারে চলে গেল। শুধু নিশ্চিন্ত খন্তা ঘোষ, পকেটে হাত পুরে আর একটা দোমড়ানো সিগারেট বার করে নির্বিকারভাবে অগ্নিসংযোগ করলে।

আবার শোনা গেল—"বল হরি—হরি বোল।" কাছাকাছি এসে গেছে উদ্ধারণপুরের চিতার ভোগ। কোল থেকে মেয়েকে নামিয়ে রামহরির পরিবার হাঁটু গেড়ে একটি প্রণাম সেরে ফেললে। কাকে ঠিক বোঝা গেল না, বোধ করি ওদের ইষ্ট দেবী শ্মশানকালীকেই—যাঁর দয়ায় উদ্ধারণপুরের চিতার আগুন নেবে না কখনও।

কিন্তু চিতার ভোগ পৌঁছবার আগেই একটা বিদঘুটে আওয়াজ শোনা গেল বড় সড়কের ওপর। চমকে উঠলাম সকলে। মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম—মস্ত একখানা চকচকে মোটরগাড়ী এসে থেমেছে নিম গাছটার ওধারে। আর একবার চমকে উঠলাম—প্রথমে যিনি গাড়ী থেকে নামলেন তাঁকে দেখে। মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর নামলেন কাছা গলায় দিয়ে। তাঁর পেছন পেছন একে একে নেমে এলেন আরও দু'জন হোমরাচোমরা ভদ্রলোক।

ওঁরা তিনজন নামছেন বড় সড়ক থেকে। নিম গাছতলায় পৌঁছবার আগেই আবার শোনা গেল—"বল হরি—হরি বোল।" ওঁরা এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। বাঁশে-বাঁধা মাল কাঁধে নিয়ে দু'জন লোক তরতর করে নেমে এল ওঁদের পাশ দিয়ে। পেছনে আরও কয়েকজন মালপত্র লাঠি লণ্ঠন নিয়ে ছুটে আসছে।

রামহরি উঠে গেল তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে। রামহরির বউ গেল। খদ্দের "লক্ষ্মী"। উদ্ধারণপুর ঘাটের খদ্দের শুধু "লক্ষ্মী" নয়—একেবারে "মহালক্ষ্মী"। এ খদ্দের নেয় না কিছুই, শুধু দিয়ে যায়। মাল দেয়, টাকা দেয়, খাট-বিছানা কাঁথা-কম্বল দেয়। দেয় মদ-গাঁজা চাল-ডাল কাপড়-চোপড় সবকিছু। দিয়ে নিজেদের নিঃস্ব করে ঘরে ফেরে। এরকম খদ্দেরকে খাতির করে না কে?

মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর তাঁর সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে এসে পৌঁছলেন আমার গদির সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে খন্তা ঘোষ একেবারে গড় হয়ে পড়ল তাঁর একজন সঙ্গীর পায়ের ওপর। প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াতে তিনি চিনতে পারলেন খন্তাকে। হাসি-মুখে বললেন—"আরে ঘোষ যে! ভাল ত সব?"

কৃতার্থ হয়ে গেল খন্তা। যে ক'খানা দাঁত তার লুকিয়ে থাকে মুখের মধ্যে সেগুলোও বার করে ঘাড় কাত করে জবাব দিল—"আজ্ঞে হুজুর, আপনার আশীর্বাদে একরকম—"

হুজুর তাড়াতাড়ি চাপা দিতে চাইলেন ভাল থাকাথাকির প্রসঙ্গটা। বললেন—"ভালই হল যে তোমায় এখানে পাওয়া গেল ঘোষ। আমাদের ন'পাড়া থানার দারোগা নাকি এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কই তাকে ত দেখতে পাচ্ছি না!"

দাঁত বার করেই খন্তা জবাব দিলে—"এখানেই তাঁকে পাবেন হুজুর। ওই ওপরে ঝুমরী পাড়ায় তাঁকে ভাল করে রেখে দিয়েছি তাঁর মেয়েমানুষের ঘরে। এখনও ভাল করে হুঁশ-জ্ঞান হয়নি কিনা তাঁর।

হুজুর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"হুঁশ-জ্ঞান নেই তাঁর? তার মানে? হুঁশ-জ্ঞান তাঁর নেই কেন? এখানে তিনি এলেনই বা কি জন্যে?"

তখন খন্তা একে একে জানালে—কি জন্যে দারোগা এসেছেন এখানে। এসে তিনি কিভাবে তদন্ত আরম্ভ করেন, তারপর অর্ধেক রাতে আসামীদের গ্রেপ্তার করতে এসে কি করে ফ্যাসাদে পড়ে গেছেন তিনি।

মড়া পুড়িয়ে তিনজন লোক ফিরছিল শ্মশান থেকে। মাঠের মাঝে কারা তাদের লাঠি মেরে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেয়। খানার মধ্যে ঠ্যাং ভাঙ্গা অবস্থায় পড়েছিল তারা। সেখান থেকে উঠিয়ে তাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জ্ঞান হলে তারা নাম করে নিতাই দাসী বোষ্টমীর আর চরণদাস বাবাজীর। সেই বাবাজী বোষ্টমীর খোঁজেই দারোগা সাহেব আসেন উদ্ধারণপুর ঘাটে। ঘাটে এসে বাবাজী আর বোষ্টমীকে হাতেও পান। কিন্তু কি তাঁর খেয়াল হ'ল, খেলিয়ে মাছ ডাঙ্গায় তুলতে চাইলেন। দিনের বেলায় তাদের ছেড়ে দিয়ে নিজে একটু রঙ্ করতে গেলেন ময়নার ঘরে। অর্ধেক রাতে নেমে এলেন শ্মশানে। রাতে শ্মশানে নামা নিষেধ। কিন্তু তিনি কারও মানা মানলেন না। ফলে কি যে দেখলেন তিনি শ্মশানে তা তিনিই জানেন। কিন্তু সেই থেকে অজ্ঞান হয়ে আছেন আর মুখ দিয়ে গাঁজলা ভাঙছে।

চলছে খন্তার গল্প বলা—একমনে শুনছেন হুজুররা।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কে হুজুরদের পেছন থেকে।

"ঠাকুর হেই বাবা—আমি তোমার অধম সন্তান জয়দেব গো বাবা। এবার আগে থেকেই এসে গেছি বাবা। এবার জ্যান্ত বউটাকেই নিয়ে এসেছি তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিতে। দেখি এবার তুমি একে রক্ষে না করে থাকবে কি করে? দেখি এবার আমার বংশরক্ষা আটকায় কোন্ শালার ব্যাটা?"

লাফিয়ে নেমে গেলাম গদি থেকে। হুজুরদের ঠেলে সরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম জয়দেবের সামনে। চিৎকার করে উঠলাম দু'হাতে ওর দু'কাঁধ ধরে—

"জয়দেব, তোমার কবচ কোথায়? তোমায় যে কবচটা দিয়েছি আমি—সেটা কই? এই ত সেদিনও তুমি তোমার বউকে পোড়াতে এসেছিলে সেই কবচটা গলায় দিয়ে।"

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল জয়দেব আমার মুখের দিকে।

এক ঝাঁকানি দিলাম ওর দু'কাঁধ ধরে—"বল জয়দেব, বল শিগ্‌গির—কোথায় গেল সেই কবচটা?"

ডুকরে কেঁদে উঠল জয়দেব—"বলছি বাবা, বলছি। অপরাধ নিও না বাবা তোমার অধম সন্তানের। এখান থেকে ফেরবার সময় সেটা হাইরে ফেলেছি বাবা। আগাগোড়াই সেটা ছিল আমার গলায়। নপাড়ায় ঢুকে কি দুর্বুদ্ধি হল। থানায় গিয়ে ঢুকলাম। থানার ছোটবাবু বন্ধু লোক, তাঁর সঙ্গে বসে একটু রঙ্ করে বড্ড বেসামাল হয়ে পড়লুম। থানার লোকেই টেনে নিয়ে কখন বাড়িতে ফেলে দিয়ে এসেছে জানতে পারিনি। পরদিন যখন নেশা কাটল তখন থেকে আর কবচটা খুঁজে পাচ্ছি না। হেই বাবা—অপরাধ নিও না তোমার অধম সন্তানের বাবা—"

জয়দেব আমার পা জড়িয়ে ধরতে এল।

মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর এগিয়ে এসে ধরে ফেললেন জয়দেবের একখানা হাত।

"ঘোষাল মশায়—চিনতে পারছেন আমায়?"

কাঠ হয়ে গেল জয়দেব—"আজ্ঞে হুজুর, আজ্ঞে আমি, আজ্ঞে—"

ধীর শান্তকণ্ঠে কুমার বললেন—"পেরেছেন তাহ'লে আমায় চিনতে। যাক্, বলুন ত আপনার সেই ন'পাড়া থানার ছোটবাবু বন্ধুটি এখন কোথায়?"

"আজ্ঞে তা কি করে জানব হুজুর, তা আমি জানব কেমন করে? পরদিন সকালে থানায় গিয়ে তাঁকে ত পাইনি। তিনি নাকি কোথায় থানাতল্লাশ করতে বেইরেছেন।"

"ভাল করে ভেবে দেখুন ত ঘোষাল মশায়, সে রাত্রে কি কি কথা হয়েছিল আপনার বন্ধুটির সঙ্গে। ভাল করে ভেবে জবাব দিন—মনে রাখবেন যে আপনার জবাবের ওপর তার ভাল-মন্দ নির্ভর করছে। সেই ছোটবাবুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

আকাশ থেকে পড়ল জয়দেব—"খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! সে কেমন কথা?"

তখনও কুমার বাহাদুর ধরে আছেন জয়দেবের হাতখানা। হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে তিনি বললেন—"মনে করুন ঘোষাল মশায়, ভাল করে মনে করুন। সে রাত্রে এমন কোনও কথা তিনি আপনাকে বলেছিলেন কিনা, যাতে অন্তত আন্দাজ করা যায়, কোথায় তিনি যেতে পারেন। তাঁকে যদি না পাওয়া যায় তাহ'লে আপনার বিপদ বাড়বে। এই যে দেখছেন এঁদের দু'জনকে, এঁরা যদিও ভাল মানুষ সেজে এসেছেন কিন্তু এঁরা সহজ লোক নন। ইনি হচ্ছেন পুলিসের বড় সাহেব আর ইনি আমাদের মহকুমা হাকিম। এঁরা বেরিয়েছেন সেই ছোট দারোগার খোঁজ করতে। ভেবে কথার জবাব দিন এবার।"

জয়দেব ভয়ানক ঘাবড়ে গেল। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ-চোখ। একটু পরে সে আবার সামলে নিলে নিজেকে। এবং একটু উত্তেজিতও হয়ে উঠল, একটানে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—"বলবই ত। বলবই ত সত্যি কথা। হলেই বা বন্ধুলোক, কিন্তু সে শুয়োর ব্যাটার মুখ দেখতে আছে নাকি! হারামজাদা নচ্ছার জাত-বিচ্ছু! নয়ত অত নীচ নজর হয়? আমাদের রাঙা দিদিমণির ওপর ওর নজর! কতবার আমায় সেধেছে, টাকাকড়ি পর্যন্ত দিতে চেয়েছে রাঙা দিদিমণিকে ফাঁদে ফেলে ওর হাতে দেবার জন্যে। সে-রাতেও ঐ এক কথা একশবার বলেছে। শেষে আমি ভয় দেখিয়ে বললাম—যাও না, যাও। সাহস থাকে যাও উদ্ধারণপুরের ঘাটে। সেখানে সাঁইবাবা বসে আছেন। রাঙা দিদিমণি তাঁর শ্রীচরণ আঁকড়ে আছে, কেউ তার অনিষ্ট করলে বাবা আর রক্ষে রাখবেন নাকি তার? সেই কথা শুনে ব্যাটা বললে কিনা যে সে দেখবে কি ক'রে বাবা বাঁচায় দিদিঠাকরুণকে। তারপর আর আমার হুঁশ ছিল না। পরদিন সকালে যখন হুঁশ হল বাড়িতে, তখন কবচটা আর পেলাম না। ছোটবাবুও সেই থেকে একেবারে উধাও হয়েছেন। তাঁকে ধরতেই পারছি না যে কবচটার কথা একবার শুধোব।"

মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর তাঁর আঙুল থেকে খুলে ফেললেন একটি পাথর বসানো আংটি। বললেন—"এখন আপনার বউ দেখান ঠাকুর

মশাই, তিনি ত আমার গুরুজন। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। আমি তাঁকে এবার নমস্কার করি।"

আংটিটা জয়দেবের হাতে গুঁজে দিয়ে নেপথ্যস্থিতা জয়দেব-পত্নীকে লক্ষ্য করে বললেন—"আপনাকে নমস্কার করছি গো বৌঠান। পূজোর সময় যাবেন আমাদের বাড়ী ঠাকুরমশায়কে নিয়ে।"

ওঁদের মধ্যে চোখে চোখে কি কথা হয়ে গেল। ওঁরা ফিরে চললেন। যাবার আগে কুমার আমায় বললেন—"দয়া করে একটু স্মরণ করবেন আমায়, যখন দরকার হবে। আপনার কোনও কাজে লাগতে পারলে ধন্য জ্ঞান করব নিজেকে।"

পুলিস সাহেব আর হাকিম সাহেব কিছুই বললেন না। শুধু জোড় হাতে নমস্কার করে গেলেন। খন্তাও গেল তাঁদের পিছু পিছু—বোধ হয় সাধুরাম-সমস্যার একটা সমাধান করবার জন্যে।

তখন মনে পড়ল জয়দেবের এবারের ধর্মপত্নীর কথা। কিন্তু কই সে? কোথায় গেল ন'পাড়ার হেঁপো রুগী হারাধন চক্কোত্তির ডাগর-ডোগর মেয়ে ক্ষিরি?

জয়দেবই জানালে। জানালে যে হারাধন চক্কোত্তির মরেছে। মেয়েকে জয়দেবের মত সুপাত্রের হাতে তুলে দিয়ে সেই রাত্রেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে মরেছে। মেয়েই এসেছে বাপের মুখে আগুন দিতে। কারণ ছেলে ত নেই হারাধনের। ওই ওধারে চিতা সাজানো হচ্ছে। জয়দেবের বউ সেখানেই আছে। বাপের মুখে আগুন দিয়ে আসবে। এসে আমার চরণধুলো নেবে।

একথাও জানালে জয়দেব যে শ্বশুরকে পোড়াবার যাবতীয় খরচটাও সে-ই করছে। জানিয়ে ছুটে চলে গেল ওধারে। একটু পরে ফিরে এল দু'টো বোতল হাতে করে। এসে আর একবার নিবেদন করলে তার আরজি। এবার যখন সে জ্যান্ত বউটাকেই এনে ফেলেছে আমার শ্রীচরণতলে, তখন এবার আমায় রক্ষে করতে হবে তার বউকে, যাতে তার বংশটা রক্ষা হয় তার ব্যবস্থা করে দিতেই হবে এবার।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।
ঘাটের পুবে বয়ে চলেছে গঙ্গা।
গঙ্গা বয়ে চলেছে উদ্ধারণপুরের কালো মাটি আর কালো কয়লা ধুয়ে নিয়ে।
কিন্তু নিতাই ত কালো নয়!

কোথাও কি কালোর কালিমা লুকিয়ে আছে সেই দুধে-আলতায় গোলা লালিমার মধ্যে ?

কালো নয় মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুরও। বড় বেশি রকম মানায় ওঁকে নিতাইয়ের পাশে। আর বাবাজী চরণদাসকেও মানায়। কিন্তু সেটা হল বিপরীত মানান মানানো। নিতাইয়ের রঙটা আরও উৎকটভাবে খুলে যায় চরণদাসের পাশে। চট্ ক'রে নজরে ধরে যায় নিতাইয়ের দুধে-আলতায় গোলা রঙ্ শুধু চরণদাস পাশটিতে থাকে ব'লে ওর। কুমার বাহাদুরের পাশে নিতাই বা নিতাইয়ের পাশে কুমার বাহাদুর—না—তেমন একটা হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবার মত দৃশ্য হবে না সেটা। বরং বলা যায়—এ ওর রূপের সঙ্গে মিলিয়ে যাবে। তখন একে ওকে আলাদা ক'রে চেনাই যাবে না।

মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর।

হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে মস্ত উপকার ক'রে গেলেন আমার। একটা জলজ্যান্ত দারোগাকে দাঁতকপাটি লাগিয়েও রেহাই পেয়ে গেলাম ওঁর দয়ায়।

আবার যাবার সময় বলে গেলেন—"আপনার কোনও কাজে লাগতে পারলে ধন্য জ্ঞান করব নিজেকে।"

কেন ?

হঠাৎ এতটা সদয় হয়ে উঠলেন উনি কেন আমার ওপর ? কে ওঁকে সংবাদ দিয়ে পাঠালে এখানে ?

কোথায় গেল বাবাজী চরণদাস নিতাইকে নিয়ে ?

মনে হল যেন—যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম কুমার বাহাদুরের চোখে সেই আলো যে আলো ঠিকরে পড়ে নিতাইয়ের কাজল-কালো আঁখি দু'টি থেকে।

কলুষনাশিনী মা গঙ্গা। উদ্ধারণপুর ঘাটের কলুষটুকুর ওপরই তাঁর লোভ। মাদুরে মুড়ে দড়িতে পেঁচিয়ে অতন মোড়ল যা এনে নামালে তাও হরণ করলেন মা গঙ্গা। বৈশ্বানরকে বঞ্চিত করে চুপিচুপি সরিয়ে ফেললেন সেই মাদুর-মোড়া রহস্য। তার ভেতরেও কি লুকিয়ে ছিল কোনও কলুষ ? অতন মোড়ল মড়া খেলাতে জানে, কি খেলা খেলেছিল সেই মড়াটাকে নিয়ে তাই বা কে জানে ?

আর সেই কচি ছেলের কান্না, যা শুনে নিতাই আর স্থির থাকতে পারলে না। গঙ্গা-গর্ভ থেকেই উঠছিল সেই শিশুর কাতরানি। কচি ছেলেপুলের জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে নিতাই। বাবাজী চরণদাসেরও ঐ এক রোগ। কতদিন ওরা বলেছে, একটা মা-মরা ছেলেমেয়ের জন্যে আমার কাছে কাকুতি-মিনতি করেছে। কোলের ছেলে ফেলে রেখে কত মা শ্মশানে আসে চিতায় উঠে পোড়বার জন্যে। সেইরকম একটা মা-হারা ছেলে চাই নিতাইয়ের। আমি নাকি একটু খেয়াল করলেই সে রকম একটা ছেলেমেয়ে তাকে যোগাড় করে দিতে পারি।

কিন্তু পারিনি, কিছুই দিতে পারিনি আমি নিতাইকে।

কি দোষ? দেবার মত কি আছে আমার? যে মড়ার গদির ওপর শুয়ে থাকে তার কাছে নিতাই কিসের প্রত্যাশা করে?

কিছু না পাওয়ার অভিমানেই চলে গেল নিতাই।

বোবা গঙ্গা বয়ে চলেছে উদ্ধারণপুরের কালো মাটি ধুয়ে নিয়ে। নিতাই কালো নয়, তবু তাকে নিয়ে গেল।

কে বলে দেবে, নিতাইয়ের দুধে-আলতায় গোলা লালচে আভার মধ্যে কোথাও কালোর কলুষ লুকিয়ে আছে কিনা, কে বলে দেবে আমায়?

উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন।

স্বপ্ন হল জাত জালিক। অকুলপাথার সাগরবুকে যেখানে জলপরীরা জলতরঙ্গ বাজিয়ে গান গায়, সেখানে জাল নিয়ে ছোটে স্বপন-জেলের পাগলা পান্‌সি। অগাধ জলের তলে যেসব মনগড়া জাল মাছেরা খেলা ক'রে বেড়ায় তাদের ধরবার জন্যে জাল ফেলে সে চুপ ক'রে বসে থাকে তার পান্‌সির ওপর। খেয়ালও করে না কোথায় চলেছে তার পান্‌সিখানি উজানভাটির টানে। হঠাৎ ফুঁসিয়ে ওঠে জল, চক্ষের নিমেষে একটা জলস্তম্ভ ওঠে ঘুরতে ঘুরতে, স্বপন-জেলের পান্‌সিখানাকে মাথায় ক'রে নিয়ে উঠে যায় মেঘের মধ্যে। তখন জলপরীরা পান্‌সিখানাকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায় মেঘসমুদ্রে আর সেই আসমানে আসমানী মাছ ধরবার জন্যে উদ্ধারণপুরের জাত জেলে জাল ফেলে বসে থাকে।

উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন।

স্বপ্ন পাতে জাল। উদ্ধারণপুর ঘাটের পারাপার জুড়ে স্বপন-জেলের বেড়া-জাল পাতা। সে জালের আঁটুনি বজ্রের মত শক্ত কিন্তু তার গেরোগুলো সব ফুলের মত ফসকা। সে জালে আটকায় না কিছুই, বাঘা বোয়াল আর চুনো-পুঁটি সবই যায় পালিয়ে। ফাঁদে পড়ে শুধু স্বপন-জেলে নিজে। নিজের জালে জড়িয়ে বেচারা ছটফট ক'রে মরে।

উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন।

স্বপ্ন টাকু ঘোরায় আর তার জাল বোনবার সুতায় পাক পড়ে। পুরুষ মানুষের মাথার খুলির মাঝে ছেঁদা ক'রে তাতে মেয়েমানুষের বুকের একখানি সরু হাড় পরিয়ে বানানো হয় সেই টাকু। যে সুতা পাকানো হয় সে টাকুতে তা বেরিয়ে আসে মানুষের মগজের ভেতর থেকে। কিন্তু বেরিয়ে আসে বিশ্রী জট পাকিয়ে। তাই তার খেই খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। খেই খুঁজে বার করতে স্বপ্ন হিমশিম খেয়ে ওঠে। তখন সেই টাকু দিয়েই নিজের কপালে আঘাত করতে থাকে আর তার ফলে স্বপন-জেলের কপাল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

কিন্তু কিছুতেই কপাল ভাঙে না উদ্ধারণপুর ঘাটের। মহা জাগ্রত মহা-শ্মশানের মহা-মাহাত্ম্য আবার সগৌরবে জাঁকিয়ে ওঠে। মাল আসে, ভিয়ান চড়ে, যা পাক হয় তারও কিছু প'ড়ে থাকে না। সব ঠিকঠাক কাটতি হ'য়ে যায়।

রামহরির বউকে আর শ্মশান-কালীর পূজো দিতে হয় না, তার অচলা ভক্তিতে গ'লে গিয়ে মা মুখ তুলে চান। চান রামহরির সংসারের দিকে নয়, "কিপাদিষ্টি" নিক্ষেপ করেন উদ্ধারণপুর ঘাটের এলাকা ছাড়িয়ে সারা দেশটার ওপর। ব্যাস—তা'হলেই হল—দেশকে দেশ উজাড় হয়ে সব মাল এসে ওঠে উদ্ধারণপুরের ঘাটে।

এমন কি পাচার-হওয়া আমঅতন আমজীবনের মালও মা গঙ্গা "কিপা" করে ফিরিয়ে দেন। ডোমপাড়ার সিধে ডোম ডিঙি নিয়ে উজানে মাছ মারতে যাচ্ছিল। মাছ মারা আসল কথা নয়, সিধে ডোম ডাঙার কোল ঘেঁষে লগি ঠেলে ডিঙি বায় আর ঝোপঝাড়ের দিকে নজর রাখে। কপালে থাকলে দু'একটা গোসাপ মাঝে মধ্যে মিলেও যায়। গোসাপ মারতে হয় লুকিয়ে-চুরিয়ে, ছাল খানার দাম আছে। তবে জানতে পারলে থানায় টেনে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার দেয়। সিধে ডোমের লগিতে লাগল এই মাল। বাজার-খালের ওপরে কেয়া ঝোপের তলায় আটকে ছিল। সিধে ডোম চিনতে পেরে ঝোপ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

আমাদেরও চিনতে কষ্ট হল না। মোড়লের পাকা হাতের পাকা কাজ, মাদুরে জড়ানো আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা ঠিক সেই মালই বটে। দড়ির বাঁধন এতটুকু টসকায় নি কোথাও—ফুলে ফেঁপেও ওঠে নি। এমন কি গন্ধ বাসও বার হচ্ছে না একটুও। আর সব থেকে তাজ্জব কাণ্ড হচ্ছে, খেংরাকাটির মত সিধে ডোম, সিধে হয়ে অনায়াসে সেটাকে কাঁধে করে নামিয়ে নিয়ে এল ডিঙি থেকে। টসটস করে জল পড়ছে তখনও, কিন্তু ভিজে একটুও ভারী হয় নি মড়াটা। বোধ হয় দশ-বারো বছরের ছেলেমেয়ে হবে, এন্তার ভুগে একেবারে হাড্ডিসার হয়ে মরেছে। তাই অত ছোট করে বাগিয়ে বাঁধতে পেরেছিল মোড়ল, তাই জলে ভিজেও ভারী হয় নি একটুও।

ডাকা হল সকলকে। রামহরি, পঙ্কা, রামহরির বউ, ডোমপাড়ার সবাই, ময়না, সুবাসীরা সকলে, আর সিধু কবরেজ—সবাই ছুটে এল। এল না শুধু খন্তা, খন্তা গেছে সাধুরামকে স্বস্থানে পৌঁছে দিতে। বলে গেছে, ফিরে এসে সে আমঅতনদের মালের একটা কিনারা করবে। সেই মালই ফিরে এল অথচ খন্তা নেই। এ সময় থাকলে সব থেকে বেশি খুশি হত সে। সুতরাং তার অনুপস্থিতিটা সকলেই বেশ বোধ করলে।

সিধু ঠাকুর নিবেদন করলেন যে মা গঙ্গা যখন নিয়েও নিলেন না তখন একে

সৎকার করতে হবে। হয় জলে নয় আগুনে। জল থেকে যখন উঠে এল ও, তখন এবার চাপাও আগুনে।

চাপাও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু খরচটা ? কে দেবে চোদ্দ সিকে ? চোদ্দ সিকে হল চুক্তি। চোদ্দ সিকেয় কাঠ পাটকাঠি কলসী ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জাম যোগান দিতে হবে রামহরিকে। একেবারে কাঠ বয়ে এনে চিতে পর্যন্ত সাজিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এখন দেয় কে চোদ্দ সিকে ?

অবশেষে সাত সিকে যোগাড় হয়ে গেল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ময়না ওদের নিজেদের ভেতর থেকে সাত সিকে তুলে এনে দিলে। আর সাত সিকে দিলে সীতের মা। সত্যি সত্যিই সাতখানা সিকি এনে দিলে রামহরির হাতে। রামহরি আবার সেটা তার হাতেই গুণে দিলে, যেমন দেয় অন্য খদ্দেরের কাছে আদায় ক'রে। তখন কাঠ বইতে গেল ওরা শালা-ভগ্নীপতি।

এখন প্রশ্ন হল আগুন দেবে কে ?

আমঅতন আমজীবন থাকলে তারাই আগুন দিত। কেঁধোদের হক আছে আগুন দেবার। মড়ার মুখে আগুন দিয়েই তাদের হাতে সঁপে দেওয়া হয়—তারাই পোড়ায় এখানে এনে। কিন্তু ডোমে পোড়ালে অন্য কথা হয়ে দাঁড়াবে যে। আর মড়াটা যে কোন্ জাতের, তাই বা কে জানে ?

আচ্ছা—খোলাই হোক না মড়াটা। সিধে ডোমই খুলুক, ওই যখন ব'য়ে এনেছে কাঁধে করে।

সিধে বললে জোড় হাত ক'রে।

"তাহ'লে একটু পেসাদ দ্যান কত্তা। চোখদুটো একটু আঙা করে নিই আগে। কে জানে কার বুক খালি করে এনেছে একে। কেঁধো শালাদের পাঁজরার ভেতর ধুকপুক করে না বুক। ও শালারা যা পারে আমরা তা পারি নে।"

মেয়েরা দিলে একটা বোতল এনে। রামহরির বউও দিতে পারত। কিন্তু এ ক'দিন তার ভাটি ঠাণ্ডা। সাবধান করে গেছে খন্তা—সে ফিরে না এলে যেন ভাটি না চড়ে। হুজুরদের নজর একটু না ঘুরলে ও-সব সাহস করা উচিত নয়। সুতরাং আইনে চুয়ানো বোতল এনে দিলে মেয়েরা।

পেসাদ ক'রে দিলাম। সিধে ডোম একটা ভাঙা ভাঁড়ে নিলে মাত্র দেড় ছটাক। এসব বাজারে-বস্তু তার নাকি চলেই না।

সেটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে সিধে বসল গিঁট খুলতে। নারকেল দড়ির গিঁট, জলে ভিজে আরও চেপে বসেছে। শেষে কাটতে হল কাটারি এনে। দড়িগুলো

খুলে ফেলে মাদুরটা ছাড়িয়ে ফেললে সিধে। সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে—একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মাদুরের ভেতর কাঁথা-জড়ান মড়া। কাঁথাখানাও ভিজে সপসপ করছে। কাঁথাখানা ছাড়িয়ে ফেলা হল। তারপর নোংরা কাপড়ে বাঁধা একটা মাঝারি শব। সেটাকে দু'হাতে ধরে টেনে তুলেই ধপাস করে ফেলে দিলে সিধে। সঙ্গে সঙ্গে আঁত্‌কে উঠল। শুধু আঁত্‌কেই উঠল না, এক লাফে তিন হাত পিছিয়ে গেল।

কি হল না বুঝেই হুড়মুড় করে মেয়েরা পিছিয়ে গেল দশ হাত। কি হল না বুঝতে পেরে আমিও লাফিয়ে নামলাম গদি থেকে। দু'পা সামনেই সেটা পড়ে রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে কাপড়খানা ধরে হেঁচকা টান দিলাম। ফ্যাঁস ক'রে ছিঁড়ে গেল কাপড়খানা। ছিঁড়ে আমার হাতেই চলে এল।

কিন্তু ও কি ? কি ওটা ?

পা দিয়ে ঠেলা দিলাম। সেটা গড়িয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম সেটার দিকে। শ্মশানসুদ্ধ কারও মুখে রা নেই।

হাত দু'য়েক লম্বা একটা কলা গাছের টুকরো পড়ে আছে সবার চোখের সামনে। মড়া নেই।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

তাল-বেতালের পাট।

সে পাটের পাটোয়ারী চালে হদ্দ হুঁশিয়ারের হিকমত যায় ভেস্তে। জাগরণের জায়গা নেই সেখানে, স্বপ্ন তার জাল বোনবার সুতোর খেই খুঁজে না পেয়ে খাবি খায়। সেখানকার সূচীভেদ্য অন্ধকারে রোমহর্ষক হেঁয়ালির পাল্লায় প'ড়ে সুষুপ্তিরও নাভিশ্বাস ওঠে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের স্থান নেই সেখানে। অতন মোড়ল তা' জানে, জানে ব'লেই সে মানুষের দুধে তামাক ভেজায়। সে তামাক টানলে সকলেরই বিশ্বাস হবে যে মড়াটা বেমালুম উবে গেছে পোঁটলার ভেতর থেকে। গেছে শুধু মোড়লের মড়া-খেলানো মন্ত্রবলে। আর ঐ কলা-গাছের টুকরোটাও ঠিক সেই একই কারণে এসে সেঁধিয়েছে ঐ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পোঁটলার মধ্যে।

পঞ্চেশ্বর তামাক টানে না। টানে মড়া পোড়াবার কাঠ। কাঠ টেনে তার কাঁধ দুটো মোষের কাঁধের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে শুধু বেঁকে দাঁড়ালো। উঁহু,

অত সহজে পঙ্কেশ্বরকে বোঝানো সম্ভব নয়। যদিও সে মড়া খেলায় না কিন্তু মড়ার পায়ের হাড় দিয়ে তৈরী পাশা চালে। কাঁধ থেকে কাঠের বোঝাটা ফেলে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে সে দাঁড়ালো। দাঁড়ালো ত দাঁড়িয়েই রইল। এধারে মাদুর কাঁথা দড়িদড়া সব আবার গঙ্গায় দিয়ে আসা হল! কলাগাছের টুকরোটারও গঙ্গাপ্রাপ্তি হল। ওনাকে ভাসিয়ে দিয়ে সিধে আর রামহরি ডুব দিয়ে এসে আগুন ছুঁলে। আগুন ছুঁয়ে একটা ক'রে লোহার চাবি দু'জনে কোমরে ঝুলিয়ে রাখলে। রামহরি বউ জানে—নোয়া আর আগুন ছোঁয়া থাকলে ওনারা কেউ 'দিষ্টি' দিতে পারেন না সহজে।

কিন্তু সহজে পঙ্কেশ্বর ঘাড় সোজা করে না। তামাক কলকে চকমকি আর গামছা কাপড় নিয়ে সে তৈরী হয়ে এল। এসে বললে—

"একবার বিদেয় দাও গোসাঁই, গাঁ-দেশ পানে ঘুরে আসি গিয়ে।"

মেয়ে কোলে ক'রে ওর দিদিও এসে দাঁড়িয়েছিল পেছনে। আঁচলে চোখ মুছে বললে—"বল্, বলে যা গোসাঁইয়ের সামনে যে এবার দেখেশুনে বউ নিয়ে ঘরে ফিরবি। নয়ত আমার মরা মুখ দেখ্‌বিক কিন্তু এই ব'লে রাখনু।"

পঙ্কা ওর ভাগ্নীর মুখখানা ধরে নেড়ে দিয়ে হনহন ক'রে চলে গেল। একবার পেছন ফিরেও চাইলে না। সোজা উঠল গিয়ে বড় সড়কের ওপর।

ওর দিদি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—"হে মা শ্মশানকালী, ওক্কে কোর মা। গোঁয়ার মনিষ্যি, কোথাও যেন কিছু বাধিয়ে না বসে।"

কোথাও কিছু না বাধলে কিন্তু কৈচরের বামুনদিদি এমুখো হন না কখনও। হাত-দেড়েক ঘেরের আড়াই হাত লম্বা একটি মুখ-বাঁধা সুপুষ্ট থলেকে বড় সড়ক থেকে মাথা উঁচিয়ে নেমে আসতে দেখে তৎক্ষণাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। ওটি যাঁর বাঁ কাঁধে চড়ে আসছে তিনি যে আমাদের বামুনদিদি ছাড়া অন্য কেউ নন এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। ওই থলেটি বামুনদিদির স্বহস্তে তৈরী, থলেটি চটের কিন্তু তার ওপর নানা রঙের ছিট দিয়ে অন্তত তিন গণ্ডা তালি লাগাবার দরুন ওটি প্রায় ছিটের থলেতে পরিণত হয়েছে। গঙ্গাস্নানে আসতে যেসব দ্রব্য-সামগ্রী সঙ্গে আনতে হয় সেগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে আনবার জন্যে ঐ থলেটি বামুনদিদি সৃষ্টি করেছেন। কাক পক্ষী মানুষ গরু কেউ ওটির ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে না। চরাচর-অন্তরীক্ষবাসী সবায়ের ছোঁয়া-ন্যাপা এড়িয়ে পাঁচ দিনের পথ বামুনদিদির কাঁধে চ'ড়ে গঙ্গাস্নানে আসে থলেটি। কাজেই

পুণ্য কিছু কম সঞ্চয় হয় নি ওর। পুণ্যে বোঝাই থলেটির মর্যাদাও অসামান্য। কাঁধ থেকে নামাবার সময় শ্মশানভস্মের ওপর গঙ্গা ছিটিয়ে তবে নামানো হবে। তখন ওর পেটের ভেতর থেকে পরপর যা সব বার হবে তাও আমার মুখস্থ হয়ে আছে। প্রথমে বেরোবে গলায় দড়ি-বাঁধা একটি পেতলের ঘটি—তারপর বামুনদিদি টেনে তুলবেন দড়ি-বাঁধা একটি ছোট তেলের বোতল। বোতলটিকে নামিয়ে রেখে আবার থলের ভিতর হাত পুরে যে জিনিসটি বামুনদিদি টেনে বার করবেন সেটি একটি ছোট বড় নানা সাইজের পৌটলা-পুঁটলির মালা। একখানি আস্ত কাপড়ের দশ জায়গায় দশটা পুঁটলি বাঁধা হয়েছে। ওর কোন্‌টিতে কি আছে তাও আমি বলে দিতে পারি। সব থেকে বড়টিতে আছে মুড়ি, তার ছোটটিতে চিঁড়ে, তার পরেরটায় ছাতু। এমনি ভাবে কোনটা থেকে বেরোবে গুড়ের ডেলা, কোনটা থেকে ঝাল লাড়ু। কোনটায় আছে আমচুর, কোনটায় বা খানিক তেঁতুল। সবই গুছিয়ে নিয়ে গঙ্গাস্নানে আসেন বামুনদিদি। মায় একখানি কুরুনি আর এক মালা নারকেল পর্যন্ত বার হয় তাঁর থলি থেকে। উদ্ধারণপুর ঘাটে বসে আরাম ক'রে নারকেলকোরাসহযোগে মুড়ি-চর্বণ—এতবড় বাদশাহী বিলাস একমাত্র বামুনদিদির কৃপাতেই সম্ভব হ'ত। কাজেই ওঁর আবির্ভাবে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠতেই হয়।

চাঙ্গা হয়ে ওঠার মত আরও কিছু মাল সঙ্গে আছে বামুনদিদির। কোনও বেটা-বেটীর সাতেও থাকেন না, পাঁচেও থাকেন না তিনি। থাকেন না বলেই সারা দেশটার যাবতীয় হাঁড়ির খবর তাঁর বুকের মধ্যে একটি ছোট্ট হাঁড়িতে টগবগিয়ে ফোটে। ফুটলেও কোনও ভাবনা নেই, তেমন বাপের বেটী ন'ন তিনি। তাঁর বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না।

ফোটবার দরকারও করে না তাঁর শ্রীমুখখানি। চক্ষু দু'টি আছে কিসের দরুন তাঁর কপালের নিচে? ওই চক্ষু দু'টির সাহায্যে তিনি যত কথা যত সহজে বলতে পারেন কোনও বেল্লিক-বাচালেও তা বদনের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারে না। আমার সামনে পৌঁছেই তিনি তাঁর চোখের তারা দু'টিকে চট করে এমনভাবে ঘুরপাক খাইয়ে দিলেন যে তৎক্ষণাৎ আমার নজর গিয়ে পড়ল সাদা থান-পরা ঘোমটা-টানা আর একটি জীবের ওপর, যিনি ছায়ার মত বামুনদিদির ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ততক্ষণে বামুনদিদির বাঁশীর মত গলাও গিয়ে পৌঁছল শ্মশানের হাড়গুলোর কর্ণবিবরে।

"ওগো ও ভালমানুষের মেয়ে, এই নাও তোমার সাঁইবাবাকে, গড় কর

বাপু।" ভালমানুষের মেয়ে বামুনদিদির পাশ দিয়ে এগিয়ে এল। দু'পা এগোতেই একেবারে তিড়বিড়িয়ে উঠলেন বামুনদিদি—"আহা, হা, হা—আবার চললে কোথায় গো আমার মাথা খেতে? উঠবে নাকি গিয়ে একেবারে ঐ মড়ার গদির ওপর? জাত-জন্ম আর খুইও না বাপু। নাও—এখান থেকেই গড় কর, বাবার পাটের সামনে গড় করলেই হবে।"

ঠিক কি যে করতে হবে তা বুঝতে না পেরেই বোধ হয় তিনি অল্প একটু ঘোমটা সরিয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন। তিনি চাইলেন আমার মুখের দিকে আর সেই মুহূর্তে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাঁর চক্ষু দু'টির ওপর! শুধু চোখ দু'টিই দেখতে পেলাম আমি এবং তা-ই যথেষ্ট। যদি চোখের মত চোখ হয় তাহ'লে চোখ দু'টিই যথেষ্ট। অন্য কিছু দেখবার প্রয়োজনই করে না।

কিন্তু চোখ নিয়ে আদিখ্যেতা করার সময় নয় সেটা। বামুনদিদি খদ্দের এনেছেন। সুতরাং যেমনই চোখ হোক, চোখের মালিক কিন্তু খদ্দের। এ খদ্দের দাম দেবে, মাল কিনবে। দোকানদার যদি খদ্দেরের চোখ নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ে তাহ'লে তার কারবার চলে না।

তাড়াতাড়ি তাঁকে রেহাই দেবার জন্যে বলে উঠলাম—"হয়েছে, হয়েছে, যাও ওধারে বসো গিয়ে। বসে ঠাণ্ডা হওগে যাও।"

ঠাণ্ডা হবার জো কোথায় বামুনদিদি সঙ্গে থাকতে!

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হল—"হ্যাঁ, এবার একটু গঙ্গা নিয়ে এস গে তোমার ঘটিতে। এনে বেশ করে ছিটিয়ে দাও ওই ওধারটায়। আমার মাথা খেতে কিছু নামিও না যেন গঙ্গা না ছিটিয়ে। নরক, নরক, ছিষ্টিছাড়া পোড়ারমুখো জায়গায় এমন একটু ঠাঁই নেই যে পা রাখি। হাড়গোড় কঁ্যাথা-কানিতে সব 'খ্যাতোড়' হয়ে রয়েছে, জাত-জন্ম আর রইল না বাপু, কত পাপই যে করে এসেছিলুম মরতে—"

বলতে বলতে বামুনদিদি ডানদিকে খানিক এগিয়ে গিয়ে ডান হাতে কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে সেই থলে কাঁখে নিয়েই ডান ঠ্যাং দিয়ে খানিকটা জায়গা চাঁচতে লাগলেন। তিনিও ততক্ষণে গঙ্গার দিকে পা বাড়ালেন, বোধ হয় গঙ্গা নিয়ে আসতেই গেলেন।

চোখের আড়াল হ'তেই ডিঙি মেরে গলা উঁচিয়ে বামুনদিদি একবার দেখে নিলেন ঠিক নামছে কিনা গঙ্গায়। তারপর ছুটে এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে, দাঁড়িয়ে চোখ দুটিকে অবিশ্রান্ত ঘোরাতে ঘোরাতে ফ্যাস-ফ্যাস করে জানালেন খদ্দেরের পরিচয়।

"পাঁচুন্দির শীলেদের ঘরের ভাগনী। ছুঁড়ীর হাতে ট্যাকা আছে বাপু। একটু খেলিয়ে তুলতে পারলে ভাল হাতে দেবে-থোবে। বড় ঘরের বড় ব্যাপার,—দেখো—যেন আগে থাকতে ঝুলি ঝেড়ে ভালমানুষ সেজে বোস না। যা দিনকাল পড়েছে।"

ব'লে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার তিন লাফে গিয়ে ঠ্যাং চালাতে লাগলেন।

শ্মশান-ভস্ম উড়তে লাগল বামুনদিদির ঠ্যাং চালাবার চোটে। উড়ে এসে ঢুকতে লাগল আমার চোখে-মুখে। তা থেকে বাঁচবার জন্মে চাদরখানা মুখের ওপর টেনে দিলাম।

মুখ ঢাকা পড়লেও কিন্তু মন ঢাকা পড়ল না। মনের মুখে ছাই লাগে না। মনের চোখে পর্দা নেই। সেই বেপর্দা মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম দুটি চক্ষু। চক্ষু দুটিতে অস্বাভাবিক লম্বা পল্লব। আর সেই পল্লব-ঘেরা চোখের মাঝে যেন ডুব দিয়ে রয়েছে কত কথা—কত কাহিনী। নিমেষের জন্মে সে চোখের সঙ্গে আমার চোখ মিলেছিল। নিমেষের মধ্যে সেই চোখ দু'টি স্পষ্ট বললে যেন—

কি বললে?

আমাকে কি বলতে চায় সেই চক্ষু দু'টি? কি শোনাতে এসেছে আমায়?

যা শোনাতে চায়, তা' ত আমার জানা। দাম নেবে তার বদলে এমন কিছু পাবে আমার কাছে, যা দিয়ে মূল্য শোধ করবে নিজের নিয়তির। ক্ষণিকের দুর্বলতার সুযোগে যে নিয়তি মস্ত বড় পাওনাদার সেজে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার দেনা শোধ করবার জন্মেই ত ওরা আসে আমার কাছে। এ ত' অতি সাদাসিধে কারবার। কিন্তু কই? আজ পর্যন্ত বামুনদিদি যত খদ্দের এনেছেন তাদের কারোও চোখে কখনও দেখিনি ও-জাতের দৃষ্টি। নির্লজ্জ লালসায় লালায়িত কসাইয়ের চোখের নির্বিকার নিষ্ঠুরতা যেন ছোবলাতে এসেছে সে-সব চোখ থেকে। সে-সব চোখ যেন চিৎকার করে বলতে চেয়েছে—দাম দিয়ে মাল কিনতে এসেছি—সুতরাং খাতির কিসের? কিন্তু এ চোখ দু'টি যেন অন্য সুরে কথা বললে। বললে—দিতেই এসেছি, দিতে পেলে বাঁচি। নিতে আসিনি কিছুই। কাজেই ভয় নেই আমার কাছে।

তাঁর কাছে ভয় না থাকলেও বামুনদিদির রসনাকে ভয় করে না এমন কেউ আছে নাকি জগতে! বামুনদিদির আবির্ভাবে শ্মশানের হাড়গোড় শেয়াল-শকুনগুলোও তটস্থ হয়ে ওঠে। শুম্ভ না নিশুম্ভ কে যেন গিয়ে পড়ল বামুন-দিদির পা দিয়ে ঝাঁটানো পবিত্র এলাকায়। রৈ রৈ করে উঠলেন তিনি।

"দূর, দূর—দূর হয়ে যা চুলো-মুখোরা। মরতে আবার এধারে আসা হচ্ছে কেন? নাথি মেরে মুখ ভেঙে দেবো একেবারে।"

তাড়াতাড়ি মুখের ওপর থেকে চাদর নামিয়ে চেয়ে দেখলাম, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে একটা কুকুর। ওধারে যারা তিনটে চিতার পাশে কাজে ব্যস্ত ছিল তারা খোঁচা-খুঁচি থামিয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে বামুনদিদির দিকে। ইতিমধ্যে গঙ্গা এসে পৌঁছে গেলেন। সেই সুরেই বামুনদিদি হুকুমজারি করলেন—"নাও গো নাও, এবার বেশ ক'রে গঙ্গাটুকু ছিটিয়ে দাও এই ঠাঁইটুকুতে। জাত-জন্ম আর রইল না মা—পাঁচ আবাগীর জন্যে। এই জন্যেই বলে—ভাল করতে যেতে নেই মানুষের। পাঁচ আবাগীর পাল্লায় পড়েই এই হাড়ী-ডোমের হাল হয় আমার। থাকতেও পারিনে মানুষের চোখের জল দেখে, তাই এই নরকে মরতে এসতে হয়।"

বলতে বলতে তাঁর নজর প'ড়ে গেল আমার দিকে। পড়লেন আমায় নিয়ে।

"আর ঐ মুখপোড়া মড়া চড়ে বসে আছে মড়ার কাঁথার পাঁজা সাজিয়ে! মরতে আর ঠাঁই মেলে না ওর। যত বলি, কেন রে বাপু, ভূ-ভারতে কি আর মরবার জায়গা জুটবে না নাকি? এই ত পড়ে রয়েছে কাটোয়ার কালীবাড়ী। সেখানে ব'সে থাকলে কি ভাত জুটত না? চলুক ত দেখি আমার সঙ্গে সেখানে। দেশসুদ্ধ সব মড়াকে এনে যদি জমা না করতে পারি ওর পায়ের তলায় ত আমি দেশো ঘোষালের বেটীই নই।"

ব'লে দেশো ঘোষালের বেটী নামালেন তাঁর মোট গঙ্গা-ছিটানো জায়গায়। নামিয়ে তৎক্ষণাৎ খুলতে বসলেন থলের মুখের বাঁধন। তাঁর নিজের মুখের বাঁধন খোলাই রয়েছে, কাজেই তা থেকে অনর্গল ছিটকে বেরোতে লাগল বচনসুধা।

"খ্যাংরা মারি নিজের কপালে মা, খ্যাংরা মারি সেই বিধাতা পুরুষের কপালে, যে আমায় গড়েছিল। রাজার তুল্য বাপ-ভাই সব খেয়ে এই বয়সে এখন লোকের খ্যাজমৎ খেটে মরছি। নয়ত আজ আমার অভাব কিসের? পোড়ারমুখো যমের মুখেও খ্যাংরা মারি, এত লোককে মনে পড়ে আর আমায় ভুলে বসে আছেন চোখ্‌খেকো যমে!"

বলতে বলতে থলের মুখ খুলে বার ক'রে ফেললেন তাঁর ঘটি আর তেলের

শিশি। সে দু'টো দু'হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে পড়ল যে কিছু পবিত্র কাঠ প্রয়োজন। বামুনদিদির চায়ের নেশা আছে। জল গরম করতে গেলে কাঠ চাই। অথচ শ্মশানময় যত কাঠ পড়ে আছে তা তিনি ছোঁবেনও না। এ সমস্ত মড়াপোড়া কাঠ বাঁশে তাঁর জল গরম হতে পারে না। কাজেই চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে হাঁক ছাড়লেন—"ও বাবা হরিপাল, ওরে ও হরিবংশ, বলি গেলি কোন্ চুলোয় রে?"

এক বোঝা কাঠ কাঁধে নিয়ে রামহরি আসছিল। কাঁধে কাঠ নিয়েই জবাব দিলে, "হেই—বামুনদিদি লয় গো! এস গো দিদি ঠাকরুণ। দাঁড়াও—আসছি কাঠ-বোঝা লামিয়ে।

ফোকলা মুখে এক গাল হেসে বামুনদিদি বললেন—"এস ভাই এস। কাঠ নামিয়েই এস। আমি ততক্ষণ একটা ডুব দিয়ে আসি। তা' ভাই দু'খানা সরু কাঠের ফালি আর পাকাটিও এনে দিস তোর ঘর থেকে। ক'রে মরেছি মুখপোড়া নেশাটা। ডুব দিয়ে এসে একটু গরম জল মুখে না দিলে আবার মাথা ধরবে।"

সামনে দু'পা এগিয়েই আবার ফিরে দাঁড়ালেন দিদি। এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল যে সঙ্গিনী তখনও একভাবে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে তাঁর পিত্তি জ্বলে উঠল।

"বলি, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি গো তুমি? ঢের হয়েছে, আর নজ্জা দেখাতে হবে না এখেনে। এখন কাপড়-চোপড় ধুয়ে তেল দাও মাথায়। আর নজর রেখো চারিদিকে, শেয়াল-কুকুর না এগোয় এদিকে। ডুবটা দিয়ে আসি আমি, তা'পর তুমি যেও।"

কয়েক পা গিয়ে আবার একবার পেছন ফিরে সাবধান করলেন—

"মুখের কাপড় তুলে একটু চোখ চেয়ে থেকো বাপু। আমি এই গেলুম আর এলুম বোলে—এর মধ্যেই যেন মাথা খেয়ে না যায় আমার কেউ।"

মড়ার কানি পোড়াকয়লা হাড়গোড় এসব বাঁচিয়ে লাফাতে লাফাতে দিদি নেমে গেলেন গঙ্গায় এবং তৎক্ষণাৎ "তিনি" ফিরে দাঁড়ালেন আমার দিকে। দাঁড়িয়ে তাঁর আঁচলের খুঁট মুখে তুলে দাঁত দিয়ে গিঁট খুলতে লাগলেন। সামান্য সময় লাগল গিঁট খুলতে, কি একটা ছোট্ট সাদা-মত বস্তু বার হল। সেটা নিয়ে ত্রস্তপদে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। তখন দেখলাম তাঁর মুখখানি। কাঁচা, একদম কাঁচা এ মুখ। এ মেয়ে মেয়েই আছে এখনও, নারী হয়ে উঠতে পারেনি।

নারীর কণ্ঠ নয়, মেয়ের কণ্ঠই কানে গেল আমার। এতটুকু জড়তা নেই,

সঙ্কোচ নেই, নেই ছিটে-ফোঁটা খাদের মিশ্রণ। দুঃখ-লজ্জা হা-হুতাশ মেশালে যে খাদের সৃষ্টি হয় তার এতটুকু ছোঁয়াচ নেই সে সুরে। তার বদলে যেন কানে গেল আমার, স্কুল-পালানো দুষ্টু মেয়ের গলার সুর।

"এই কাগজখানা প'ড়ে দেখুন তাড়াতাড়ি। রাঙা দিদি আমাকে আসতে বলেছেন আপনার কাছে।"

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"রাঙা দিদি! কে তোমার রাঙা দিদি?"

চট ক'রে একবার পেছন দিকে চেয়ে নিয়ে বললে, "বোষ্টমী দিদি। তিনি আমাকে বলেছেন আপনার কাছে আসলেই—"হঠাৎ চুপ করল। মুখখানিও নিচু হয়ে পড়ল। এক ঝলক রক্তও যেন ছুটে এল চোখে-মুখে।

বললাম—"আচ্ছা ভাই, পড়ব তোমার চিঠি। এখন যাও তুমি। খুব সাবধান—বড় ভয়ানক লোক উনি, যাঁর সঙ্গে এসেছ এখানে।"

মুখ তুলে বললে—"যখন যাব আপনার পায়ের ধুলো নোব কিন্তু। একটিবার নেমে দাঁড়াবেন।" বলে আর দাঁড়ালো না, কাক শকুন তাড়াতে ছুটল বামুনদিদির পোঁটলার ওপর থেকে।

চেষ্টা ক'রে কাগজখানির ভাঁজ খুলতে হল। গদির ওপর মেলে হাত দিয়ে চেপে যতটা সম্ভব সোজা করলুম কাগজখানি। পেন্সিলের লেখা, অপটু হাতের মেয়েলী টান। একটু একটু ক'রে পড়তে হ'ল। একবার দু'বার তিনবার পড়লাম আগাগোড়া। তারপর মুখ তুলে দেখলাম। বামুনদিদি তখনও ফেরেন নি, মেয়েটি এধারে পেছন ফিরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

চাপা-গলায় ডাক দিলাম—"সুবর্ণ!"

ঘুরে দাঁড়ালো। চেয়ে রইল আমার দিকে।

বললাম—"কিন্তু কে এই লোকটি—ঠিক চিনতে পারছি না ত!"

মুখ নিচু ক'রে সেও চাপা-গলায় জবাব দিলে—"ঐ যে আপনার কাছে আসে, দাঁত উঁচু—"

প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলাম—"কার কথা বলছ তুমি? খন্তা! আমাদের খন্তা ঘোষ?"

সঙ্গে সঙ্গে ঝট্ ক'রে মেয়েটি পেছন ফিরল। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলাম ওর পেছন দিকে। দূরে বামুনদিদির গলা শুনতে পেলাম। মা গঙ্গার বাপের শ্রাদ্ধ করতে করতে উঠে আসছেন।

"গড় করি এমন মা গঙ্গার খুরে। খুরে খুরে গড় করি মা তোমায়। কত পাপ করলে তবে লোকে গঙ্গা নাইতে আসে এখানে। যত বার ডুব দি, ততবার একটা ছাইভস্ম ভেসে উঠবেই মুখের কাছে। খ্যাংরা মারি এমন গঙ্গা নাওয়ার মাথায়।"

তাড়াতাড়ি কাগজখানা লুকিয়ে ফেলে একটা বোতল টেনে তুললাম গদির পাশ থেকে। গলায় একটু না ঢাললে মাথাটা ঠিক সাফ হচ্ছে না।

খন্তা ঘোষ!

ময়নাপাড়ার বড় ভাই, দাঁত-উঁচু লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে খন্তা ঘোষ! খন্তা ঘোষ উড়নচণ্ডে বেপরোয়া বাউণ্ডুলে বাউল। যার মাথায় তেল পড়ে না কখনও, তেল না পড়লেও যে-মাথার মধ্যে হাজারো রকম ফন্দি-ফিকির সদাসর্বদা কিলবিল করছে। ঝুঁকি যাতে নেই তেমন কাজে হাত দিতে যার ঝোঁক চাপে না কিছুতে। সেই খন্তার মাথার মধ্যে এ হেন একটি সুবর্ণ-পোকা ঘুরঘুর করছে—এ কি কস্মিনকালেও কল্পনা করতে পেরেছি!

কিন্তু এ ত কল্পনা নয়, এ হয়ত সত্যিও নয়। এ শুধু স্বপ্ন। উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন। উদ্ধারণপুরের জাত জালিকের আসমানী জালে ধরা পড়েছে খন্তা ঘোষের সুবর্ণ-মাছ। মানুষের মাথার খুলিতে ছেঁদা ক'রে তাতে মেয়েমানুষের বুকের একটি নরম হাড় পরিয়ে যে টাকু তৈরী হয়, সেই টাকুতে সুতো পাকায় উদ্ধারণপুরের স্বপন-জেলে। বিশ্রী জট পাকানো সে সুতোয়, মগজ থেকে সে সুতো বার হয়। খন্তা ঘোষের রুক্ষ মাথার মধ্যে যে মগজ আছে তা থেকে বার হয়েছে যে সুতো, সেই সুতোয় বোনা জালে বাঁধা পড়েছে এই সোনালী মাছটি।

কিন্তু থাকবে না, থাকতে পারে না, স্বপন-জেলের জলে বাঘা বোয়াল থেকে চুনো পুঁটি কিছুই আটকে থাকে না।

তাই খন্তা ঘোষ ছুটে বেড়ায়। ছুটে যায় আবার ছুটে আসে। থামতে পারে না কোথাও। খন্তা ঘোষের জীবনসঙ্গীতে সমের মাথায় তেহাই পড়ে না কখনও।

কিন্তু করব কি আমি? কি কাজের ভার দিয়েছে আমায় নিতাই? এই বিশ্রী জট আমি খুলব কেমন ক'রে?

কাগজখানা থেকে যেটুকু জানতে পেরেছি তার বেশী আরও একটু কিছু

জানবার জন্যে মুখ তুলে হাঁ করলাম। টপ্ ক'রে হাঁ বন্ধ করতে হ'ল। বামুন-দিদি সংসার পাতছেন। কানে গেল তার মন্ত্রপাঠ।

"নুড়ো জেলে দি' মানুষের নজরে। একেবারে চডুই পাখীর নজর গা! বলে—লোকের বেলায় সওয়া হাত গলা, নিজের বাপের ছরাদ্দে একটা পচা কলা। এই তোর হাতে উঠল না হারামজাদী! যার দৌলতে আজ ডগডগে সিঁদুর কপালে দিয়ে সতী সেজে সোয়ামীর পাশে শুচ্ছিস, তাকে পূজো দিতে গিয়ে এই তোর হাতে উঠল না বোনাই-ভাতারী! নুড়ো জেলে দিতে হয় এমন হাড়-হাবাতে নজরের মুখে। তা' আমার আর কি, যা পাঠিয়েছে আমার হাতে তাই ত আমি দিয়ে যাব। আমার আর কি, আমি ত ব'য়ে আনবার বাঁদী। গদির ওপর ব'সে ভালমানুষি ফলিয়ে একেবারে উজোড় করে দিয়ে বসলে এই রকম ত হবেই। গলা দিয়ে একবাব উল্‌লে মনুষের আর মনে থাকে নাকি কিছু? ব'লে—নেবার বেলা ছিনে জোঁক, দেবার বেলা পুত্রশোক!"

বলতে বলতে বামুনদিদি উঠে এলেন। কাছাকাছি এসে আমার গদির ওপর ছুঁড়ে মারলেন একটা পুঁটলি। এতটুকু একখানি নতুন গামছায় বাঁধা কয়েক মুঠো চাল আর বোধ হয় দু'টো আলু-কচুও আছে ওর মধ্যে। গদির এক হাত সামনে ন্যাকড়া-জড়ানো একটা বোতল টিপ ক'রে নামিয়ে দিয়ে গজরাতেই লাগলেন তিনি।

"এই নাও ভাই, তোমার পূজো নাও। যা তোমার পোড়া কপালে আছে তাই ত পাবে। আমি মাথা খুঁড়ে ম'লে হবে কি, তোমার কপালের দুঃখ খণ্ডাবে কে? ওমা, মানুষ নিয়ে আসি আমি, তা আমার সঙ্গে দু'টো শলা-পরামর্শ করার ফুরসৎ হয় না তোমার। উনুন-মুখীদের চোখে জল দেখেই তুমি ম'জে যাও, আর হাত তুলে খপ ক'রে যাকে যা খুশি দিয়ে হাত ধুয়ে ব'সে থাক। এখন এই ধর—দু'বছর হাঁটাহাটি ক'রে ঐ আদায় করেছি। পাঁচ সিকে বেঁধে দিয়েছে ঐ টেনাখানার খুঁটে। আর এই তোমার বোতল। সেই বোনাই এখন ভাতার হয়েছে, কোল জোড়া ছেলে, এখন তুমিই বা কে—আমিই বা কে?"

ভয়ে ভয়ে একান্ত কুণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করলাম—"এ আবার কে দিদি, মনে পড়ছে না ত!"

দিদি একেবারে দু'হাত ঘুরিয়ে নৃত্য জুড়ে দিলেন—"মনে তোমার পড়বে কেন ভাই? মনটি কি তোমার আছে এখেনে? সে পদাথটুকু ত চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছে সেই ঢলানী। সাত দোর যে মজিয়ে বেড়ায় তার রাঙা পায়ে

মনটি "সমপ্পণ" ক'রে ত তুমি ফতুর হয়ে বসে আছ। যাও না যাও, একবার দেখে এস গিয়ে মালিপাড়ার জমিদার বাড়ীতে। তোমার মন-কেড়ে-নেওয়া সেই সাধের বোষ্টমীর রূপে এখন মালিপাড়া ঝলসে যাচ্ছে যে। মা ম'ল! মায়ের 'ছরাদ্দ'টা চোকবারও তর সইল না। অমনি সেঁধুলো গিয়ে সেখেনে। আর সেই মুসকো মিন্‌ষে বোষ্টমটা, সেটা প'ড়ে প'ড়ে লাথি খাচ্ছে বাবুদের দরজার বাইরে। তুমিও যাও না কেন, গিয়ে মাথা খুঁড়ে মর গে বাবুদের দরোয়ানের ছিচরণে। শুধু সেই সোনার পিতিমে ছাড়া আর কার কথা কবে মনে পড়েছে তোমার? এই যে আমি মরি তোমার জন্যে, আমার কথাটাই বা কবার মনে পড়ে তোমার ভাই? সেবার কত বুঝিয়ে পড়িয়ে সেই হারাণীকে আনলুম। বড় বোন মরতে বোনায়ের ঘরে গেল ভাত-জল দিতে। ভাত-জল দিতে দিতে একেবারে তিন মাসের ছেলে পেটে নিয়ে ফিরল। বোনাই নাথি মেরে খেদিয়ে দিলে। তখন এই দেশো ঘোষালের বেটী ছাড়া আর গতি নেই। তা আমি আনলাম এক কথা বোলে, উনি দিলেন উল্‌টো মন্তর। দিলেন এক মাদুলী ছুঁড়ীর হাতে বেঁধে বিনি পয়সায়। সোহাগ দেখিয়ে আশীর্বাদ করা হল আবার —সোয়ামী পুত্তুর নিয়ে সুখী হও গে মা। সুখীই হয়েছে, সুখের পাঁচ-পা দেখেছে একেবারে। সেই বোনাই এসে সিঁদুর পরিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলেছে। সেই ব্যাটাই এখন কোল-জোড়া হয়ে বেঁচে রয়েছে। আমে দুধে মিশে গেছে, আঁটিটা আঁস্তাকুঁড়ে প'ড়ে ককাচ্ছে।"

হঠাৎ ওধারে নজর গিয়ে পড়ল বামুনদিদির। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে উঠলেন—"হুস, হুস, দুর, দুর, ঝেঁটা মার মুখপোড়াদের মুখে।" ছুটে গিয়ে পড়লেন তাঁর পোঁটলার কাছে। দু'টো কাক চক্রাকারে উড়তে লাগল তাঁর মাথার ওপর।

চুপি চুপি নেমে গেলাম গদির পেছন দিয়ে।

আকন্দ ঝোপের আড়াল দিয়ে ঘুরে গঙ্গায় গিয়ে নামলাম। কৈ? কোথায় গেল সে?

এক গলা জলে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে দু'হাত জোড় ক'রে সুবর্ণ প্রণাম করছে। চোখবোজা মুখখানির দিকে চেয়ে খন্তার মুখখানাও চোখের ওপর ভেসে উঠল। সেই দাঁত-বারকরা শ্রীহীন মুখে, সেই বেপরোয়া বেহায়া চোখ দু'টোর মধ্যে যে কি রহস্য লুকিয়ে থাকে এতদিন পরে তার হদিস পেলাম। উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন,

খস্তার চোখে উদ্ধারণপুরের স্বপ্ন। এতকাল পরে সেই স্বপ্ন সশরীরে এসে দাঁড়িয়েছে উদ্ধারণপুর ঘাটের একগলা জলে। নিতাই পাঠিয়েছে একে আমার কাছে। এখনও তাহ'লে নিতাই বিশ্বাস করে যে আমার মধ্যে মানুষ একটা বেঁচে আছে, যে মানুষ মানুষের সুখে-দুঃখে-বেদনায়-দুর্বলতায় জেগে উঠতে পারে। বড় বেশী বিশ্বাস ক'রে ফেলেছে আমাকে নিতাই, এত ঠকেও তার বিশ্বাস-করা রোগটা গেল না।

আরও খানিক জলে গিয়ে সামনে থেকে ডাক দিলাম—"সুবর্ণ ?"

চোখ চেয়ে হকচকিয়ে গেল।

বললাম—"মন দিয়ে শোন। ওষুধ তোমায় খাইয়ে দোব আমি। বিশ্বাস ক'রে চোখ বুজে হাঁ করবে। কিছুই হবে না তোমার। এক মাস অন্তত আমায় সময় দাও। খস্তা যাবে তোমার কাছে। গিয়ে তোমায় নিয়ে আসবে। তোমাদের বিয়েতে আমি মন্ত্র পড়াব। তারপর তোমাদের বাড়ী হ'লে এক কোণায় একখানা ঘর তুলে দিও আমায়। সেই ঘরে গিয়ে আস্তানা গাড়ব। শেষ দিন ক'টা কাটাব তোমাদের কাছে।"

চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল মেয়েটার। ঠোঁট দু'খানি কাঁপতে লাগল থর থর করে। বার বার জোড় হাত কপালে ঠেকাতে লাগল।

বললাম—"উঠে যাও এবার।" ব'লে এক ডুবে অনেকটা পার হ'য়ে গেলাম। বলা যায় না—বামুনদিদির শ্যেনদৃষ্টি পড়ছে কিনা আমার ওপর কোনও ঝোপের আড়াল থেকে।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

ঘাটের কালো মাটি ধুয়ে নিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। কালো মাটি আর কালো কয়লা, এই দিয়ে উদ্ধারণপুরের শ্মশান তৈরী। কত যুগ ধরে কালো এসে জমা হচ্ছে এখানে। সে কালোয় কিছু ফলে না। যা ফেলা যায়—তাই যায় জ্বলে। বীজ জ্বলে গেলে অঙ্কুরিত হবে কি ?

নিতাই পাঠিয়েছে এ বীজ। স্থির বিশ্বাসে পাঠিয়েছে যে আমি পারব। পারব এ বীজ অঙ্কুরিত করতে। তাই আজ গঙ্গায় নামলাম। কত কাল ! কত যুগ-যুগান্ত পরে আজ শীতল হবার জন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি গঙ্গায় !

কলুষনাশিনী মা গঙ্গা। সকলের সব জ্বালা জুড়িয়ে শীতল ক'রে দেন। আমার জ্বালাও নিশ্চয়ই জুড়িয়ে যাবে। না জুড়োলে যা ছোঁব এ হাত দিয়ে

তাই যে জলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে। এই জলন্ত স্পর্শ নিয়ে কি ক'রে হাত দোব আমি কোনও কিছুতে? তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছি গঙ্গায়।

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল যে গঙ্গাজলে তর্পণ করলে দেবলোক পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন হয়। আচ্ছা—জ্যান্ত মানুষের হয় না? ইহলোকের কাউকে তুষ্ট করতে হ'লে তিন আঁজলা গঙ্গাজল দিলে হয় না?

হোক না হোক, দিতে দোষ কি? দিয়েই দেখি!

এক গলা জলে দাঁড়িয়ে তিন আঁজলা জল দিলাম। মনে মনে বললাম—"তুমি তৃপ্ত হও। সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাক তোমার। যেখানে থাক শান্তি পাও। যে ভার দিয়েছ তুমি আমায়—তার মর্যাদা আমি রাখবই প্রাণপণে। তুমি তৃপ্ত হও।"

উদ্ধারণপুরের কল্পনা।

শ্রীমতী কল্পনা দেবী উদ্ধারণপুর শ্মশানের চিতা-লক্ষ্মী। আদর্শ গৃহলক্ষ্মীদের মত শ্মশানলক্ষ্মীও মশগুল হয়ে থাকেন নিজের শ্মশান-সংসার নিয়ে। অভাব অনটন বলতে কোনও কিছু নেই তাঁর গোছানো সংসারে। ভাঙা হাঁড়ি কলসী আর ছেঁড়া চট কাঁথা মাদুরে তাঁর সোনার সংসার বোঝাই। নেই যা তাঁর—তা হচ্ছে একটু শান্তি, এক ছিটে স্বস্তির হাওয়া পেলে তিনি নিশ্বাস নিয়ে বাঁচেন। কিন্তু উপায় নেই, কালশত্রু বাসা বেঁধেছে তাঁর হৃৎপিণ্ডে, রাজযক্ষ্মায় ধরেছে বেচারাকে। শঙ্কা আর সন্দেহ—এই দুই মারাত্মক জীবাণুতে ঝাঁজরা করে দিচ্ছে তাঁর ফুসফুসটা, কুরে কুরে খাচ্ছে তাঁর কলিজাখানা। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে তাঁর, কালো রক্ত। হিংসার বিষাক্ত পুঁজ মেশানো বলেই অত কালো রক্ত উঠছে তাঁর মুখ দিয়ে।

উদ্ধারণপুরের কল্পনা।

কল্পনা শ্মশান-বধূ—উদ্ধারণপুর থেকে উদ্ধার হবার পথ খোঁজে। পথ খোঁজে আর কাঁদে। কাঁদে আর মাথা খোঁড়ে। বৃথা প্রতীক্ষায় বসে বসে দিন গণে। উদ্ধারণপুর ঘাট থেকে উদ্ধার হবার পথ খুঁজে পায় না।

কিন্তু উদ্ধারণপুর ঘাটের দিন হল ওস্তাদ জাদুকর। তার ওস্তাদি চালের মারপ্যাঁচে কল্পনা-বউ কান্না ভুলে যায়। মনে থাকে না তার বুকের জ্বালা-যন্ত্রণা। চোখে-মুখে হাসি ফুটিয়ে সাজে-গোজে, পোকায় খাওয়া বুকে জোর ক'রে শ্বাস নিয়ে আবার ঘর-গৃহস্থালীতে মন দেয়, সাদা হাড় আর পোড়া কয়লার সংসারে নিজেকে রাজরাজেশ্বরী জ্ঞান ক'রে নিজের মনের পর্দায় রঙের পর রঙ্ চড়ায়।

উদ্ধারণপুরের কল্পনা।

কল্পনা জানে পথ চেয়ে থাকতে। পথ চেয়ে থাকে আর ধুঁকে মরে। ধুঁকতে ধুঁকতে আরও ধোঁকায় পড়ে যায় হতভাগী। পোড়া কাঠ আর পোড়া হাড়ের পোড়া প্রবঞ্চনায় আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। শেষে একদিন খুব ভোরে সব জ্বালা পোড়ার অবসান হয়ে যায়। সন্দেহ আর সংশয়ের দংশন-জ্বালা আর থাকে না, থাকে না নিজেকে নিজে ধোঁকা দেবার কুৎসিত হ্যাংলাপনার প্রয়োজন। তার বদলে এ রোগের যা অনিবার্য উপসর্গ, তাই এসে দেখা দেয়। বিকট হাঁ করে একেবারে গিলে খেতে আসে কল্পনাসুন্দরীকে। রাগ এবং ঘৃণা এই

দুটি নতুন উপসর্গ জুটে—কল্পনার ভাঙা শরীর ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে দেয়।

ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় উদ্ধারণপুর ঘাটের নির্বিকার নির্মমতা। পোড়া কাঠ আর কালো কয়লা, সাদা হাড় আর ঘোলা গঙ্গার জল, সবাই একদিন খুব ভোরে সচকিত হয়ে ওঠে। দোলা লাগে স্বপন-জেলের বুকে আর কল্পনা-বধূর মাথার মধ্যে। কান পেতে স্থির হ'য়ে শুনতে থাকে সকলে—

"দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।
তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গিয়ে আর পেলাম না॥"

'গুব-গুবা-গুব' ক্রমেই এগিয়ে আসে।

কিন্তু খঞ্জনী কই? 'রিন্‌-টিনি-টিন্‌' উত্তর দিচ্ছে না ত 'গুব্-গুবা-গুব'এর সঙ্গে! এ কি রকম সঙ্গীত? যেন লবণহীন বিস্বাদ ব্যাঞ্জন, একটু মুখে দিলেই গা বমি বমি করে! উকি উঠে উগরে দিতে চায়।

তবু কান পেতে থাকি, তখনও সামান্য এতটুকু ক্ষীণ আশা, নিজেকে নিজে প্রবোধদানের নির্লজ্জ বেহায়াপনা। কানে আসে—

"সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ঘুরিতেছি পাগল হয়ে,
মরমে জ্বলছে আগুন আর নিভে না।
ওগো তারে আমার আমার মনে করি,
সে যে আমার হয়ে আর হোল না॥"

দুর, দুর, দুর হয়ে যা আপদ। লজ্জা করে না আবার এখানে তোর ঐ কালা মুখ দেখাতে? মরমে আগুন জেলে "গুব্-গুবা-গুব্" বাজিয়ে ন্যাকাপনার গান গেয়ে বেড়ানো হচ্ছে। অমন মরমের আগুনের মুখে ছাই তুলে দিতে হয়। কেন—আগুন নেই নাকি উদ্ধারণপুরের ঘাটের কোনও চুলোয়? যা না, চ'ড়ে বস্ না গিয়ে তোর "গুব্-গুবা-গুব্" সুদ্ধ একটা জলন্ত চিতার উপর। একেবারে খতম হয়ে যাক তোর ঐ পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ানো? অক্ষমের ঠুঁটো হাত বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ ধরতে যাওয়ার ধাষ্টামো ছাই হয়ে যাক—উদ্ধারণপুরের অনির্বাণ আগুনে।

"দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।
তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গিয়ে আর পেলাম না॥"

এসে পড়েছে। নিমগাছটা পেরিয়ে এলেই দেখা যাবে তাকে। শুধু তাকে, সেই কষ্টি পাথরে কোঁদানো মোষের মত নিরেট পিণ্ডটাকে। দরকার নেই দেখবার, এতটুকু প্রয়োজন নেই আমার, তার ঐ কুৎসিত লেংচানো নাচ-দর্শনের। ইচ্ছে করে, এক হেঁচকায় ঐ 'গুব্-গুবা-গুব'টা কেড়ে নিয়ে ওর ওই চূড়ো-বাঁধা মাথার ওপরেই আছড়ে ভাঙতে।

এসে পড়ল। চোখ বুজে লেংচাতে লাগল হেলে দুলে ঠিক আমার চোখের সামনে। আর সহ্য হ'ল না, আমিও চোখ বুজে ফেললাম।

কিন্তু কান দুটো ত আর বোজা যায় না। কাজেই বিষ ঢালতে লাগল আমার এক জোড়া খোলা কানে।

"পথিক কয় ভেব না রে ডুবে যাও রূপ-সাগরে
ডুবিলে পাবে তারে আর ভেব না ;
ওগো এবার ধরতে পেলে মনের মানুষ, ছেড়ে যেতে আর দিও না ॥"

কি বললে!

বলছে কি ও ?

"ওগো এবার ধরতে পেলে মনের মানুষ, ছেড়ে যেতে আর দিও না ॥"

আর রুখতে পারলাম না নিজেকে। চোখ বুজে বসে থাকার সাধ্য হ'ল না আর। অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বার হ'ল একটা প্রচণ্ড চিৎকার।

"চরণদাস বাবাজী !"

"গুব-কটাং" ক'রে একটা উদ্ভট রকমের আওয়াজ হল। ছিঁড়ে গেল "গুব্-গুবা-গুব্"এর তারটা। তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হল চরণদাসের চরণ। বোকার মত চেয়ে রইল সে আমার মুখের দিকে।

আগুনের হলকার মত এক ঝলক শব্দ বার হ'ল আমার মুখ থেকে।

"কোথায় সে ? কোথায় রেখে এলে তাকে ?"

খুব হালকাভাবে, যেন বেশ একটা মজার খবর শোনাচ্ছে, সেইভাবে অতি প্রশান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে বাবাজী।

"চলে গেছে গোসাঁই।"

কঠিনতর কণ্ঠে প্রায় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায় ?"

"জানিনে ত গোসাঁই, বাবুর কাছে খোঁজ করবার চেষ্টা করলাম। দরোয়ানেরা গেট পার হতে দিলে না।"

দম বন্ধ হয়ে আসবার যোগাড় আমার তখন। তবু অন্তিম চেষ্টায় মুখ দিয়ে বার করলাম—"কে সে? কোন্ বাবু?"

হেসে ফেললে চরণদাস। পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললে বাবাজী—"ঐ যে সেই বাঘ! সেই যে সেদিন শুনলে না—গেয়েছিলাম—

ও বাঘের চোখে হলে দেখা
নিশ্চয়ই মরণ লেখা গো—"

প্রচণ্ড ধমক দিলাম একটা—"চুপ, থামাও তোমার ন্যাকাপনার গান, আমি শুনতে চাই, কি ক'রে আবার দেখা হ'ল তোমাদের সেই লোকটার সঙ্গে? কোথায় দেখা হ'ল? কবে দেখা হ'ল? সব বলতে হবে তোমায় এখনই।"

উল্‌টো প্রশ্ন ক'রে বসল বাবাজী অতি করুণ কণ্ঠে—"ব'লে আমার কি লাভ হবে গোসাঁই? শুনেই বা তোমার এমন কি লাভ হবে এখন?"

ওর ওই মালা-তিলকের মোলায়েম নির্লিপ্ততা সহ্যের সীমা পার হয়ে গেল। হন্যে কুকুরের মত ছিটকে পড়লাম গদির ওপর থেকে। দু'হাতে চেপে ধরলাম ওর গলা।

প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিতে দিতে দাঁত কড়মড় ক'রে বললাম—"বল্, বল্ শিগ্‌গির, বলতেই হবে তোকে সব কথা—বল্—বল্—"

চোখ দু'টো ঠেলে বেরিয়ে আসবার যোগাড় হল বাবাজীর। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত, বাদ্য-যন্ত্রটা আছড়ে পড়ল তার হাত থেকে, দু'হাত দিয়ে বাবাজী ধরলে আমার দুই কব্জি। সঙ্গে সঙ্গে মড়মড় ক'রে উঠল আমার কব্জির হাড়, খ'সে এল আমার হাত দু'খানা ওর গলা থেকে। হয়ত একটা আর্ত্তনাদও ক'রে উঠলাম আমি।

হাঁপাতে হাঁপাতে খুব মিনতি ক'রে বললে চরণদাস—"যাও গোসাঁই, বস গিয়ে তোমার ঐ মড়ার গদির ওপর চেপে। বলছি—বলছি আমি তোমায় সব কথা। আমার গলা টিপে ধরলে কি লাভ হবে বল এখন! এ গলা দিয়ে বহুবার আমি তোমায় সাবধান করেছিলাম, তখন কেন তোলনি আমার কথা কানে?"

ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের কব্জিখানা ডলতে ডলতে বেদনা-বিকৃত গলায় বললাম—"কি বলেছিলি? বলেছিলি কি আমায় তখন?"

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে চরণদাস—"বলি নি তোমায়? পায়ে ধরে সাধি

নি তোমায় আমাদের সঙ্গে যেতে? ঐ মড়ার গদির মায়া কিছুতে কাটাতে পারলে না গোসাঁই, কিছুতে টললে না তখন। আজ তোমার মাথায় খুন চাপল। কি লাভ হবে এখন আমায় খুন করলে বা নিজে খুন হ'লে?"

মাথা নিচু ক'রে ফিরে গিয়ে বসলাম আমার গদির ওপর। মড়ার বিছানার মরা মর্যাদার মাথা হেঁট হয়ে গেল। মুখ তুলে চাইবার উপায় নেই আর। পায়ে ক'রে বাদ্য-যন্ত্রটা একধারে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে এল চরণদাস। গদি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রায় ফিসফিস ক'রে বলতে লাগল—

"সে গেছে, তার জন্যে আমায় দায়ী করছ কেন গোসাঁই? আমার সঙ্গে কি এমন সম্বন্ধ ছিল তার যে তাকে বাধা দোব? কি এমন সম্পদ আছে আমার, যা দিয়ে তাকে বেঁধে রাখব? সেই রাত্রে, যখন জানতে পারলাম দারোগা ছিনিয়ে নিতে আসছে ওকে, তখন আমিই গঙ্গার ভেতর দাঁড়িয়ে কচি ছেলের কান্না কেঁদেছিলাম। আমাদের মধ্যে ষড় ছিল, ঐ কান্না শুনলে বুঝতে হবে যে বিপদ একটা কিছু ঘটতে চলেছে। তখন পালাতে হবে। পালালাম তাকে নিয়ে। পথে বললে আমাকে মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার-বাবুর কথা। তিনিই নাকি একমাত্র বাঁচাতে পারেন তোমায়। নিতাই ধারণা করেছিল যে আমাদের না পেয়ে দারোগা তোমার ওপর অত্যাচার চালাবে। তখন আমারও মাথাটা ঘুলিয়ে উঠল। তোমাকে বাঁচাবার জন্যে ছুটলাম তাকে নিয়ে মুকুন্দপুর মালিপাড়ায়। ভোর নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম। নিতাই সোজা গিয়ে ঢুকল অন্দরমহলে। সেই যে ঢুকল আর বার হল না। মাথা খুঁড়লাম নায়েব গোমস্তা দরোয়ানের পায়ে, একটিবার তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। অন্তত একটিবার বাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে পায়ে ধরলাম সকলের। ঘা-কতক দিয়ে তারা আমায় রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেল। তখন বসে রইলাম বাবুর বাড়ীর সামনে। দিনের পর দিন কেটে গেল। কত গানই যে গাইলাম, কত ডাকই যে দিলাম, কিন্তু অন্দরমহল বড় সাংঘাতিক স্থান গোসাঁই। অনেকগুলো দরজার ওপারে তখন নিতাই, আমার ডাক পৌঁছবে কি ক'রে সেখানে?"

বলতে বলতে মাথাটা নুয়ে পড়ল চরণদাসের, ওর ছুঁচলো থুত্‌নি নামতে নামতে প্রায় ঠেকে গেল ওর বুকের সঙ্গে। বাবাজীর সারা শরীরটাই কেমন যেন শিথিল হয়ে গেল! কাঁধ দুটো অনেকটা ঝুলে পড়ল দু'ধারে। যণ্ডামার্ক চরণদাস বাবাজী, যার মুঠির সামান্য চাপে আমার কব্জি দু'খানা মড়মড়িয়ে ভেঙে

যাবার যোগাড় হয়েছিল, সে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ননীর পুতুলের মত নমনীয় হয়ে উঠল।

হঠাৎ আমার মনে হল—স্পষ্ট যেন দেখতে পেলাম চরণদাস কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওর ভেতরের রুদ্ধ একটা ভয়ঙ্কর কিছু যেন ফেটে বার হবার জন্যে চরম চেষ্টা করছে। চিতার ধোঁয়া লাগা আমার পোড়া চোখেও যেন ধরা প'ড়ে গেল —নিরুদ্ধ বেদনার সাকার রূপটা। ঘৃণা নয়, দ্বেষ নয়, প্রতিশোধ-স্পৃহা নয়, এমন কি নিষ্ফল অভিযোগ বা মাথা কোটাকুটিও নয়, এ শুধু একটা বোবা যন্ত্রণা-ভোগ। একটা বাসনাহীন নির্জলা হিতকামনা। যাকে ও ভালবাসে, তার জন্যে একটা আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠা। ও জিনিস এত খেলো জাতের নয় যে ওর অন্য কোনও রকম বহিঃপ্রকাশ সম্ভব। যার ভেতব জন্মায় ও-বস্তু, তাকেই শুধু নিঃশব্দে পুড়িয়ে মারে, অন্য কেউ টেরই পায় না।

আমিও টের পেলাম না, স্পষ্ট ক'রে পারলাম না অনুভব করতে, কিসের জ্বালায় জ্বলে মরছে ও। তবু আমার ভেতরটাও কেমন যেন মুচড়ে উঠল। আরো ভালো ক'রে চিরে চিরে ওকে বিচার করবার ফুরসতও পেলাম না। যেন আমায় ঠেলে নামিয়ে দিলে গদির ওপর থেকে। নেমে দু'হাতে জাপটে ধরলাম ওকে বুকের সঙ্গে। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম—"চরণদাস, আমায় ক্ষমা কর ভাই।" আর কিছু বারই হল না আমার গলা দিয়ে। দু'হাতে ওকে বুকের সঙ্গে কষে আঁকড়ে ধরে ওরই কাঁধের ওপর মুখ রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল।

উদ্ধারণপুর ঘাটের অনেকগুলো কাঠ নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

অনেকগুলো হাড়, অনেকটা মাংস মিশে অনেকটা ছাই জমে গেল শ্মশানে। সেই ছাই উড়ে গেল অনেকটা উদ্ধারণপুরের বাতাসের সঙ্গে। উড়ে চলে গেল কোথায়, কতদূরে, তাই বা কে বলতে পারে!

হয়ত সেই ছাই খানিকটা লুকিয়ে ঢুকে পড়ল বাতাসের সঙ্গে মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুরের সুরক্ষিত অন্দর মহলের মধ্যে।

হয়ত সেই ছাই খানিকটা ঢুকল গিয়ে এই মুহূর্তে কুমার বাহাদুরের নাকে-মুখে-চোখে।

হয়ত তাতে ছন্দপতন হল তাঁর প্রেম-গুঞ্জনের।

হয়ত সেই ছাই ঢুকল গিয়ে নিতাইয়ের কানের মধ্যে, তাতে সব চেয়ে মধু আর সব থেকে প্রিয় ডাকটি আর তার শোনা হল না।

হয়ত উদ্ধারণপুরের ছাই খানিকটা লাগল গিয়ে নিতাইয়ের গালে। আর তাতে মুখ রগড়াতে গিয়ে কুমার বাহাদুর মড়া পোড়ার গন্ধ পেয়ে সজোরে দু'হাতে নিতাইকে দূরে ঠেলে দিলেন।

কতক্ষণ পার হয়ে গেল তার খেয়ালও রইল না।

আমার খোলা বুকটা ভিজে গেল ঈষদুষ্ণ জলে। বাবাজী চরণদাসের বুকের জ্বালা তপ্ত জলের রূপ ধরে উপ্‌চে পড়তে লাগল আমার হিম-শীতল বুকের ওপর। তাতেও কি নরম হল উদ্ধারণপুরের পোড়া মাটির তৈরী পোড় খাওয়া কালো বুকটা আমার! না, বরং আরও রুক্ষ, আরও ঠাণ্ডা, আরও নির্মম হয়ে উঠল আমার বুকের ভেতরটা। অন্য কোনও চিন্তা-ভাবনা নেই তখন সেখানে, এমন কি নিতাইকেও বেমালুম ভুলে গেলাম। শুধু একটা তীব্র অপমান-বোধ, একটা নির্জলা প্রতিশোধ-স্পৃহা দুমদুম করে ঘা দিতে লাগল আমার বুকটার মধ্যে।

অবশেষে ওর কাঁধের ওপর থেকে মুখ তুললাম। তারপর ছেড়ে দিলাম ওকে। চরণদাস চোখ-মুখ মুছে সলজ্জ কণ্ঠে বললে—"তামাক আছে গোসাঁই ? থাকে ত একটু দাও। আজ কতদিন কলকে ধরি নি হাতে।"

ফিরে গিয়ে উলটে পালটে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম গদির তলায়। নাঃ, কোথাও ছিটে-ফোঁটা তামাক নেই। ও পাট উঠে গেছে একদম, ওরা চলে যাবার পর থেকে। যেটুকু তামাক পড়ে তা লোককে বিলিয়ে বেটে দি। ধারণাও ত ছিল না আমার যে বাবাজী আবার ফিরবে একদিন! ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম, রাগও হল ভয়ানক নিজের ওপর। রাগের ঝোঁকে নিচু হয়ে ঝুঁকে প'ড়ে তছনছ ক'রে ফেললাম গদিটা।

চরণদাসও বেশ লজ্জিত হল তামাক চেয়ে। বললে—"থাক, থাক, আর কষ্ট করতে হবে না তোমায় গোসাঁই। ও জিনিস বোধ হয় আর কপালে জুটবে না আমার। না জোটাই উচিত, বেশ ত আছি, নেশা বলতে আর কিছুই রইল না আমার জীবনে।"

টপ করে ঘুরে দাঁড়ালাম। বললাম—বেশ মিনতি ক'রে বললাম—"গোল্লায় যাক তোমার শুকনো জটা পুড়িয়ে টানা। খাবে বাবাজী ? টানবে এক বোতল ? দেখবে টেনে—কেমন জ্বলতে জ্বলতে নামে বুকের ভেতর দিয়ে ? কি হবে ঐ

কলকে টেনে? কি আরাম পাও ও-থেকে? কতটুকু জ্বালা করে ও জিনিস টানলে? এস, গল গল করে গলায় ঢেলে দাও এক বোতল। দেখ, কি চমৎকার জ্বালা লুকিয়ে আছে এই বোতলের ভেতর! এ বিষ একবার গলা দিয়ে গললে অন্য যে কোনও বিষের জ্বালা জুড়িয়ে শীতল হয়ে যাবে। এস—এই নাও, ধর—" গদির পাশ থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে।

তীরবেগে ছুটে এল একজন। এসে আছড়ে পড়ল আমার পায়ের ওপর। দু'টো পা জড়িয়ে ধরে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

কি বলছে তাও ঠিক বুঝলাম না। লোকটা কে তাও ঠাওর করতে পারলাম না সেই মুহূর্তে। চরণদাস নিচু হয়ে এক হেঁচকায় লোকটাকে তুলে খাড়া ক'রে দিলে। দিয়ে তার হাতে সজোরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলে—"কিরে, হয়েছে কি? অমন করে মরছিস কেন? কি হয়েছে বল না ভাল ক'রে?"

পঙ্কেশ্বর ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—"পালাও গোসাঁই, শিগ্‌গির পালাও এখান থেকে। ওরা এসতেছে, এসে পড়েছে ঐ বাজার-তলা পর্যন্ত। তোমায় খুন করবে ওরা, খুন করবে বলে দা-সড়কি নিয়ে ছুটে আসছে ওরা সকলে।"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কারা তারা! কারা ছুটে আসছে আমায় খুন করতে রে?"

দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে চরণদাস বললে—"সে যারাই হোক গে যাক্, দরকার নেই সে কথা শুনে। পঙ্কা, একখানা পাকা লাঠি দিতে পারিস আমায়, কিংবা একটা দু'হাত লম্বা রামদা? থাকে ত বার কর শিগ্‌গির, হাঁ করে চেয়ে থাকিস পরে।"

প্রায় কেঁদে ফেলে পঙ্কা ডোম—"ঐ যে গো বাবাজী,—ঐ ত রয়েছে আমার বুনুয়ের হাতের ঠ্যাঙাখানা গোসাঁয়ের চালে গোঁজা। কিন্তু একলা তুমি রুকতে পারবে কি গো সেই এক গুষ্টি বাগদী লেঠেলদের? ওরা একেবারে ক্ষেপে এসতেছে। হায় হায় রে, আজ আবার আমাদের মানুষ একজনও নেই গো এপারে। সব ওপারে গেছে শুয়োর বিঁধতে।" কপাল চাপড়াতে লাগল পঙ্কা।

ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল পঙ্কার কাঁপুনি দেখে। হো হো ক'রে হেসে উঠলাম। বললাম—"মর বেটা, কাঁপছিস কেন অত? মদ ভাঙ্ খেয়েছিস নাকি ঠেলে? কাদের ঘাড়ে ভূত চেপেছে যে এই দিনদুপুরে খুন করতে আসছে আমায়? নেশা ক'রে বেটার মাথা-কাতা ঘুলিয়ে গেছে—"

"চুপ, মুখ বন্ধ কর গোসাঁই।" একটা প্রচণ্ড ধমক দিলে আমায় চরণদাস। ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, ইতিমধ্যেই কোমর বাঁধা হয়ে গেছে তার। হাতের বুকের মাংসের গুলিগুলো ঠেলে উঠেছে। ওর সদা-প্রসন্ন চোখ দু'টোয় ফুটে উঠেছে ও কিসের আলো? এবার সত্যিই একটু ঘাবড়ে গেলাম ওর চোখের দিকে চেয়ে।

ঝাঁ ক'রে এক হেঁচকায় আমার হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নিলে বাবাজী। নিয়ে গলগল ক'রে ঢালতে লাগল গলায়। অর্ধেকের বেশিটা এক নিঃশ্বাসে সাবাড় করে ফেললে। বাকীটুকু পঙ্কার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে—"নে, লাগা চুমুক। ওস্তাদের নাম নিয়ে দাঁড়া গিয়ে আমার পাঁচ হাত পেছনে একখানা ঠ্যাঙা হাতে ক'রে। ডোমের বাচ্চা ন'স তুই? বাঁশ তোদের দেবতা নয়? বাঁশ হাতে থাকতে ডরাবি তুই? তার চেয়ে ডুবে মর গিয়ে ঐ গঙ্গায়।"

পঙ্কাও তখন তৈরী হ'ল। মালটুকু গলায় ঢেলে একখানা বাঁশ তুলে নিলে আমার বেড়া থেকে। বাবাজী দু'হাতের চেটো ঘষে নিলে মাটিতে—। নিয়ে সেই ধুলো-মাখা হাত দিয়ে আমার দু'পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। তারপর তুলে নিলে নিজের পায়ের কাছ থেকে লাঠিখানা। ঝাড়া সাড়ে চার হাত লম্বা চিতার ধোঁয়া খাওয়ানো রামহরে ডোমের হাতের পাকা বংশদণ্ড। কখন যে ওখানা বাবাজী নামিয়ে নিয়েছে আমার চাল থেকে তাও জানতে পারি নি।

খুব নরম সুরেই আর একবার জিজ্ঞাসা করলাম বাবাজীকে—"কিন্তু এত তোড়জোড় কিসের জন্যে তাও ত জানতে পারলাম না চরণদাস, মানে সবটাই একটা—"

আঙুল তুলে বাবাজী হুকুম দিলে—"চুপ, একটিও কথা নয়,—সোজা উঠে যাও তোমার গদির ওপর, সোজা—"

তার কথা শেষ হবার আগেই রে রে রে রে ধ্বনি উঠল বড় সড়কের ওপর। সে আওয়াজ মেলাবার আগেই দু'তিন হাত আকাশের দিকে ছিটকে উঠল চরণ-দাস। তারপর যেন হাওয়ায় ভেসেই উঠে চলে গেল নিম গাছটার দিকে। শুধু তার শেষ কথাটা কানে গেল আমার—"চলে আয় পঙ্কা!"

মুহূর্তের মধ্যে ঠক্-ঠকা-ঠক্-ঠক্ আওয়াজ ভেসে এল ওধার থেকে। সে শব্দ ছাপিয়ে হাহাকার ধ্বনি উঠল উদ্ধারণপুরের আকাশ বাতাস তোলপাড় ক'রে। তার সঙ্গে বড় সড়কের ওপর থেকে বহু নারী-কণ্ঠের তুমুল চিৎকার মিলে এমন একটা বীভৎস রসের সৃষ্টি করলে যা শুনে সাদা হাড়গুলোও শিউরে উঠল।

ঝপ্ করে এক সঙ্গে সব আওয়াজ গেল থেমে। হঠাৎ যেন মা ধরিত্রী গ্রাস করে ফেললে সকলকে।

আবার শোনা গেল বাবাজীর গলা ঠিক তিন মুহূর্ত পরে।

"কৈ, এগো, এগিয়ে আয় না কে বাপের বেটা আছিস। ধর লাঠি হাতে,—তোল মাথা, তোল—"

আবার রৈ রৈ ক'রে উঠল এক সঙ্গে বহু নারীকণ্ঠ। তার মধ্যে একটা গলা খুব চেনা মনে হল। হাঁ, ঐ ত রামহরির বউ কথা বলছে, মানে আমাদের সীতের মা। সীতের মা হুকুম দিচ্ছে—"লে, লিয়ে চল সব কটা বাগ্‌দীকে ঝেঁটিয়ে বাবার সামনে। কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাক বাবা মাথাগুলো ওদের।"

তার হুকুম দেওয়া শেষ হতে না হতেই হুড়মুড় করে নামতে লাগল মেয়েরা। ডোমপাড়ার সবাই আর ময়না পাড়ার ওরা সকলে। প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু রয়েছে। লাঠি ঝাঁটা বঁটি দা কাটারি যে যা পেয়েছে নিয়ে এসেছে। সব চেয়ে বেশী যা রয়েছে তা হচ্ছে ঝাঁটা। বড় সড়কের ওপর থেকে ওদের দৌড়ে নামতে দেখলাম। তারপর আর দেখতে পেলাম না। নিমগাছের আড়ালে আবার আরম্ভ হল নানা রকমের আওয়াজ। সাঁই সাঁই ঝাঁটা চালাবার শব্দের সঙ্গে আবার উঠল বিকট চিৎকার আর তার সঙ্গে অকথ্য গালিগালাজ। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখতে পেলাম সকলকে। মস্ত একটা দল এগিয়ে আসছে এদিকে। মেয়েরাই ঘিরে নিয়ে আসছে ওদের।

এবার শোনা গেল আর একটা গলা। খুবই চেনা চেনা লাগল গলাটা। নিদারুণ কষ্টে গোঙাচ্ছে যেন কে। কাকুতি মিনতি করছে—"আমায় তোমরা এবার ক্ষ্যামা দাও গো ভাল মানুষের বেটীরা। বুড়ো মনিষ্যিটাকে আর মেরে ফেলুনি বাপু।"

অনেকগুলো নারীকণ্ঠ এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—"লাগা খেংরা বুড়ো মড়ার মুয়ে।" পড়লও বোধ হয় দু' এক ঘা সঙ্গে সঙ্গে, সাঁই সাঁই করে শব্দ উঠল, তার সঙ্গে কুকুরের মত কাঁই কাঁই করে কেঁদে উঠল কে।

সমস্ত দলটা হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ল আমার গদির সামনে।

এক সঙ্গে নারী-পুরুষ বহু লোক। এক সঙ্গে সবাই কথা বলতে চায়। আমি তখন দু' চোখ দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজছি একজনকে। বাবাজী চরণদাস বৈরাগীকে খুঁজছি আমি তখন। কোথায় গেল? গেল কোথায় সে? হঠাৎ

যেন বজ্রাঘাত পড়ল। বাজখাঁই গলায় কে দাবড়ি দিলে একটা : "কি রে, ব্যাপার কি ? এখেনে রথ উঠলো নাকি রে বাবা ! এত ভিড় কেন ?"

খন্তা ঘোষ। সকলের চেয়ে মাথায় উঁচু খন্তা ঘোষের মাথাটা দেখা গেল সবার পেছনে।

সবাই চুপ একেবারে। দলটাকে ডান দিক দিয়ে ঘুরে খন্তা এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। আবার সেই রকম বিকট গর্জন দিলে একটা—"কি গোসাঁই, হয়েছে কি এদের ? ক' ব্যাটার মাথায় মুখে রক্ত দেখলুম যেন। হল কি হারামজাদাদের ?"

যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হল চরণদাস খন্তা ঘোষের সামনে। তার কপাল থেকেও গড়িয়ে নামছে রক্ত। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই বাবাজীর। দাঁত বার করে বললে—"একটু অঙ্গ সেবন ক'রে দিলাম দাদা আমার বাগ্‌দী ভায়াদের। ওনারা দল বেঁধে লাঠি ঘাড়ে নিয়ে ছুটে এসেছিলেন গোসাঁইকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে।"

দারুণ বিস্ময়ে যেন ফেটে যাচ্ছে খন্তার চোখ। সব ক'খানা দাঁত তার হিংস্র জন্তুর মত বেরিয়ে পড়ল মুখের ভেতর থেকে। সামনের দলটার দিকে তাকিয়ে প্রায় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে থেমে থেমে—"ঠাণ্ডা করতে এসেছিল গোসাঁইকে। এ্যাঁ—গোসাঁইকে ঠাণ্ডা করবে ওরা ? কেন ? কি করলে গোসাঁই ? কে পাঠিয়েছে ওদের ?"

পঙ্কেশ্বর হাউমাউ করে বললে—"খুড়ো, ঐ শালা আম মোড়ল লেলিয়ে দিয়েছে ওদের। ঐ হাড়ে হারামজাদা খুন করাতে চেয়েছিল গোসাঁইকে। ঐ যে ঐ, ওধারে মড়ার মত চিত হয়ে পড়ে রয়েছে ভিটকিলিমি ক'রে।"

দু'তিন জনকে ডিঙিয়ে কয়েকজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সামনে এগিয়ে গেল খন্তা। সেখান থেকে ধপাস করে একটা আওয়াজ হল। কাঁউ কাঁউ করে কেঁদে উঠল মোড়ল। খন্তা খিঁচিয়ে উঠল—"এই চুপ কর বলছি বুড়ো ভাম। ন্যাকামি ক'রে কাঁদবি যদি ত ফের এক লাথি লাগাব মুখে। উঠে আয় সামনে। ওঠ্—"

"ওগো—আমি গতর লাড়তে পারবুনি গো বাবা, আর আমায় লেথিও না গো বাবা।" ডুকরে কেঁদে উঠল এবার মোড়ল।

আর সহ্য হল না। বুকে যত জোর ছিল তা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—"থামা, থামা এখন তোর শাসন খন্তা। আর পারি নে সইতে সকলের ধাষ্টামো। এই, এই শুয়োরের বাচ্চারা, ধরে তুলে আন না মানুষটাকে। যদি নামতে হয় আমাকে

গদি থেকে, তাহ'লে জ্যান্ত চিবিয়ে খাব সব কটার মাথা। যা বলছি, উঠিয়ে আন মোড়লকে।"

বাগদীরা নড়েচড়ে উঠল। ওদের মধ্যে চারজন গিয়ে বয়ে নিয়ে এল মোড়লকে। এনে শুইয়ে দিলে আমার সামনে।

মোড়ল চক্ষু বুজেই পড়ে রইল। এতটুকু নড়াচড়া পর্যন্ত নেই তার। যেন সত্যিই লোকটা ম'রে কাঠ হয়ে গেছে।

আন্নু বাগ্‌দী মুরুব্বী মানুষ। ওর ছেলে হলা বাগ্‌দী বহুবার এসেছে গেছে উদ্ধারণপুর শ্মশানে। বাপ-বেটা দু'জনকেই চিনি ভাল ক'রে। আন্নুর কপালে লেগেছে চোট, রক্ত গড়াচ্ছে। হলার একখানা হাত বোধ হয় ভেঙেছে। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতখানা বুকের কাছে তুলে ধ'রে আছে সে। আন্নু আর হলা মাথা নিচু করে বসে ছিল অন্য সকলের থেকে একটু তফাতে। আন্নুকেই ডাক দিলাম।

"মুরুব্বী, উঠে এস না গো। এক টেরে বসে রইলে কেন? এস, একটু পেসাদ নাও মায়ের। তারপর শুনি তোমার কাছ থেকে, কি ক'রে বাধল এত-বড় হুজ্জতটা।"

বাগ্‌দী আগে তার যৎসামান্য কাপড়ের খুঁটটা তুলে গলায় দিলে। তারপর উঠে এসে গড় হল আমার সামনে।

তখন ডাক দিলাম হলধর মানে হলা বাগ্‌দীকে।

"বলি—হ্যাঁরে শালা হলা, ব'সে রইলি কেন তফাতে? শালা যেন আমার ঘরের মাগ, মাথা নুইয়ে আছে। উঠে আয় শালা পেঁচি মাতাল, আগে গেল্ দু'-ঢোক, মুখ খুলুক। দু'ঢোক গলা দিয়ে না গললে শালার নজ্জা ঘুচবে না।" বলে একটা খুব জবর গোছের রসিকতার হাসি হাসলাম।

অনেকটা হালকা হল থমথমে ভাবটা। মেয়েদের মধ্যে উসখুস ক'রে উঠল কয়েকজন। হলধর উঠে এল সামনে, এসে হঠাৎ মাটির ওপর বসে পড়ল হাঁটুতে মুখ গুঁজে। তারপর ভেউ ভেউ ক'রে কান্না।

খন্তা এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখ পিটপিট করে দেখছিল আর পৌনে আধখানা সিগ্‌রেটে টান দিচ্ছিল। তার দিকে চেয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম—"দাঁড়িয়ে দেখছিস কি খন্তা? আনা, আনা শিগ্‌গির মাল দু'বোতল। আন্নু এসেছে—এসেছে ওদের সমাজ সুদ্ধ প্রায় সকলেই। আগে সকলের গলা ভিজুক। এ ত আর ওরা মড়া নিয়ে আসে নি যে ওদের খরচ দিতে হবে। খরচ দিতে হবে এখন

আমায়। কারণ আমার দোষ অপরাধের বিচার করতে এসেছে ওরা। গোসাঁই হই আর যাই হই, দোষ অপরাধের বিচার হবে না কেন? সমাজ মানব না কেন? পঞ্চায়েতের পাঁচ জনে যা বিচার করে দেবে, কেন তা মাথা পেতে নোব না? নিশ্চয়ই নিতে হবে, দশের কাছে যদি দণ্ড নিতে না পারি ত দশে আমার কথা মানবে কেন? কি বল মুরুব্বী?"

হুম ক'রে আন্নুকেই রায় দিতে বলে বসলাম।

তখন দাঁড়িয়ে উঠল আন্নু। গলায় তুলে দিয়েছিল যে খুঁটটা সেটা আবার নামিয়ে কোমরে জড়িয়ে ফেললে। কোমর বেঁধে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে আরম্ভ করলে বক্তৃতা। প্রথমে নাম নিলে গুরুর, তারপর গুরুর গুরুর 'ছিচরণে' গড় করে গঙ্গা আর শ্মশানকালীকে সেবা দিলে। দিয়ে নাক-কান মলে তিন সত্যি ক'রে নিলে। অর্থাৎ সে যা বলবে দশের সামনে, তার একটি কথাও মিথ্যে নয়। মিথ্যে যদি হয় তাহ'লে ঐ তার একমাত্র ছেলে বসে রয়েছে, ঐ ছেলেই রইল মা কালীর কাছে জামিন।

তারপর সে গড়গড় করে ব'লে গেল এক সুবৃহৎ কাহিনী। আমঅতন মোড়লদের পাশের গ্রামে ওরা থাকে, ওদের কেউ ম'লে ওরা গাঁয়ের ধারেই পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু মোড়ল মাঝে-মধ্যে এসে ওদের মড়া ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে নিজের খরচায় গঙ্গায় দিয়ে যায়। বিশেষতঃ সোমত্ত বয়সের ঝি-বউ ম'লে মোড়ল বলে যে তাকে গঙ্গায় দেওয়াই বিধি। নয়ত অপদেবতা হয়ে গাঁয়ে-ঘরে অত্যাচার করবে। সোমত্ত বয়সে মরেছে কিনা, সোমত্ত মানুষের নাকি টানটা সহজে যায় না নিজের আত্মীয়স্বজনের ওপর থেকে।

সে-বার—মানে এই ক'দিন আগে—নোটন বাগ্দীর ডবকা মেয়েটা ক'দিন ভুগে ম'ল। মোড়ল একরকম জোর ক'রে তাকে কেড়ে নিয়ে এল গঙ্গায় দিতে। নোটন বেচারা একটা আধলাও দিতে পারলে না। ওর জামাই, যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়েছিল এই সামনের পোষ-মাঘে, সে ছোকরা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। তাকেও সঙ্গে আসতে দিলে না মোড়ল। ভয় দেখালে, বললে সঙ্গে গেলে শ্মশান থেকে ছুঁড়ি আবার ফিরে যাবে তার কাঁধে চেপে। পরে যে কাউকে বিয়ে ক'রে ঘর সংসার করবে তারও জো থাকবে না।

নোটনের মেয়েকে গঙ্গায় দিয়ে যাবার ক'দিন পরেই পঞ্চা ডোম গিয়ে হাজির হল ওদের গ্রামে। গিয়ে তার পাশার ছক পেতে একেবারে জাঁকিয়ে বসল সেখানে। বাগ্দীর ছেলে-ছোকরারা দু'দিনেই পঞ্চার ভক্ত হয়ে উঠল।

হঠাৎ ঘটে গেল একটা দুর্ঘটনা। নেড়া বাগ্দীর বোনটাকে কিসে কামড়াল 'রেতের বেলায়'। সকালেই বোনটা দুটো খাবি খেয়ে চক্ষু কপালে তুললে। জুটল গিয়ে মোড়ল এবং যথাবিহিত ছোঁ মেরে মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে ভাইপো আমজীবন সহ গঙ্গার দিকে রওয়ানা হল।

এবং তৎক্ষণাৎ পঙ্কেশ্বর তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের জুটিয়ে নিয়ে দূর থেকে ছায়ার মত অনুসরণ করল ওদের।

আনু হল মুরুব্বী গাঁয়ের। এক রকম ওর পায়ে ধরে পঙ্কা ওকে টেনে নিয়ে এল সঙ্গে।

প্রথম দিন রাতেই ঘটল ঘটনা।

অন্ধকার রাত, নবাবী সড়কের ওপিঠে একটা 'কাঁদোড়ের' ধারে ওরা থামল 'সন্দে-কালে'। পঙ্কা আর হলা লুকিয়ে গিয়ে বসে রইল একটা গাছের ওপর। ঠিক রইল যে তিনবার কাল পেঁচার ডাক ডাকলেই সবাই ছুটে গিয়ে পড়বে সেখেনে।

আগ্ রাতটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। সবাই প'ড়ে ঘুমুচ্ছে মাঠের মধ্যে। শুধু জেগে আছে মুরুব্বী—আনু বাগ্দী নিজে। হঠাৎ তার চমক ভাঙল, স্পষ্ট শুনতে পেলে তিনবার কাল পেঁচার ডাক। চুপি চুপি ঠেলা দিয়ে তুললে সে সবাইকে। নিঃশব্দে রওয়ানা হল সকলে সেই গাছতলায় যেখানে মোড়লেরা বিশ্রাম নিচ্ছিল।

অন্ধকারে বাগ্দীদের চোখ জ্বলে, অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা দেখলে—

কি দেখলে তা আর বলতে পারলে না আনু। ঝট ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধাঁ করে একটা লাথি মেরে দিলে অতন মোড়লের মাথায়।

আবার রৈ রৈ করে উঠল সকলে। তার মধ্যে মোড়লের ক্ষীণ আর্তনাদ মিলিয়ে গেল। দৌড়ে এসে সপাসপ কয়েক ঘা ঝাঁটার-বাড়ি লাগালে সীতের মা।

ময়না পাড়ার দু'চারজনও ঝাঁটা উঁচিয়ে ছুটে এল।

হুঙ্কার ছাড়লে একটা খন্তা ঘোষ।

"এই চুপ কর সবাই, নয়ত ছিঁড়ে দোব সবায়ের মুখ জুতিয়ে!"

সাক্ষাৎ খন্তার হুকুম। সুতরাং আবার সকলে চুপ করলে।

ফাঁক পেয়ে তখন জিজ্ঞাসা করলাম আন্নুকেই—

"কিন্তু মুরুব্বী, আমি এর মধ্যে দোষ করলাম কোথায়? আমাকে শাস্তি দিতে তোমরা তেড়ে এলে কেন? আমার অপরাধটা কোথায় তাই বল? দশের সামনে আমার বিচারটা হয়ে যাক।"

আন্নু কিছু বলবার আগেই দাঁড়িয়ে উঠল হলা। ছুটে এসে আছড়ে পড়ল আমার গদির ওপর। প'ড়ে আমার দু'হাঁটু জড়িয়ে ধ'রে কোলের ওপর মুখ রগড়াতে লাগল।

একদম স্তব্ধ হয়ে আছে সকলে। আমিও চুপ ক'রে বসে হাত বুলোতে লাগলাম হলধরের মাথায়।

পঙ্কেশ্বর আন্নু বাগ্‌দীর সামনে এসে দাঁড়াল। বাগ্‌দীর হাতখানা ধরে বললে—"বল মামা বল—কি বলেছিল ঐ বুড়ো মড়াটা, যা শুনে তোমরা ক্ষেপে গেলে। হুঁশ হারিয়ে একেবারে ছুটে এলে গোসাঁইকে খুন করতে।" আন্নু মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। একটু শব্দ বার হল না তার গলা দিয়ে।

আমার কোলের ওপর তখনও হলধরের মাথাটা। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম—"থাক, আর ব'লে কাজ নেই কারও। আমার সেঙাত হলাই শোনাবে সে কথা। সেঙাতের মুখ থেকে শোন সকলে—"

ছিটকে উঠল হলধর। আঙুল বাড়িয়ে মোড়লকে দেখিয়ে বললে—"ঐ শালা, ঐ শয়তানের বাচ্চা, ঘা কতক দিতে ঐ শয়তানের বাচ্চা তোমার নাম করলে গোসাঁই। তুমি নাকি ওকে শিখিয়েছ ওই খেলা। তুমিই নাকি ওর গুরু। ঐ শয়তান আমাদের মাথায় খুন চাপিয়ে দিলে, ঐ শয়তান—" বলতে বলতে ছুটে গিয়ে থুঃ ক'রে এক ধ্যাবড়া থুতু দিলে মোড়লের মুখে। ধন্তা ঘোষ আর একবার চিৎকার ক'রে উঠল—

"ব্যাস, ব্যাস, যেতে দাও এবার। এই পঙ্কা, এই লে টাকা, লিয়ে আয় এক টিন মাল। মাথা ঠাণ্ডা কর সবাই। আর নয়, এবার হাস, গাও, নাচ। সবই সেই বোম-ভোলা বাবার খেলা। জয় বাবা শ্মশান-ভৈরব।"

শ্মশান-ভৈরবের নামে সমবেত কণ্ঠে তিনবার জয়ধ্বনি পড়ল।

উদ্ধারণপুরের বাস্তব।

বাস্তব—বেহেড বাতিকগ্রস্তদের বিচক্ষণ বাদশাহ্। বিদ্যা-বুদ্ধি বিচার-বিশ্বাস এই সব বখেড়া তাঁর কাছে বিকল মনের বিচিত্র বিকার ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাদশাহ্ বেতাল বেরসিক, বখামি বটকেরা বজ্জাতি বিন্দুমাত্র বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। তাঁর বজ্রমুষ্টির বর্বর বিমর্দনে বিশ্বপিতার বাহাত্তুরে বিধানের দম বন্ধ হয়ে আসে। তাঁর বিক্রমে বহুমুখী ব্যসনের বেলেল্লা বেসাতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বাদশাহের বিলোল কটাক্ষের সামনে বিবসনা বিভীষিকা লজ্জাবতী লতার মত কোথায় মুখ লুকোবে তা ভেবে পায় না।

ন্যাংটা চণ্ডীর দেয়াসি আমঅতন ভেবে পায় না কোথায় লুকোবে তার বীভৎস মুখখানা। বাগদীরা যখন ফিরে গেল তখন তাদের সঙ্গেও গেল না মোড়ল। বললে—"আমায় আর 'দোগ্দো' নি বাবারা, গতর আমি লাড়তে পারবু নি।" আসল কথা—গ্রামে ফিরে গেলে মোড়লের স্বজাতি থেকে সুরু ক'রে বাগ্দী বোয়েরা পর্যন্ত কেউ যে তাকে রেহাই দেবে না, একথা মোড়ল জানত। কিন্তু শ্মশানেও তাকে রেহাই দেবে না রামহরের বউ। সবাই চলে গেল, রামহরের বউ গেল না। পা ছড়িয়ে সে বসল মোড়লের মুখের সামনে। ব'সে আরম্ভ করলে তাকে বচন-সুধা পান করাতে। শোধ সে তুলবেই, সুদে-আসলে সীতের মা উসুল করে ছাড়বে তার ইজ্জতের দাম। বুক নিঙড়ে অনেক দুধ নিয়েছে মোড়ল তামাক ভেজাতে। দুধও নিয়েছে, আরও অনেক কিছু নিয়েছে তার সঙ্গে লুকিয়ে চুরিয়ে। শুনুক এখন শুয়ে শুয়ে তার ফিরিস্তি।

শেষ পর্যন্ত রেহাই পেল মোড়ল। রামহরে ডোম মাছ ধরে ফিরে এসে উদ্ধার করলে মোড়লকে উদ্ধারণপুরের ঘাট থেকে। যে নৌকোয় মাছ ধরে ফিরল সেই নৌকোয় তুলে মোড়লকে ও-কূলে পাচার করে দিলে সে। এ-কূল প্রতিকূল হলেও ও-কূল তখনও অনুকূল মোড়লের কপাল জোরে। তাই মোড়ল কূল পেয়ে গেল।

কিন্তু যার এ-কূল ও-কূল দু'কূলই প্রতিকূল তার তরী ভিড়বে কোন্ কূলে?

সেই কথাই বলছে চরণদাস!

সব জুড়িয়ে গেলে গঙ্গায় স্নান করে এসে এক মুঠো গাঁদাপাতা কচলে ফাটা

কপালের ওপর বেঁধে আবার বাবাজী তার 'গুব্-গুবা-গুব'টা বাঁধলে। বেঁধে সুর ধরলে—

"ওরে ও প্রাণবন্ধু রে—
তোমার জন্যে জীবন করলাম ক্ষয়।
আর জ্বালা পোড়া প্রাণে কত সয়।
প্রাণবন্ধু রে—তোমার জন্যে জীবন করলাম ক্ষয়॥"

যতক্ষণ দিনের আলো ছিল ততক্ষণ চরণদাস পারেনি আমার মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে, আমি পারিনি বাবাজীর মুখের দিকে তাকাতে। কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না যে দু'হাতে আমি ওর গলা টিপে ধরেছিলাম এবং তার প্রতিদানে ও নিমেষের মধ্যে একলা ছুটে গেল এক গুষ্টি বাগ্দী লেঠেলের সামনে—আমাকে বাঁচাবার জন্যে! সেই সঙ্গে এ কথাও ভুলতে পারছিলাম না যে বাবাজী আমাকে দায়ী করেছে। আমিই নাকি দায়ী নিতাইয়ের জন্যে। মড়ার গদির মায়া ছেড়ে যদি আমি উঠে যেতাম ওদের সঙ্গে, তাহ'লে নাকি এ সর্বনাশটা ঠিক এমনভাবে ঘটতে পেত না এবং সবচেয়ে বড় রহস্য হচ্ছে যে আমি ওদের সঙ্গে গেলে, যেভাবে ঘটতে পারত তখন সর্বনাশটা, তাতে চরণদাসের একটুও আপত্তি ছিল না।

এটি কি?

চরণদাস তখন কেমন ক'রে সহ্য করত আমাকে?

অথবা বাবাজী কি এই মনে করে যে ভাগের কারবারে তার সঙ্গে আমি মনের সুখে ঠাট বজায় রেখে চলতাম!

ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল। আজ যখন দু' হাতে ওর গলা টিপে ধরে দম বন্ধ করে মারতে চেয়েছিলাম তখন নিশ্চয়ই চরণদাস বুঝেছে যে আমি উদ্ধারণপুরের বাস্তব বাদশাহের খাস তালুকের প্রজা। রক্ত-মাংস পুড়ে ছাই হয়ে গেলে পর যে হাড়গুলো পড়ে থাকে সেগুলোর মায়াও আমি ছাড়তে পারি না। সুতরাং কাঁচা রক্ত-মাংসের ওপর ভাগের কারবার অন্তত আমার সঙ্গে চলে না।

চলে না, এটুকু ভাল করে বুঝতে পারার ফলেই বাবাজী আর আমার চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছে না বোধ হয়।

কিন্তু বাবাজী তাকে ভালবাসে। শুধু ভালবাসার গরজে ভালবাসে তাকে। তাই সে আবার বসেছে তার বাদ্য-যন্ত্রটা বেঁধে নিয়ে।

গাইছে—

“তোমাকে ভালবাসি
এ জগতে হইলাম দোষী
পাড়ার লোকে কত মন্দ কয়।
বন্ধু রে—”

শুনলেও গা জ্বলে ওঠে।

পাড়ার লোকে কে কি বলেছে না বলেছে তাই নিয়েই ওঁর যত মাথাব্যথা। কিন্তু যাকে তুই ভালবাসিস সে যে তোর মুখে লাথি মেরে চলে গেল, তা নিয়ে তোর ছিঁচকাঁদুনি কাঁদতে লজ্জা করে না?

নুড়ো জ্বেলে দিতে হয় অমন প্রেমের মুখে।

আমি হ'লে—

কি করতাম আমি হ'লে? ওর মত যদি ভালবাসার ফাঁদে পড়ে যেতাম তাহ'লে? কি করতে পারি এখন আমি তার?

লাথি ত শুধু বাবাজীর মুখেই মারে নি নিতাই, আমার মুখেও ত ঠিক সমান জোরে সমান ওজনের লাথি সে মেরে গেছে একটা।

বরং বলা উচিত যে লাথিটা সে সটান আমার মুখের ওপরই তাক ক'রে ছুঁড়েছে। বাবাজী জানত, অনেককাল আগেই স্পষ্ট করে জানত যে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই প্রয়োজন ছিল নিতাইয়ের বাবাজীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরার। ছাই ফেলা হয়ে গেলে ভাঙা কুলোখানা আবার কেউ যত্ন ক'রে ঘরে তুলে রাখে না। ওটাকে ছায়ের সঙ্গে আঁস্তাকুড়ে বিসর্জন দেয়। দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। আমাকেও কি সেইভাবে বিসর্জন দিয়ে গেল নিতাই?

আঁস্তাকুড়ের আবর্জনার সামিল মনে করলে আমাকেও?

সোনার গয়না আর ঘর-বাড়ীই তার কাছে বড় হ'ল?

একটা সাধারণ লম্পট, যে তাকে দু'দিন পরে কুকুরের মত দূর দূর ক'রে খেদিয়ে দিয়ে আবার আর একটা কারও পেছনে জিব লকলক ক'রে ছুটতে থাকবে তার ওপরে কি ক'রে নির্ভর করতে পারলে নিতাই?

এ-হেন হীন প্রবৃত্তি কি ক'রে তার হ'ল?

কি লোভে সে গেল? কি পাবে সে তার কাছে? কি দিতে পারে সে নিতাইকে?

আমিই বা কি দিতে পারতাম তাকে?

মড়ার গদি, কাঁথা, লেপ-তোশকের স্তূপটা কি কাজে লাগত নিতাইয়ের? কিছু যদি দেবারই থাকত আমার, তাহ'লে বারবার তাকে ওভাবে বিদায় দিলাম কেন? মড়ার গদিতে গদিয়ান হয়ে মড়ার মর্যাদার গরমে বড় ছোট ক'রে দেখেছিলাম নিতাইকে। দেবার মতো কিছুই নেই আমার, কস্মিন্‌কালে ছিলও না কিছু। তবু যে কিসের গর্বে অন্ধ হয়ে বার বার অপমান করেছি ওকে!

উদ্ধারণপুরের বাস্তব।

বাদশাহ্ বাস্তব সামনে এসে দাঁড়ালেন—তাঁর চলন্ত চাবুকখানা হাতে নিয়ে। দাঁড়িয়ে তাঁর খাস বান্দার মুখের ওপর সাঁই সাঁই করে চালিয়ে দিলেন কয়েক ঘা। বললেন—"বেকুব—শুধু সাদা হাড় আর কালো কয়লার জলুস দেখিয়ে চোখ ঝলসে দিতে চেয়েছিলি তার—লজ্জা করে না তোর?"

লজ্জা নয়, ক'রে উঠল জ্বালা। সারা মুখখানা ফালা ফালা হয়ে চিরে গেল সেই চাবুকের ঘায়ে। এ-মুখ দেখাব আমি কার কাছে? কেমন ক'রে তুলব এ মুখখানা আমি দুনিয়ার সামনে? কোথায় লুকোব আমি আমার এই পোড়ার মুখখানা ত্রিজগতে?

বাবাজী চরণদাস আছে মহাশান্তিতে। সে যে কিছুই চায়নি তার কাছে। এতটুকু প্রতিদানের আশা না রেখেই সে শুধু দিতে চেয়েছে, একেবারে নিঃশেষে দিয়ে ফেলেছে নিজেকে! তাই তার মনে এতটুকু আক্ষেপ নেই। তাই সে চোখ বুজে প্রাণ দিয়ে গাইতে পারছে—

নিরালায় বসিয়া গো
আমার প্রাণ কাঁদে তাহারি লাগিয়া।
আমায় ঘুমের ঘোরে দেয় সে দেখা গো
তারে না দেখি জাগিয়া।
আমার প্রাণ কাঁদে তাহারি লাগিয়া॥"

আছে বেশ।

শুধু কেঁদেই ও তৃপ্ত।

আর করবেই বা কি? আছেই বা কি আর করবার?

কেঁদে যদি ওর চাওয়া-পাওয়ার চরম শান্তি হয় ত হোক, কার কি বলবার আছে ?

কিন্তু ওটুকু তৃপ্তিলাভও আমার কপালে নেই।

ওতে আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে।

সেদিনও লেগেছিল আঘাত আত্মমর্যাদার গায়ে। সেই জন্যেই আমার করা হয় নি আত্মসমর্পণ। অনবরত নিজেকে নিজে বুঝিয়েছি—ছিঃ, কেন যাচ্ছ ওর কাছে নিচু হ'তে ? থাকলেই বা ওর রূপ-যৌবন, তুমি কি কম নাকি কিছু ওর কাছে? তুমি উদ্ধারণপুরের সাঁইবাবা, দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ এসে তোমার পায়ে গড়াচ্ছে, তোমার প্রসাদলাভের আশায় কত মানুষে মাথা খুঁড়ে মরছে, মড়ার গদির ওপর চেপে ব'সে যে মোক্ষম ধাপ্পা দিতে পেরেছ তুমি মানুষকে, তার তুলনায় ঐ দুধে-আলতা রঙের রক্ত-মাংসের ডেলাটা হ'তে গেল বড় ? ছিঃ !

শুধু কি তাই ?

শুধু কি নিজেকে অনেক উঁচুতে তুলেছিলাম বলেই পারিনি সেদিন নিতাইয়ের ডাকে সাড়া দিতে ?

ওর সঙ্গে আরও কিছু ছিল না ?

ছিল এবং সেই কাঁটাটাই সব চেয়ে বড় হয়ে খচখচ করে উঠেছিল তখন। সেই কাঁটা ঐ চরণদাস, ঐ যে বুঁদ হয়ে বসে গাইছে—

"মন রে বুঝাইলাম কত—
হইলাম না তার মনের মত
না পাইলাম সে চিকন কালিয়া।"

কি যেন বললে বাবাজী ?

"মন রে বুঝাইলাম কত
হইলাম না তার মনের মত—"

হাঁ—ঐ আর একটি রোগ ! তার মনের মত হ'তে পারব ত ? এই ভয়েই মরেছি তখন কেঁপে। ঐ মারাত্মক রোগেই তখন পেয়ে বসেছিল আমায়।

নিজেকে বড় বলেও ভাবতাম, খাটো করেও ভাবতাম। অনবরত কে যেন ভেতর থেকে অতি চুপি চুপি বলত আমায় তখন—

বলত—"সাবধান—ও আগুন ছুঁতে যেও না। নিজের দিকে একবার

তাকিয়ে দেখ, কি আছে তোমার! কি দেবে ঐ জ্বলন্ত আগুনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার মুখে? কি দিয়ে ওই লেলিহান অগ্নিশিখার তৃপ্তিসাধন করবে তুমি?"

মানে—ভয়। একটা নির্জলা বোবা ভয়ে পেয়ে বসত আমায় নিতাইকে সামনে দেখলেই।

তাই অনেকগুলো মাহেন্দ্রক্ষণ পিছনে পালিয়ে গেছে।

এখন কপাল কুটে ম'লে কতটুকু ফললাভ হবে?

কিন্তু চরণদাসের লাভ-ক্ষতির পরোয়া নেই।

তার সকল জ্বালা জুড়োবার পথ খোলা আছে।

সে গাইল—

"সে যদি না আসে ফিরে—
ঝাঁপিব যমুনার নীরে—
সকল জ্বালা জুড়াইব—
এ ছার পরাণ দিয়া।
আমার প্রাণ কাঁদে তাহারি লাগিয়া॥"

সহজ পন্থা বটে, সহজ এবং সংক্ষিপ্ত।

কিন্তু ওর যে প্রাণ কাঁদে তার জন্যে। আমার তাও কাঁদে না। উদ্ধারণপুরের বাদশার গোলামের গোলাম আমি। অত সহজে কাঁদে না আমার প্রাণ। সাদা হাড় আর কালো কয়লা দেখতে দেখতে—আর ঝলসানো মাংসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে—কান্না-টান্নার মত তুচ্ছাতিতুচ্ছ রোগগুলো দূর হ'য়ে গেছে আমার ত্রিসীমানা ছেড়ে। লোকে আর যাই সহ্য করুক, সাঁইবাবার চোখে জল—এই কুৎসিত দৃশ্য কিছুতে সহ্য করতে পারবে না কেউ। আর তাতে যে আমি লজ্জাতেই ম'রে যাব। কোনও নদ-নদীর ধারে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার দরকারই যে হবে না আমার তখন।

উদ্ধারণপুরের বাস্তব।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর রূপের বর্ণনা।

"মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গং দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং।

ব্যাঘ্র চর্মাবৃত কটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং।
ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতং।
জটাভারলসচ্চন্দ্র খণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিব॥"

মনে মনে বললাম—হে সর্বদ্রষ্টা, তুমি ত জান যে নিজেকে নিজে ঠকাই নি আমি। তবু আজ জ্বলে মরছি কেন? কেন আমার শ্মশান-শয্যা আজ আমায় শান্তি দিতে পারছে না? কেন আজ বার বার মনে হচ্ছে যে হয়ত সত্যিই আমি দায়ী নিতাইয়ের ওভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলার জন্যে। কি করতে পারতাম আমি? এখনই বা কি করতে পারি আমি তার?

নেপথ্য থেকে হাঁক দিয়ে কে গাইলে—

"মানব-তরী মাল্লা রে ছয়জনা
ছয়জনা ছয়দিকে টানে কোনও কথা মানে না।"

সোজা হয়ে উঠে বসলাম।

খন্তা ঘোষ। খন্তা ঘোষ উদ্ধারণপুরের জ্যান্ত বাস্তব। ফিরে আসছে খন্তা। রাতে সে শ্মশানে নামে না। আজ নেমে আসছে, আসছে শুধু চরণদাসের জন্যে। চরণদাসের জন্যে—কাঁচা গাঁজা নিয়ে আসছে খন্তা। নয়ত বাবাজীর কষ্ট হবে যে সারা রাত।

আরও কাছে এসে গেল। শোনা গেল তার দরাজ গলা—

"মানব-তরী মাল্লা রে ছয়জনা
ছয়জনা ছয়দিকে টানে কোনও কথা মানে না।
এখন গুন ছাড়িয়া সব পলাইল
একা রইলাম পড়ি।
মন রে আমার—ডুবল মানব-তরী॥"

বাউণ্ডুলে বাউল খন্তা ঘোষ গাইতে লাগল—

"মন রে আমার
ডুবল মানব-তরী।
ভব সাগর পাকে 'পড়ে
মন রে আমার
ডুবল মানব-তরী॥

দয়াল গুরু বিনে—
কে আছে রে—
তুলে নেবে হাত ধরি ॥
মন রে আমার—
ডুবল মানব-তরী ॥"

গুব্-গুবা-গুব্ বগলে চেপে ধরে চরণদাস উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। তারেতে দুটো ঘা দিতেই খস্তা ঝপ্ করে থামিয়ে ফেললে গান। থামিয়েই হাসি—হি হি হা হা হো হো। হাসতে হাসতে খস্তা এসে থামল বাবাজীর সামনে।

চটে গেল বাবাজী—"এই, হাসছো যে বড় ?"

"হাসবো না ? ওরে বাপরে, হাসবো না ? হি হি হি হা হা হা হো হো হো !" আরও বেদম হাসি হাসতে লাগল খস্তা ঘোষ পাগলের মত।

আরও বেদম চটে গেল চরণদাস—"দেখ, থামাও বলছি হাসি, নয়ত দোব ঘাড় মটকে গঙ্গায় ফেলে।"

"তা তুমি পার বাবা। একশবার পার সে কাজ। আমি ত তোমার কাছে নস্যি। গণ্ডা কতক বাগ্দী লেঠেলকে ঠেঙিয়ে লাশ ক'রে ছেড়ে দিলে একলা। সে তুলনায় আমি ত ফড়িং। আমাকে ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলতেও পার বাবা তুমি। তাতে তোমার একটুও কষ্ট হবে না। কি সর্বনেশে বাবাজী রে বাবা !"

এবার চরণদাসও হেসে ফেললে। বললে—"ডাঁট বেরসিক হা তুমি ! অমন গানটা ঝপ্ ক'রে বন্ধ করতে আছে ?"

"কি করি বল, ঘাস দেখে যে ঘোড়ার মুখ চুলকে উঠল।"

চরণদাস এবার প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠল—"আরে দূর দূর, তোমার মত তাল-কানার সঙ্গে বাজায় কে ?"

খস্তা হাত জোড় ক'রে বললে—"ঠিক বলেছ দাদা, একটা লাখ কথার এক কথা বলেছ। তাল-কানা হয়েছি বলেই এখনও হেসে খেলে বেঁচে আছি। তোমাদের মত তাল-জ্ঞান থাকলে শুধু তাল ঠুকেই মরতে হ'ত আজ। নাও ধর, তোমার জটা এনেছি, এবার জুত করে ব'সে টান।"

প্রসন্ন হয়ে উঠল বাবাজী। বললে—"মাইরি বলছি তোমায় ঘোষ মশাই, গান যদি শিখতে তুমি তাহ'লে বাজিমাত ক'রে ছাড়তে একেবারে।"

খস্তা আর কান দিলে না ওর কথায়। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে—"কোথায় নামাব এগুলো গোসাঁই ?"

তখন নজর করে দেখলাম—একটা বেশ বড় ময়রার দোকানের ঝুড়ি রয়েছে ওর হাতে। একটু যেন সঙ্কোচ ফুটে উঠল খন্তার স্বরে।

"খাবার নিয়ে এলুম গোসাঁই বাজার থেকে। যে হুল্লোড় চলল আজ সারা দিন এখেনে—খাওয়া-দাওয়ার কথা মাথায় উঠে গেছে সকলের। তাই আনলুন কিছু কিনে। আমাদের বাবাজী ত আবার খিদে সইতে পারেন না।"

তখন আমারও খেয়াল হ'ল। তাইত! সত্যিই তখনও কিছু মুখে দেয়নি চরণদাস। নিতাই থাকলে অনেকক্ষণ আগেই ওর খাওয়ার যোগাড় কর্‌ত। একটা লঙ্কা পোড়া আর একটু নুন মেখে এক রাশ ভাত গিলে এতক্ষণে টানটান হয়ে শুয়ে নাক ডাকাত বাবাজী। খিদে পেলে ওর জ্ঞান থাকে না। ছোট ছেলের মত আনচান করতে থাকে। সেই চরণদাস আজ সারাটা দিন কিছু মুখে দেয়নি। তার ওপর কপাল ফেটেছে ওর, এক রাশ রক্তপাত হয়েছে।

রাগে ক্ষোভে গুম হয়ে বসে রইলাম।

হতভাগী—সোনা ফেলে কাচ নিয়ে আঁচলে বাঁধলি! চরণদাস সোনা, সোনার চেয়ে ঢের বড় চরণদাস বাবাজী—সোনা যাতে ঘ'ষে পরীক্ষা করা হয় সেই কষ্টি পাথর। বুক দিয়ে আগলে রেখেছিল তোকে। পাছে ওকে ঠকাতে হয় এই ভয়ে আমি কিছুতেই নামিনি আমার মড়ার গদি ছেড়ে তোর ডাকে। সেই চরণদাসকে ভাসিয়ে দিয়ে আজ তুই মজা লুটছিস একটা মাকালফল নিয়ে!

খন্তা একটা ধমক লাগালে আমায়।

"এগুলো ধরবে, না টেনে ফেলে দোব গঙ্গায়?"

চমকে উঠে নেমে গেলাম গদি থেকে। মিনতি ক'রে বললাম—"একটু সবুর কর খন্তা। হাতটা ধুয়ে আসি।"

ব'লে চলে গেলাম গদির পেছনদিকে। সেখানে কলসীতে ছিল খাবার জল। হাত ধুয়ে কলসীটাই উঠিয়ে নিয়ে এলাম। খাবার খেয়ে ওরা জল খাবে।

ততক্ষণে ধুনিটা উসকে দিয়ে কলকেতে আগুন চাপিয়েছে বাবাজী। খন্তার হাত থেকে ঝুড়িটা নিয়ে ধুনির পাশে নামালাম। দু'খানা শালপাতা খুলে নিয়ে দু'টো ঠোঙা বানিয়ে ভাগ করতে বসলাম খাবার। খন্তা গেল গঙ্গায় মুখ হাত ধুতে। বাবাজী চোখ বুজে বসে কলকেয় দম লাগাতে লাগল।

একটা ঠোঙায় খাবার ভ'রে চরণদাসকে বললাম—"নাও ধর, এবার মুখে দাও কিছু।"

রক্তবর্ণ চোখ দুটো মেলে বাবাজী তাকালে আমার দিকে। হাত বাড়ালে না।

আবার বললাম—"ধর এটা, খস্তার খাবারটাও তুলে ফেলি ঠোঙায়।"

চরণদাস মুখ নামিয়ে নিয়ে বললে—"থাক, ওতে আর আমার কাজ নেই।"

একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম—"সে কি! খাবে না তুমি কিছু?"

আরও ঠাণ্ডা আরও মৃদু সুরে বাবাজী বললে—"ও সমস্ত আর আমার ভাল লাগে না গোসাঁই।"

আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম—"দোকানের খাবার ত তুমি খাও বাবাজী। এখন ভাতের যোগাড় হয় কি করে? নাও ধর, যা জুটেছে তাই খেয়ে রাতটা কাটাই এস।"

বাবাজী শুধু মাথা নাড়লে।

তখন একটু চটেই গেলাম—বেশ একটু অভিমানও হ'ল। বললাম—"চরণদাস, তাহ'লে নেবে না তুমি আমার হাত থেকে খাবার?"

মাথাটা এগিয়ে এনে বাবাজী আমার হাতে-ধরা ঠোঙায় কপাল ঠেকালে। খুব চুপি চুপি বললে—"কারও হাত থেকেই আর কিছু নোব না গোসাঁই। যে হাত থেকে খাবার জিনিস নিতাম আমি, খাওয়ার জন্যে যার ওপর জুলুম চালাতাম, সে আর নেই। সে হাত দু'খানা খুইয়েছি আমি। তাই ও কাজ আমি বন্ধ ক'রে দিয়েছি।"

আঁত্‌কে উঠলাম—"সে কি! সেই থেকে খাওনি তুমি কিছু?"

তেমনি ভাবে ফিসফিস ক'রেই বললে বাবাজী—"না গোসাঁই, আমার আর দরকার করে না খাওয়ার। এই ত বেশ আছি। শুধু জল খেয়ে কেমন তাজা রয়েছি। শুধু জল খেয়েই কাটাব যতদিন না সে ফেরে।"

আর সামলাতে পারলাম না নিজেকে। খাবারের ঠোঙাটা নামিয়ে রেখে দু'হাতে ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরলাম। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় গলাটা বুজে গেছে আমার তখন। শুধু কোনও রকমে বলতে পারলাম—"চরণদাস!"

চরণদাস হাত ছাড়ালে না। ওর কণ্ঠ থেকে মর্মান্তিক অনুনয় বার হ'ল—"একটা কথা তোমায় বলব গোসাঁই। বল রাখবে? বল?"

পাষাণ গ'লে যায় এমন আকুতি।

বললাম—"বল চরণদাস, বল তোমার কথা। তোমার কথা রাখতে যদি ঐ মড়ার গদিও ছাড়তে হয়, তাও আমি ছাড়ব এবার—বল তোমার কথা—"

অনেকটা সময় বাবাজী মুখ নিচু ক'রে রইল, যেন বলতে গিয়ে তার কোথায় আটকাচ্ছে। শেষে মুখ নিচু করেই বললে, বললে যেন একটি একান্ত লজ্জার কথা, একটি অতি গোপনীয় কথা বললে যেন চরণদাস।

বললে—"যদি সে কোনও দিন ফেরে ত তাকে বোল যে আমি শেষ সময় পর্যন্ত এ বিশ্বাস বুকে রাখতে পেরেছি যে সে কোনও ছোট কাজ করতে পারে না।"

ঝট্ করে হাত টেনে নিলাম আমি। গর্জে উঠলাম—"কি ? কি বললে তুমি চরণদাস ? এর পরও তুমি বলতে চাও যে সে ছোট কাজ করতে পারে না ?"

ওর লাল চোখ দুটোয় অস্বাভাবিক একটা আলো দেখা গেল। অতি মধুর হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে—"হ্যাঁ তাই গোসাঁই, ঠিক তাই, ঠিক তাই, ঠিক তাই। নিতাই দাসী কোনও দিন ছোট কাজ করতে পারে না এই বিশ্বাস নিয়েই যেতে পেরেছে চরণদাস বৈরাগী—এইটুকুই শুধু জানিয়ে দিও তাকে। এই আমার শেষ আব্দার তোমার কাছে।"

কয়েকটা মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। ধুনির আলোয় চরণদাসের কালো মুখখানা আলোয় আলো হয়ে উঠেছে। চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল—কোথায় যেন একটা কিছু বুঝতে ভুল হচ্ছে আমার। খেই হারিয়ে ফেলেছি যেন আমি সব ব্যাপারটার। চরণদাস আর নিতাই দাসী এই দু'টো জট-পাকানো সুতোর জট খোলার সাধ্য আর যারই থাক, উদ্ধারণপুরের সাঁই-বাবার নেই। বুকের মধ্যে যে জিনিস থাকলে তাই দিয়ে ভিজিয়ে ও জট নরম করা যায় সে জিনিস নেই আমার বুকে। শুকিয়ে গেছে। উদ্ধারণপুরের বাস্তব বাদ্শার গোলামি করতে করতে করতে এ বান্দার বুকের ভেতরটা শুকনো ছোবড়া হয়ে গেছে। নিতাই দাসী আর চরণদাসের ব্যাপারে নাক গলাতে যাওয়া আমার মত শ্মশান-শকুনের পক্ষে চরম বিড়ম্বনা।

কিন্তু শুধু জল খেয়ে বেঁচে আছে যে ও! শ্মশানে বসেও যে আমরা খাচ্ছি। শেয়াল-শকুন-কুকুর-আমি—আমরা যে শ্মশানে বাস করছি, শুধু মজা ক'রে পেট ভরাবার আশায়। সেই পেটের দাবিও যে অগ্রাহ্য ক'রে বসেছে বাবাজী। ও হতভাগা বুঝছে না কেন, যে আগুন পেটের মধ্যে জ্বলছে সে আগুনে কিছু না কিছু দিলে তা বাইরে বেরিয়ে এসে ওকেই নিঃশেষে ছাই ক'রে ছাড়বে। তখন কোথায় থাকবে ও নিজে, আর কোথায় থাকবে ওর নিষ্পাপ

নিতাই বোষ্টমী। শুধু এই শ্মশানময় পড়ে থাকবে কিছু সাদা হাড় আর কালো কয়লা। সাদা হাড় আর কালো কয়লার বুকভরা বেদনা বুঝবে কে তখন ?

শেষবারের মত শেষ চেষ্টা করতে গেলাম। আবার ধরলাম ওর হাত দু'খানা জাপটে। ধরে ধরা-গলায় বললাম—"চরণদাস বাবাজী, এই ত একটু আগে বললে—দোষ সব আমার। আমার দোষেই নিতাই গেছে। আমার দোষের জন্যে তুমি কেন প্রায়শ্চিত্ত ক'রে মরবে ? করতে হয় সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব। যেভাবে পারি, যেমন ক'রে পারি, আমি ফিরিয়ে এনে দোব তোমার নিতাইকে—"

আমার কথাটা শেষ হ'তে পেল না।

উদ্ধারণপুরের বেহেড বাস্তব হি হি ক'রে হেসে উঠল পেছন থেকে।

"বলি হচ্ছে কি ও ? যেন মানভঞ্জন-পালা চলেছে। ব্যাপার কি ?"

দীনতম দীনের মত হয়ে উঠল বাবাজীর চোখের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি কি বলতে চায় আমায় বুঝলাম। বলতে চায়—"দোহাই তোমার, যা একান্ত ভেতরের ব্যাপার—তাকে বাইরে টেনে এনে বে-ইজ্জৎ কোর না।"

দিলাম বাবাজীর সেই দৃষ্টির মূল্য। ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম—আয় খন্তা, এই তোর কথাই হচ্ছিল। বাবাজীকে তাই বোঝাচ্ছিলাম—না হয় করেই ফেলেছে একটা কাজ, ব্যাটাছেলে মানুষ, ও-রকম হয়ই একটু-আধটু। তা'বলে সেই মেয়েকেই যে এনে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে এই বা কেমন কথা !"

উবু হয়ে বসে পড়ল খন্তা। চোখ দুটো বড় বড় ক'রে বললে—"তার মানে ?"

খুব ভালমানুষি গলায় বলতে লাগলাম—"মানে সেই মেয়েটার আস্পর্দার বহরটা দেখে একেবারে থ' হয়ে গেছি কিনা। বলে কিনা, আর একটা মাস দেখব, তারপর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলব।"

"কে আবার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে যাচ্ছে কোথায় ? কি ব্যাপার কি গোসাঁই ? কে সে ? আর ঐ-সঙ্গে আমার কথাই বা হচ্ছিল কেন ?"

খন্তার ঠোঙায় খাবার তুলতে তুলতে বললাম—"ঐ যে রে, সেই যেন কি নাম ওদের গাঁয়ের ? সেই গাঁয়ের শীলের বাড়ীর ভাগনী না কি ! কি যেন তার নামটা ছাই, মনেই আসছে না !"

ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরলাম খন্তার দিকে।

হাত দিয়ে ঠেলে দিলে খন্তা আমার হাতখানা। দম আট্‌কানো সুরে বললে—"সে মেয়েকে তুমি জানলে কেমন ক'রে গোসাঁই ?"

বেশ বিরক্ত হয়ে গেলাম—"আর বলিস কেন সে ঝঞ্ঝাটের কথা ? সেই যে তুই গেলি দারোগাকে নিয়ে—আর ত এমুখো হ'লি না। এধারে কত কাণ্ডই যে ঘটল। এল কৈচরের বামুনদিদি, সঙ্গে এক খদ্দের। ভাবলুম দুটো টাকার মুখ দেখতে পাব। ও মা, তা নয়, যত সব "অনাছিষ্টি" কাণ্ড! বামুনদিদির চোখ এড়িয়ে খদ্দের এসে চুপি চুপি আমায় বললে যে সে ওষুধ-পত্তর নিতে আসে নি! এসেছে তোর খোঁজে! কে নাকি তাকে বলেছে যে আমায় ধরতে পারলেই আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারব, যাতে তুই গিয়ে তার হাতের ভেতর ঢুকিস।"

দাঁত-বার-করা চেহারাটার দিকে একবার আড়চোখে চাইলাম। দাঁত বন্ধ হয়ে গেছে। এক দৃষ্টে চেয়ে আছে খন্তা ধুনির আগুনের দিকে। ও যেন নেই সেই দেহের মধ্যে।

আবার বাড়িয়ে ধরলাম ঠোঙাটা।

"নে, ধর খন্তা, এবার মুখে দে কিছু।"

গ্রাহ্যও করলে না খন্তা ঘোষ। সেইভাবে এক দৃষ্টে আগুনের মধ্যে কি দেখতে দেখতে বললে—"সেই মেয়েটার থুতনিতে একটা বেশ বড় তিল আছে না গোসাঁই ? কথা বলতে বলতে তার নাকের ডগাটা কেমন যেন ঘেমে ওঠে না ? আর কেমন যেন ভুরু দুটো কুঁচকে কথা বলে না সে ?"

বললাম—"হাঁ হাঁ হাঁ, ঠিকই ত, মনে পড়েছে এবার। তিল ত একটা ছিল বটে তার মুখে। আর নামটাও যেন মনে পড়ছে এবার—সোনা—সোনাই বোধ হয় হবে তার নাম—"

"সোনা নয় গোসাঁই, ভুল হচ্ছে তোমার। মেয়েটার নাম সুবর্ণ।" শরীরের অনেক ভেতর থেকে যেন কথা কটা উচ্চারণ করলে খন্তা ঘোষ। সঙ্গে সঙ্গে কিসে যেন একটা সজোরে ধাক্কা দিলে ওর ভেতর থেকে।

সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল খন্তা। দাঁত কটা আবার বেরিয়ে পড়ল তার। চরণদাসের দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলে—"বাবাজী, ছোড়দি কোথায় ?"

একটিবার মাত্র তাকিয়ে দেখলাম বাবাজীর মুখের দিকে। খন্তার প্রশ্ন শুনে ভয়ে ওর চোখ দুটো কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হাঁ ক'রে কি বলতে গেল বাবাজী, গলা দিয়ে আওয়াজ বার হ'ল না।

একটুও দ্বিধা না ক'রে তৎক্ষণাৎ শুরু করে দিলাম—"সেই কথাই ত হচ্ছিল রে এতক্ষণ। চরণদাস জানবে কেমন ক'রে নিতাই আছে কোথায়? সেই সোনা না স্বুবর্ণ, সে ত এসে বলে গেল আমায় ক'দিন আগে, যে তোর ছোড়দি গিয়ে নাকি তাকে বলেছে আমার কথা। সেই খানেই নাকি আড্ডা গেড়েছে আজকাল তোর ছোড়দি। নিজে তিনি আসতে পারলেন না আমার সামনে, মেয়েটাকে পাঠালেন বামুনদিদির সঙ্গে। তুই যেন আমার কেনা গেলাম, আমি হুকুম করলেই অমনি ছুটে গিয়ে সেই মেয়ের আঁচল ধরে ঝুলে পড়বি!"

এবার একটু সহজ হ'ল খন্তা ঘোষ, সোজা পথে এল এতক্ষণ? সাদা গলায় বললে—"ও, তাই বল। সে কথা বল নি কেন এতক্ষণ? তাই ত ভাবছি, আমার ঠিকানাটা সে যোগাড় করলে কোথা থেকে? তা' বলে গেল কি সে তোমার কাছে গোসাঁই?"

"কি আবার বলবে? বললে সেই একই কথা, আর সে একমাস দেখবে। এক মাসের ভেতর যদি তুই তাকে সেখান থেকে উদ্ধার না করিস ত গলায় দড়ি দেবে।"

"কেন, গলায় দড়ি দেবে কেন? কি এমন হ'ল এর মধ্যে যে গলায় দড়ি দিতে হবে তাকে?" বলে খন্তা নিজের গলাটাই একবার হাত দিয়ে ঘষে নিলে।

খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম—"হবে আর কি? যা হয়ে থাকে। তার বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি? সাঁইথের এক বড়লোক মহাজন বহু টাকা দিতে চায় তাকে বিয়ে করার জন্যে। লোকটার বয়েস নাকি ষাট পেরিয়েছে। স্বুবর্ণর মামারা ঝুঁকে পড়েছে টাকার লোভে।"

ঝাঁ ক'রে উঠে দাঁড়াল খন্তা—"কি? কি বললে তুমি গোসাঁই? স্বুবর্ণ যে বিধবা, খুব ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল, বিধবাও হয়েছে ছোটবেলায়। আবার তার বিয়ে হবে কেন?"

"কি করে জানব বল? শীল-ফিলেদের ঘরে হয় বোধ হয় বিধবার বিয়ে। তা' ছাড়া অত ছোটবেলায় বিধবা হ'লে বিয়ে হওয়াই ত উচিত।"

দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে বললে খন্তা ঘোষ—"তা বলে সে শুয়োরের বাচ্চা ঘাটের মড়া সাঁইথের মোথ্রো শীল? শকুন উড়ছে শালার সাদা মাথার ওপর। দু'হাতে শালার টুঁটিটা টিপে যদি না ধরি এক দিন—"

খন্তা আর শেষ করলে না কথাটা। এক লাফে বাবাজীর সামনে প'ড়ে দু' হাতে জড়িয়ে ধরলে তাকে। ধরে টানাটানি জুড়ে দিলে—"ওঠ বাবাজী, ওঠ

শিগ্‌গির। আজ রাতারাতি যেভাবে হোক পৌঁছতে হবে পাঁচুন্দি। বিয়ে দেবার শখ শালাদের ঘুচিয়ে দোব জন্মের শোধ।”

বাবাজীও উঠে দাঁড়াল তড়াক ক'রে। একেবারে অন্য মানুষ, এতক্ষণ যেন আগুন ছিল না চরণদাসের শরীরে। যে মানুষটা একটু আগে বেদনায় নুয়ে পড়েছিল এ যেন সে মানুষ নয়। ধুনির আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর শরীরের পেশীগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে।

একবার বলতে গেলাম খন্তাকে যে চরণদাস শুধু জল খেয়ে বেঁচে আছে। কথাটা বেরোল না মুখ দিয়ে। শুধু কোনও রকমে বলতে পারলাম—“নিয়ে যাসনি ওকে খন্তা, না খাইয়ে নিয়ে যাসনি বাবাজীকে। তুইও দিয়ে যা কিছু মুখে।”

অন্ধকার নিমগাছতলা থেকে ভেসে এল খন্তার জবাব—“দূর ক'রে ফেলে দাও ও-গুলো, শেয়াল-কুকুরের পেট ভরুক।”

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

ঘাটের কিনারায় মাথা কুটছে গঙ্গা।

মাথা কুটছে উদ্ধারণপুরের বাস্তবের পায়ে।

নিরাসক্ত নির্বিকার বাস্তব একটানা পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছেন গঙ্গার কিনারায়। তাঁর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে—ছলাৎ ছলাৎ। এতটুকু ব্যস্ততা নেই, নেই বিন্দুমাত্র উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তাঁর পা ফেলার ছন্দে। সবই যে জানেন তিনি, উদ্ধারণপুরের অন্ধকারের ওপারে কি ঘটবে, কি ঘটেছে, কি ঘটতে পারে, সবই যে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তাই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বোত্তম, সর্বেশ্বর, সর্বংসহ। তাই কোনও সর্বনাশই তাঁকে টলাতে পারে না।

কিন্তু মড়ার গদির ওপর বসেও যে আমার বুক কাঁপে।

কম্পিত বুকের মধ্যে গুমরে উঠে তাঁর মহামন্ত্র—

“হুঁ ক্ষেঁ। যাং রাং লাং বাং আং ক্রেঁা মহাকাল ভৈরব সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ স্বাহা।”

আকুল হয়ে বার বার তাঁকে জানাই—“ফিরিয়ে দাও, ওদের দু'জনকে ফিরিয়ে দাও, নিও না গো, কেড়ে নিও না ওদের—”

গঙ্গার এপার-ওপার দু'পার জুড়ে হঠাৎ হাসাহাসি শুরু হয়ে যায়—
“হুয়া-হুয়া হুয়া-হুয়া—”

উদ্ধারণপুরের বিস্ময়।

বিস্ময় বর্ণচোরা বহুরূপী।

সাদা হাড় আর কালো কয়লার চোখে তাক লাগাবার জন্যে ভোল ফিরিয়ে আসে সে। এসে হাসে কাঁদে নাচে গায় আর মস্করা করে। এমন মারাত্মক জাতের মস্করা করে যে তা শুনে কালো মুখ সাদা হয়ে যায় আর সাদা মুখ কালো আঁধার হয়ে ওঠে। যারা মুখ পুড়িয়ে চিতায় চ'ড়ে শুয়ে থাকে তাদের আঁতে এমন আচমকা ঘা দেয় সেই মস্করা যে বেচারারা খলখল ক'রে হেসে উঠতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে।

উদ্ধারণপুরের বিস্ময়।

বিস্ময় বিস্তার করে বাগজাল।

বলে—"বড় আরামে আছ বাবা—এঁ্যা? বেশ মজা ক'রে পুড়ছো ব'সে ব'সে। পোড়ো—চিরকাল ধ'রে পোড়ো। কিছুতেই নিভবে না আগুন, কোনও কালে শেষ হবে না তোমার জ্বলুনির। মরণকে ফাঁকি দেবার জন্যে পালিয়ে এসে লুকিয়ে ব'সে আছ এখেনে, থাক। কে দেবে তোমায় নিষ্কৃতি চুপি চুপি এসে ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে যে বন্ধু বুকে টেনে নেয় সে যে ভয়ে ঢুকতে পারে না এখেনে। এই হিংস্র হ্যাংলা নির্লজ্জ জীবনের গ্রাস থেকে কে তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে রেহাই দেবে?"

উদ্ধারণপুরের বিস্ময়।

বিস্ময় বাধায় বাগড়া।

থতমত খেয়ে যাই। হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। বিলকুল ভোল ফিরিয়ে এসেছে। কোথায় গেল সেই কপাল-জোড়া ডগডগে সিঁদুরের ফোঁটাটা? কোথায় গেল সেই বীভৎস চুল-দাড়ির জঙ্গল! কোথায় গেল সেই ভাঁটার মত অগ্নিবর্ণ চোখ দুটো! আর কোথায়ই বা লুকোলো সেই বুকের রক্ত-শোষা ভয়াবহ দৃষ্টি! তার বদলে গলা থেকে গোড়ালি পর্য্যন্ত দুধের মত সাদা আলখাল্লা প'রে যে মানুষটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার মাথায় মুখে কোথাও চুল-দাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। চক্ষু দু'টিতে নেই এতটুকু আকাঙ্ক্ষার আগুন। সব পাওয়ার যা

বড় পাওয়া তার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি যেন উপচে পড়ছে চক্ষু দুটি থেকে। সব জানার যা বড় জানা তা জানা হয়ে গেলে যে জাতের রহস্যময় হাসি হাসতে পারে লোকে, সেই জাতের হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটের কোণে। এমন কি গলার আওয়াজও গেছে পালটে। যে গলা উদ্ধারণপুর ঘাটের শেয়াল-শকুনের পিলে চমকে দিত, সে গলায় উঁকি দিচ্ছে রসিকতার রহস্য।

বললে—"বলি হ'ল কি হে তোমার? ভিরমি গেলে নাকি? চেনা মানুষকে চিনতে পার না? শুধু খোলসটা পালটেছি বাবা, ভেতরে যে কালসাপ সেই কালসাপই আছি। এখন শুধু একটু কৃপা, এতটুকু করুণা যদি পাই তাহ'লেই হয়। নয়ত আমার সাধ্য কি যে ওপর-ভেতর এক ক'রে দোব তাঁকে।"

বলতে বলতে দু'চোখে জল এসে গেল। বুজে এল চোখের পাতা। ধরা গলায় আরম্ভ করে দিলে—

"যদপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি
ন তব নখাগ্র-মরীচং।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত
তদপি কৃপাদ্ভুত-বীচিং॥
দেব ভবন্তং বন্দে।
মন্মানস-মধুকরমর্পয় নিজ-
পদ-পঙ্কজ-মকরন্দে॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব
ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক—
দুর্ঘট-ঘটন-বিধাত্রী॥
অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতন
কলিতাদ্ভুত-রস-ভারং।
নিবসতু নিত্যমিহামৃত-নিন্দিনি
বিন্দন্মধুরিম-সারং॥"

এক বর্ণও মাথায় ঢুকল না। তবু বেশ লাগত শুনতে। আগমবাগীশের গলায় সব রকমের স্তোত্রই খোলে ভাল। সব রকমের সাজেই মানায় আগমবাগীশকে। কিন্তু একলা যে! আর একজন কই? বাসি ফুলে ত পূজো হয় না

ওঁর। টাটকা ফুল চাই! কিন্তু কই, কেউ ত এসে দাঁড়ালো না এবার ওঁর পেছনে!

না আসুক, কিন্তু উপযুক্ত সমাদর করতে হবে আগমবাগীশকে। তাড়াতাড়ি গদির পাশ থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে লাফিয়ে নামলাম।

"চলুন, আসন করুন, আগে একটু তর্পণ করুন।"

বেশ ধীরে সুস্থে নেড়া মাথাটি দু'পাশে দোলাতে লাগলেন আগমবাগীশ। বেশ সুর ক'রে বলতে লাগলেন—"না, না না, ও আর মুখে এন না গোসাঁই। ও কথা কানে ঢোকাও পাপ। শুধু একটু চরণামৃত আর একখানি চরণ-তুলসী, সেই সকালে একটিবার মাত্র গ্রহণ করি। ব্যস—ব্যস—আর কিচ্ছু না। ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়িয়ে শীতল হয়ে যায়। তারপর নাম, শুধু নামামৃত, আর কিচ্ছু না, আর কিছুরই প্রয়োজন করে না এখন।

ঘাবড়ে গিয়ে বোতলটা পেছনে লুকিয়ে ফেলি। আগমবাগীশ দু'চোখ বুজে ফেলেছেন। মৃদু মৃদু কাঁপছে তাঁর ঠোঁট দু'খানা। অতি চাপা সুরে আবার আরম্ভ হ'ল—

"মৃদুতর-মারুত-বেল্লিত-পল্লব—
বল্লী-বলিত-শিখণ্ডম্।
তিলক-বিড়ম্বিত-মরকত-মণিতল—
বিম্বিত-শশধর-খণ্ডম্॥
যুবতি-মনোহর-বেশম্।
কলয়কলানিধিমিব-ধরণীমনু—
পরিণত-রূপ-বিশেষম্॥"

হঠাৎ দু'চোখ খুলে ফেললেন আগমবাগীশ। আমার মুখের ওপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন—"দেখেছ? কখনও দেখেছ এ রূপ? কখনও এ রূপের ছায়া পড়েছে তোমার চোখে? পড়ে নি, পড়লে আর ও চোখের দৃষ্টিতে ভয় লুকিয়ে থাকত না। মরণের ভয়ে লুকিয়ে ব'সে থাকতে না এখানে। তুমিও বলতে পারতে—

"মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান!"

আচম্বিতে নাকী সুরে খ্যাঁক খ্যাঁক ক'রে কে হেসে উঠল আমার গদির পেছন থেকে। দু'জনেই চমকে উঠে ফিরে চাইলাম সেদিকে। চেয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে

অপেক্ষা করতে লাগলাম। পরিষ্কার দিনদুপুরে কে ওখানে ওভাবে প্রেতের হাসি হাসছে ?

এক দুই তিন চার—কয়েকটা দমে ভারী মুহূর্ত সরে গেল। তারপর আবার—আবার সেই খিঁ খি খিঁক খিঁক হাসি। হাসির শেষে ভেংচানো নাকী সুরে বার হ'ল—

"ম র্ঁ ণ রে ঁ তুঁ হুঁ মঁ মঁ শ্যাঁম সঁমান—"

মুখ ফিরিয়ে চাইলাম আগমবাগীশের মুখের দিকে। কালি ঢেলে দিয়েছে মুখে। উদ্ধারণপুরের ভস্মের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আগমবাগীশের মুখখানা। দুই চোখের দৃষ্টিতে—যেখানে এইমাত্র উপচে পড়ছিল পরিতৃপ্তি—সেই দৃষ্টিতে এখন ফুটে উঠেছে আতঙ্ক আর আকুলতা আর আত্মগ্লানি। গদির পেছন দিকে চেয়ে আছেন তিনি একদৃষ্টে—আর পিছুচ্ছেন। একটু একটু ক'রে পিছুতে লাগলেন আগমবাগীশ, আর একটু একটু ক'রে আবির্ভূত হ'ল—আপাদমস্তক মিশমিশে কালো কাপড়ে ঢাকা এক মূর্তি আমার গদির পেছন থেকে। হঠাৎ আগমবাগীশ উদ্ভট একটা চিৎকার ক'রে পেছন ফিরে দিলেন একটা লাফ গঙ্গার দিকে, হাত চার-পাঁচ দূরে ঢালু পাড়ের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে হড়হড় করে পিছলে নেমে গেলেন গঙ্গার জলে। সেখান থেকে আবার একটা বুকফাটা চিৎকার শোনা গেল। ওধারে দুটো চিতার পাশে যারা খোঁচাখুঁচি করছিল তারা দৌড়ে এসে পৌঁছে গেল যেখানে আগমবাগীশ জলে পড়েছেন সেখানে। তারাও লাগল চেঁচাতে, কিছু না বুঝেই চেঁচাতে লাগল তারা। গঙ্গার ভেতর অনেকটা দূরে আর একবার দেখা গেল আগমবাগীশের মুখখানা, দেখা গেল শূন্যে দুটো হাত তুলে কি যেন তিনি ধরবার চেষ্টা করছেন। নিমেষের মধ্যে তলিয়ে গেল মুঠো-বাঁধা হাত দু'খানা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সামনে দাঁড়ালো কালো কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটা—হিঁ হিঁ হি হিঁ করে পৈশাচিক হাসি হেসে উঠল।

সেই বীভৎস হাসি থামবার আগেই প্রাণপণে চিৎকার ক'রে উঠলাম—"কে তুই ? কি চাস ?"

দস্তুরমত ধমক দিয়েই বলতে গেলাম কথা ক'টা, শোনাল ঠিক উল্টো। শোনাল যেন প্রাণের দায়ে পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছি আমি। আমার সেই আর্তনাদ

শুনেই বোধ হয় শ্মশান-সুদ্ধ মানুষ ছুটে এল এধারে। আর একবার চেঁচাতে গেলাম—"কে তুই ? খোল মুখ—"

ভালো ক'রে আওয়াজই বেরোলো না মুখ দিয়ে, কে যেন সজোরে চেপে ধরেছে আমার গলা, দম বন্ধ হয়ে আসছে। কালো কাপড় মুড়ি দেওয়া সেই ভয়ঙ্কর মূর্তিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি।

খুব আস্তে আস্তে ন'ড়ে উঠল মূর্তিটা। প্রথমে কালো কাপড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দু'খানা হাতের কব্জি পর্যন্ত। কি কদর্য, কি কদাকার হাত ! দু'হাতের দশটা আঙুলই নেই, দগদগে লাল বোঁচা হাত দু'খানা। আস্তে আস্তে হাত দু'খানা উঠল মুখের কাছে। আস্তে আস্তে মুখের ওপরের কাপড় কপাল পর্যন্ত উঠল, আর সেই মুহূর্তে আমি একটা বিকট চিৎকার ক'রে উঠলাম। চিৎকার ক'রেই বুজে ফেললাম দু'চোখ। আর তৎক্ষণাৎ আবার আরম্ভ হয়ে গেল সেই পৈশাচিক হাসি—"হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ।"

হঠাৎ ঝপ ক'রে বন্ধ হয়ে গেল হাসিটা। দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল রামহরের বউ—"তবে রে মড়াখাকী, ফের তুই ঢুকেছিস শ্মশানে! দাঁড়া—আজ তোর বিষ ঝাড়ব খেংরে।"

চোখ চেয়ে ফিরে দেখি, ছুটে আসছে রামহরের বউ একখানা আধপোড়া কাঠের চেলা হাতে ক'রে। তার আর এসে পৌঁছতে হ'ল না, মার মার ক'রে উঠল অন্য সকলে। কালো কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটা ছুটল, ছুটে গিয়ে শেয়ালের মত ঢুকে পড়ল আকন্দ গাছের জঙ্গলের মধ্যে। হাতের কাঠখানা প্রাণপণে ছুঁড়লে রামহরের বউ সেদিকে। তার দেখাদেখি আর সবাই যে যা হাতের কাছে পেলে ছুঁড়তে লাগল জঙ্গল লক্ষ্য ক'রে। পোড়া বাঁশ, চেলা কাঠ, ভাঙ্গা কলসী, শ্মশানের যাবতীয় জঞ্জাল সব সাফ হয়ে গেল।

তখন আমার সামনে এসে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে রামহরের বউ—"হারামজাদী কি বলছিল তোমায় জামাই ?"

অনেকটা ধাতস্থ হয়ে গেছি আমি তখন। ধীরে সুস্থে গিয়ে চড়ে বসলাম গদির ওপর। বসে রামহরের বউকেই জিজ্ঞাসা করলাম—"ও কে বউ ? কাকে তোরা খেদালি কুকুর-খেদা ক'রে ?"

"ও মা! তুমিও চিনতে পারুনি নাকি গো ওকে ?"

চিনতে যে সত্যিই পারি নি তা' বোধ হয় আমার চোখে-মুখেই ফুটে উঠল। রামহরের বউ তা বুঝলে। বুঝে বললে—"সেই যে গো, সেই ছিনাল

মাগী, সোয়ামীর মুখে আগুন দিয়েই গলগল ক'রে মদ গিলতে লাগল। তারপর গিয়ে উঠে বসল সেই পোড়ারমুখো কাপালিকটার কোলে। সেই যে—"

আর বলতে হ'ল না তাকে। ঠিক যেন একটা বিছেয় কামড়ালে আমায়। তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে উঠলাম—"উঃ।" আবার দু'চোখ বুজে ফেললাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর ভেসে উঠল একখানা বিকটাকার মুখ। নাকটা নেই, ঠোঁট দু'খানাও নেই। বীভৎস লাল একটা গর্ত আর দাঁতগুলো। মরা মুখ, অনেক রকমের অনেক মড়ার মুখ দেখেছি, খ'সে গ'লে যাচ্ছে মাংস তাও হামেশা দেখছি, পোড়া মুখ যে কত দেখছি তার ত হিসেবও দেওয়া যায় না। কিন্তু একটা জ্যান্ত মানুষের মুখ যে অমন ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াতে পারে তা কি কস্মিন্‌কালে কল্পনা করতে পেরেছিলাম? মড়ার বীভৎসতার চেয়ে জ্যান্তর বীভৎসতা কি মারাত্মক রকমের ভয়াবহ!

তবু আর একবার টপ ক'রে আমার বোজা চোখের ওপর ভেসে উঠল এক সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মূর্তি। দুধের মত সাদা রঙ, অতি আশ্চর্য রকমের কালো একজোড়া ভুরুর নিচে অতল রহস্যের আধার দুটি অতি আশ্চর্য চক্ষু, সেই ছোট্ট কপালখানি জোড়া ডগডগে সিঁদুরের টিপটি আর মুখ-ভর্তি পান। আর একবার আমার কানে এসে বাজল সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর..."আগে আমার ঐ বোনটিকে ওর স্বামীর হাতে পৌঁছে দোব, তারপর চলে যাব কাশীতে।" সেদিন অজ্ঞাতে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—"আগমবাগীশ! আগমবাগীশ কোথায়?"

আগমবাগীশের কথা মনে পড়তেই বিদ্যুৎপৃষ্টের মত শিউরে উঠলাম। দু'চোখ খুলে চিৎকার ক'রে উঠলাম গঙ্গার দিকে চেয়ে—"আগমবাগীশ—আগমবাগীশ ডুবল যে রে—"

কেউই উত্তর দিলে না। বেশ খানিকক্ষণ পরে রামহরের বউ জবাব দিলে—"ডুবল না হাড় জুড়োল মিন্‌সের। ঐ রাক্কুসী মাগী হাঁ করে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। এতদিনে রেহাই পেলে ওর হাত থেকে।"

উদ্ধারণপুরের বিস্ময়।

বিস্ময় বিলীন হল বিস্মৃতির বদন-বিবরে।

তবু কিছু থেকে গেল বাকী। বাকী রইল একটি চিরন্তন জিজ্ঞাসা। গঙ্গায় ঝাঁপ দেবার পূর্ব মুহূর্তে আগমবাগীশ করেছিলেন সেই জিজ্ঞাসা। জানতে

চেয়েছিলেন তিনি আমার কাছে যে, কখনও আমার চোখে পড়েছে কিনা সেই রূপের ছায়া—

"যুবতি মনোহর-বেশম।
কলয়কলানিধিমিব-ধরণীমনু—
পরিণত-রূপ-বিশেষম॥"

জীবন্ত জীবনের রূপ। ও রূপের ছায়া কখনও আমার চোখে পড়লে আমি নাকি মরণের ভয়ে শ্মশানে এসে লুকিয়ে থাকতাম না!

কিন্তু কি হতে কি হয়ে গেল! নিমেষের মধ্যে আগমবাগীশ জীবনের ভয়ে ঝাঁপ দিলেন বিস্মৃতির বদন-বিবরে। কাকে ফাঁকি দিয়ে পালালেন তিনি? জীবনকে না মরণকে? এই চিরন্তন জিজ্ঞাসা শুধু বাকী রইল ডুবতে। ভেসে চলল গঙ্গার ঢেউয়ের সঙ্গে। আর উদ্ধারণপুরের ঘাট একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেই দিকে।

আর রামহরের বউ শ্মশানময় নাচতে লাগল গাল পাড়তে পাড়তে। সে যে 'পেত্যখ্য' জানে যে 'ধম্মের কল বাতাসে নড়ে!' ষোল আনা 'পেত্যখ্য' জানতে পেরেছিল সেদিন, যেদিন নাক ঠোঁট হাতের আঙুল খুইয়ে সিঙ্গী গিন্নী এসে সর্বপ্রথম আগমবাগীশের খোঁজ করেন। আমার সামনে তিনি আসেন নি, কারণ আমাকে তাঁর কালামুখ দেখাতে নাকি শরম লাগত। আর ওরা আসতেও দিত না ওঁকে আমার কাছে। দূর থেকেই খেদিয়ে দিত। তবু তিনি আসতেন, প্রায়ই নাকি আসতেন উদ্ধারণপুর ঘাটের ধারে কাছে। এসে খোঁজ করতেন আগমবাগীশের। ওধারে আগমবাগীশ ভোল ফিরিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন শুধু তাঁর শেষ শক্তিটির ভয়ে।

কিন্তু সিঙ্গী গিন্নী জানতেন। ভয়ানকভাবে বিশ্বাস করতেন যে একদিন পাবেনই তিনি আগমবাগীশকে উদ্ধারণপুরের ঘাটে। তাই তিনি নজর রেখেছিলেন শ্মশানের ওপর। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর আশা পূর্ণ হ'ল। 'যত মড়া উদ্ধারণপুরের ঘাটে' এই মহাবাক্যটি সার্থক করবার জন্যে আগমবাগীশ ফিরে এলেন শ্মশানে। এবং আর ফিরে গেলেন না।

ফেরে না কেউ।
উদ্ধারণপুরের ঘাট কাউকে ফিরিয়ে দেয় না।

যায় আবার আসে। আসবার জন্যে যায়। অনর্থক ফিরে যায়, শুধু আবার ঘুরে আসবার জন্যে। তারপর একদিন ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে। এবং তারপর আর যায় না। উদ্ধারণপুর ঘাটের কোলে তখন শান্তিতে শুয়ে পড়ে ঘুমোয়।

শুধু আমি যাই না কোথাও। আমি যে পালিয়ে এসে লুকিয়ে বসে আছি শ্মশানে। পালিয়ে এসেছি মরণের ভয়ে। এ কথাটি সব শেষে শুনিয়ে গেলেন আগমবাগীশ।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা তিনিও পালিয়ে এসেছিলেন উদ্ধারণপুরের ঘাটে। মরণের ভয়ে নয়, জীবনের ভয়ে। জীবনকে চাখতেন আগমবাগীশ, হরদম মুখ বদলাতেন জীবনের মুখে চুমো খেয়ে। ওস্তাদ সাপুড়েও "কালকেউটের মুখে চুমো খায়। আর কালকেউটে যেদিন চুমো দেয় সাপুড়ের মুখে, সেদিন নীল হয়ে ঢুলে পড়ে সাপুড়ে তার পোষা সাপের কোলে।

ডাক ছেড়ে শোনাতে ইচ্ছে হ'ল আগমবাগীশকে যে সামান্য একটু ভুল বুঝে গেলেন তিনি। মরণের ভয়ে পালিয়ে আসিনি শ্মশানে, এসেছি জীবনের ভয়ে। মরণের ক্ষুধাকে আমার ভয় নয়, আমি ভয় করি জীবনের সুধাকে। মরণের ক্ষুধাকে ফাঁকি দেবার কায়দা জানে উদ্ধারণপুরের ঘাট কিন্তু জীবনের সুধা থেকে যে মারাত্মক নেশা জন্মায়, সে নেশার হাত থেকে কি ক'রে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা যে কেউ জানে না!

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

কান্না হাসির হাট।

দুনিয়ার সর্বত্র দিনের শেষে নামে রাত, রাতের পিছু পিছু আসে দিন। উদ্ধারণপুরের ঘাটেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

দিন আর রাত ঘুরে আসে আর ফিরে যায়—আর আবার ঘুরে আসে। যেন নেশা করেছে। বদ্ধ মাতালের মত অনর্থক ঘুরে মরছে।

কিন্তু ঘুরে আসে না খন্তা ঘোষ, আসে না চরণদাস। আর আসে না একজন। অবশ্য সে আর আসবেও না কোনও দিন। কোন্ মুখে আসবে? আর একবার আমার সামনে এসে দাঁড়াবার স্পর্ধা কিছুতেই হ'তে পারে না তার। অথবা এও হতে পারে যে উদ্ধারণপুরের ঘাটে ফিরে আসবার প্রয়োজন তার চিরকালের মত ফুরিয়েছে। জীবনের সুধা আকণ্ঠ পান ক'রে তীব্র নেশায় বুঁদ

হয়ে আছে এখন সে। থাকুক্‌, শান্তিতে থাকুক যেখানে আছে। যতদিন পারে থাকুক, তারপর আসতেই হবে একদিন ফিরে, পরিত্রাণ নেই।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ফিরে আসে সুবর্ণ। এসে মাথা খুঁড়তে থাকে উদ্ধারণ-পুরের ভস্মের ওপর। বলে—"জল দাও, একটু জল দাও ওগো আমায়। তেষ্টায় যে প্রাণ যায়।"

ছুটে আসে পঙ্কা, রামহরে, রামহরের বউ। আসে ময়নাপাড়ার ওরা সকলে। কিন্তু কেউ মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না। লজ্জা নেই, শরম নেই, প্রায়-উলঙ্গ একটা যুবতী মেয়ে মাথা-কপাল চাপড়াচ্ছে, চুল ছিঁড়ছে আর শ্মশানভস্মের ওপর মুখ রগড়াচ্ছে। জল দিতে গেলে তেড়ে মারতে আসছে। আর সমানে চিৎকার করছে—"জল দাও, ওগো একটু জল দাও, গলা শুকিয়ে গেছে আমার, বুক ফেটে গেল, উঃ মা গো"—দু'হাতে বুক চেপে ধরে আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, কাছে যাবার জো নেই কারও। এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেছে যে কাছে গেলেই বোধ হয় কামড়ে দেবে। অবশেষে একটা মতলব এসে গেল মাথায়। মুখ তুলে আমার দিকে চাইতেই চিৎকার ক'রে উঠলাম—"ডাক ত রে কেউ খন্তাকে, ডেকে আন খন্তাকে এখনই, ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করুক এটাকে।"

অত্যাশ্চর্য ফল ফলল। স্থির হয়ে বসে মাথা কাৎ করে যেন শুনতে চেষ্টা করলে আমি কি বললুম। সে সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করলাম আমি। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম—"খন্তা, কোথা, কোথা গেলি রে খন্তা, আয় ত একবার এদিকে। ভয়ানক ত্যাঁদড়ামো করছে এ বেটী—"

তাড়াতাড়ি গায়ে মাথায় কাপড় জড়াতে লাগল আর ভীত চকিত আঁখি দুটি তুলে এধার ওধার দেখতে লাগল। তারপর ঝট ক'রে উঠে পড়ল শ্মশান-ভস্মের ওপর থেকে, ছুটে এসে দাঁড়াল আমার গদি ঘেঁষে। একগলা ঘোমটার ভেতর থেকে ফিসফিস ক'রে বললে—"তাহলে ছেড়ে দিয়েছে ওকে? পালিয়ে আসতে পেরেছে ও? জল খেয়েছে, খুব জল খেয়ে নিয়েছে ত? আঃ—" বলে দু'হাত দিয়ে নিজের গলাটা রগড়াতে লাগল।

সবাই হাঁ ক'রে চেয়ে আছে ওর দিকে। আমিও এক দৃষ্টে চেয়ে আছি ওর মুখের দিকে। একটু পরে আরও খানিক ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস ক'রে বললে—"আমার কথা বলবেন না যেন আর তাকে। কিছুতেই বলবেন না। তাহ'লে আরার ও ছুটে যাবে। আর আবার—"বলতে বলতে হঠাৎ থামল। তারপর

দু'চোখ বুজে বারবার শিউরে উঠল। তারপর "উঃ মাগো" বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে ঢ'লে পড়ল আমার গদির কিনারায়।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল ময়না। এসে দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার ক'রে উঠল—"ওগো, কি হবে গো! দাদাবাবুকে কারা কোথায় আটকে রেখেছে গো! আমাদের দাদাবাবু সেখানে জল জল ক'রে মরছে গো! ওরে বাবা গো, কি হবে গো—"

ময়নার সুর-টানা শেষ হবার আগেই সিধু ঠাকুর ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠাণ্ডা মানুষ সিধু ঠাকুর, নেহাতই ভাল মানুষ। হঠাৎ তাঁর চোখে মুখে সর্বাঙ্গে যেন আগুন জ্বলে উঠল। মাথার ওপর দু'হাত তুলে হুংকার ছাড়তে ছাড়তে নাচতে লাগলেন তিনি:

"চলে আয়। মানুষ যদি কেউ থাকিস ত আয় আমার সঙ্গে। আমি জানি কোথায় সে গেছে। যাবার সময় ব'লে গেছে আমাকে। খন্তা ঘোষের নুন যদি কেউ খেয়ে থাকিস ত আয় আমার সঙ্গে। আজ সে নুনের দাম দিতে হবে।"

সাড়া দিলে। খন্তা ঘোষের নুনের দাম দিতে তৎক্ষণাৎ দশজন তৈরী হয়ে দাঁড়ালো। দশখানা লাঠি-সড়কি বেরিয়ে গেল ডোমপাড়া থেকে। যাবার সময় শ্মশানে এসে শ্মশানভস্ম ছুঁয়ে শ্মশানকালীর নামে কি যে শপথ ক'রে গেল ওরা তা শ্মশানকালীই জানে।

কিন্তু শ্মশানকালীও জানে না কি হবে এই মেয়েটার। হৈ হৈ করতে করতে যে যার নিজের পথে পা বাড়ালে। ময়না ওকে তুলে আমার গদির এক কোণে ফেলে রেখে গেল। ওর সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার আর এতটুকু গরজ নেই কারও। খন্তা ঘোষ মরছে যে, জল জল ক'রে মরছে কোথাও। খন্তা ঘোষ উদ্ধারণপুর ঘাটের দাদা, সকলেরই দাদা খন্তা ঘোষ।—অনেক নুন খেয়েছে অনেকে খন্তা ঘোষের। আজ তার দাম দিতে ছুটল সকলে।

সুতরাং রাজশয্যার এক কিনারায় পড়ে রইল সুবর্ণ। খন্তা ঘোষের অনেক নুন আমার পেটেও গেছে। সেই নুনের দাম দেবার জন্যে আমি বসে রইলাম কাঠ হয়ে তার দিকে চেয়ে। হতভাগী ঘুমোতে লাগল নিশ্চিন্তে। খন্তা পালিয়ে আসতে পেরেছে, এসে খুব, অনেকটা জল খেয়েছে, এ সংবাদ জেনে খন্তার প্রাণ-পাখী মহাশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল মড়ার গদির ওপর। কে জানে কতদিন ও ঘুমোয় নি এভাবে। ঘুমোবে কি করে, খন্তা যে জল জল করে তিলে তিলে শুকিয়ে মরছিল!

ওর দিকে চেয়ে বসে থাকতে থাকতে দাঁত-বার-করা খন্তার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলাম যেন। দিবারাত্র অষ্টপ্রহর এই মেয়ে মানসচক্ষে দেখতে পায় খন্তার সেই হতচ্ছাড়া রূপ। দেখতে দেখতে সে রূপের ছায়া পড়েছে ওর চোখে মুখে ? হঠাৎ মনে হল, খন্তার চেয়ে সৌভাগ্যবান কে আছে এ দুনিয়ায় ? জল জল করে তিলে তিলে যদি মরেও থাকে খন্তা ত তার মরণ সার্থক হয়েছে। মরবার পরেও সে বেঁচে আছে, বেঁচে রয়েছে সুবর্ণর চোখে-মুখে, বুকের মধ্যে, রক্তের সঙ্গে মিশে। সেখান থেকে কোনও যম তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না কোনও দিন।

কিন্তু আর একজন ?

আর একজনও যে গেছে খন্তার সঙ্গে !

তার কি হ'ল ?

কেউ ভাবছে না তার কথা, তার কথা কারও মনেই পড়ল না। জানে না বোধ হয় কেউ যে চরণদাসও মরতে গেছে খন্তার সঙ্গে। তাকেও হয়ত বন্ধ করে রাখা হয়েছে খন্তার সঙ্গে। সে কিন্তু চেঁচাবে না জল জল ক'রে, চেঁচাবে না কারণ চরণদাস ত্যাগ করেছে জলস্পর্শ করা। স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে বাবাজী অন্নজল এবং সেও আর একটি নারীর জন্যে। তফাৎ হচ্ছে খন্তা যার জন্যে শুকিয়ে মরছে সে ছুটে এসেছে আগেই উদ্ধারণপুরের ঘাটে আর বাবাজী যার জন্যে স্বেচ্ছায় শুকিয়ে মরছে সে এখন জীবনের সুধাপাত্র দু'হাতে মুখে তুলে আরামে চুমুক মারছে আর একজনের বুকের কাছে শুয়ে।

কে যেন সজোরে মোচড়াতে লাগল আমার হৃৎপিণ্ডটাকে। অসহ্য যন্ত্রণায় দু'হাতে চেপে ধরলাম বুকটা। মনে হ'ল যেন এখনই ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে আসবে নাক-মুখ দিয়ে আমার।

এক ফোঁটা হাওয়া নেই উদ্ধারণপুর ঘাটের আকাশে। চতুর্দিক যেন গুটিয়ে ছোট হয়ে আসছে। ক্রমে ক্রমে আঁধার হয়ে উঠছে দু'চোখ আমার। দম ফেটে মারা যাব, শুধু এক ফোঁটা হাওয়ার জন্যে দম ফেটে মারা যাব উদ্ধারণপুর ঘাটের রাজশয্যার ওপর বসে।

উদ্ধারণপুরের রাত্রি।

রাত্রি ছায়া গড়া কায়াহীনা নিশীথিনী নয়।

আঁখিতে স্বপন দেখার সুর্মা প'রে যে রজনীরা দুনিয়ার বুকে আসে যায়, সেই ছলনাময়ী অভিসারিণীরা উদ্ধারণপুরের ত্রিসীমানা মাড়ায় না।

উদ্ধারণপুরের রাত্রি উলঙ্গিনী বিভীষণা অতি ক্ষুধার্ত রাক্ষসী। অস্থিচর্মসার পেটে-পিঠে-লাগা ভয়ঙ্করী মূর্তি সে রাক্ষসীর। উদ্ধারণপুর ঘাটের পোড়া কয়লার চেয়ে হাজার গুণ কালো তার রঙ, কোটরে-বসা দুই ক্ষুধার্ত চোখে অতল অন্ধকার। হাড্ডিসার হাত দু'খানা বিস্তার ক'রে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাক্ষসী শ্মশানময়। খুঁজছে, হাতড়ে বেড়াচ্ছে, যদি কিছু হাতে ঠেকে ত টপ করে ধরে মুখে পুরে ফেলবে।

উদ্ধারণপুরের রাত্রি কাঁদছে। ক্ষুধার জ্বালায় হিসহিস করে কাঁদছে। কাঁদছে আর এগিয়ে আসছে আমার গদির দিকে। হাতড়াতে হাতড়াতে এগোচ্ছে। অন্ধ রাত্রি ভাগ্যে দেখতে পায় না। পেলে অনেক আগেই গিলে ফেলতে আমাদের। অবশেষে এসে পৌঁছে গেল। গদির সামনে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে লাগল। আরও এগিয়ে আনলে মুখখানা, খানিক নিচু হ'ল। তপ্ত শ্বাস পড়তে লাগল আমার মুখের ওপর। দম বন্ধ হয়ে গেছে আমার, নির্নিমেষ চক্ষে চেয়ে আছি ওর চোখের দিকে। কালো কয়লার চেয়ে হাজার-গুণ কালো উদ্ধারণপুরের রাত্রির দুই কোটরে-বসা চক্ষু, চক্ষু দুটিতে ক্ষমাহীন ক্ষুধা ধিকিধিকি জ্বলছে।

জ্বলে উঠল একটা ক্ষমাহীন প্রতিহিংসা আমার বুকের মধ্যে। চরণদাস তোমায় ক্ষমা করতে পারে, না, বিশ্বাস করতে পারে সে যে কোনও অন্যায় তুমি করতে পার, কিন্তু আমি—আমি বসে থাকি উদ্ধারণপুর ঘাটের মড়ার বিছানার ওপর। এতটুকু রসকষ নেই আমার গদিতে, এক ফোঁটা রসও নেই আমার দেহ মনে কোথাও। চরণদাসকেও তুমি ফাঁকি দিয়েছ, আমায় দিতে পারবে না। আসতেই হবে তোমায় এখানে, ফিরে আসতেই হবে। উদ্ধারণপুরের ঘাট ক্ষমা করতে জানে না, চিতাভস্মের সাদর আমন্ত্রণ অলঙ্ঘনীয়, অমোঘ। পালিয়ে থাকবে তুমি কত কাল? অন্নজল ত্যাগ ক'রে মরছে চরণদাস, কিন্তু আমি মরব না। যুগ যুগ ধরে বসে থাকব আমার এই গদির ওপর, আর ব'য়ে চলবে ঐ গঙ্গা, আর ব'য়ে চলবে কাল। তন্দ্রাহারা জেগে রব আমরা তিনজন তোমার জন্যে। তারপর তুমি ফিরে আসবে একদিন, আসবে ঐ সিঙ্গী গিন্নীর মত হয়ে। নাক ঠোঁট হাতের আঙুল কিছু থাকবে না। রক্ত-মাংসের গরবও থাকবে না তোমার সেদিন। লোকে তোমায় কুকুরের মত দূর দূর করে

খেদাবে। যতক্ষণ না তা দেখছি এই চক্ষে, ততক্ষণ নড়ছি না আমি গদি ছেড়ে।

ব'য়ে চলল গঙ্গা, ব'য়ে চলল কাল, ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল প্রতিহিংসার আগুন আমার বুকের মধ্যে। আর উদ্ধারণপুরের রাত্রি হিসহিস ক'রে কেঁদে ঘুরে বেড়াতে লাগল শ্মশানময়। অন্ধ রাত্রি হাতড়ে বেড়াতে লাগল যদি কিছু জোটে হাতের কাছে। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে লাগল খন্তা ঘোষের সুবর্ণ আমার গদির এক কোণে শুয়ে, আর রাতজাগা পাখীরা প্রহরে প্রহরে ঘোষণা ক'রে চলল গঙ্গার এপারে ওপারে উঁচু গাছের ডালে বসে। তারপর বড় সড়কের ওপর হুস করে একটা আওয়াজ হ'ল। একটা দমকা হাওয়া যেন ছুটে চলে গেল বড় সড়কের ওপর দিয়ে। একবার একটু চমকে উঠলাম। তারপর আবার চোখ বুজে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। বসে বসে গুণতে লাগলাম মুহূর্ত-গুলি। খন্তা ঘোষ আর চরণদাসও হয়ত ঠিক এই সময় এইভাবে মুহূর্ত গুণতে গুণতে এগিয়ে আসছে। এক বিন্দু জলের জন্যে তিলে তিলে মরছে ওরা। মরছে অতি তুচ্ছ কারণে। মরছে একটা নারী-দেহের জন্যে, যে নারী-দেহটা প'ড়ে রয়েছে আমার ডান পাশে ঠিক দু'হাত দূরে।

আচম্বিতে ভয়ানক রকম চমকে উঠলাম। সত্যিই যেন কার তপ্ত শ্বাস পড়ল আমার মুখের ওপর। আরও জোরে দু'চোখের পাতা টিপে রইলাম।

কয়েক মুহূর্ত পরেই কানে গেল, স্পষ্ট কানে গেল হিসহিস শব্দ, কে যেন বললে—"গোসাঁই, আমি এসেছি।"

প্রাণপণে বুজে আছি দুই চোখ। কিছুতেই খুলব না। খুললেই ভুল ভেঙ্গে যাবে। দেখতে হবে উদ্ধারণপুরের রাত্রির কোটর-বসা দুই চক্ষের অতল-স্পর্শ অন্ধকার।

তারপর কানে গেল খসখস শব্দ। ভারী গরদের কাপড় প'রে একটু নড়াচড়া করলে যে রকমের শব্দ হয় সেই রকম শব্দ গেল কানে। মনে হ'ল যেন কে বসে পড়ল একেবারে আমার কোল ঘেঁষে। হঠাৎ উগ্র গোলাপ ফুলের গন্ধে ছেয়ে গেল বাতাস। এবার একেবারে কানের কাছে শুনতে পেলাম, কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বলে উঠল—"গোসাঁই, আমি এসেছি। পালিয়ে এসেছি আমি। চোখ খুলবে না গোসাঁই ?"

কিছুতেই না, কিছুতেই খুলব না চোখ আমি। শবশয্যায় চড়ে বসে আছি

আমি, আমার সঙ্গে কোনও চালাকি চলবে না। কোটরে-বসা চক্ষুর অতলস্পর্শী চাহনিতে যেমন আমি ভয় খাই না, তেমনি ফুলের গন্ধে বা কান-জুড়োনো ডাক দিয়েও আমাকে ভোলানো যাবে না। বছরের পর বছর শবশয্যার ওপর বসে সাধনা করে যে সিদ্ধি লাভ করেছি আমি, অত সহজে সে সিদ্ধিকে টলানো যায় না।

তখন আরম্ভ হ'ল গান। গুনগুন ক'রে গান আরম্ভ হ'ল আমার কানের কাছে।

"বঁধু হে—নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া,
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥
তোমায় নয়নে লুকায়ে থোব॥
শিশুকাল হৈতে, আন নাহি চিতে—
ও পদ করেছি সার।
ধন, জন, মন, জীবন যৌবন,
তুমি সে গলার হার॥
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে
কভু না পসারি তোমা।
অবলার ত্রুটি, হয় শত কোটি—
সকলি করিবে ক্ষমা॥"

হঠাৎ আমার দুই গালের ওপর ঠাণ্ডা দু'খানি হাত এসে পড়ল। দু'হাত দিয়ে কে যেন চেপে ধরলে আমার মুখখানা। তখন চাইতেই হ'ল চোখ। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে ধরে ফেললাম তার হাত দু'খানা। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়েও দিলাম তটস্থ হয়ে। একি! কার হাত ধরলাম আমি? এত গয়নাগাঁটি শুদ্ধ হাতদু'খানি কার?

অন্ধকারের মধ্যে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। মুখখানা তখন আমার মুখ থেকে মাত্র এক বিঘত তফাতে এসে গেছে। দু'হাতে আমার মুখখানা ধরে সে রুদ্ধনিশ্বাসে চেয়ে আছে আমার চোখের দিকে।

কিন্তু একি! কার এ মুখ এ! নাকের পাশে জ্বলজ্বল করছে ওটা কি? নিশ্চয়ই ওটা হীরের নাকছাবি! কপালের পর ঝুলছে ওটা কি? সিঁথির ওপর দিয়ে নেমে এসেছে একটা চকচকে চেন, তার নিচে ঠিক কপালের ওপর একখানি টিকলি ঝুলছে। খুব ছোট ছোট উজ্জ্বল পাথর অনেকগুলো লাগানো রয়েছে টিকলিতে। দুই কানেও দুলছে দুটো গয়না, এত অন্ধকারেও তা থেকে আলো

ঠিকরে বেরুচ্ছে, গলাতেও যেন কি একটা দেখা যাচ্ছে। কে এ! কার তপ্ত শ্বাস পড়ছে আমার মুখের ওপর?

ধীরে ধীরে আবার নড়ে উঠল ঠোঁট দু'খানি। আবার কানে গেল—"গোসাঁই আমি এসেছি। পালিয়ে এসেছি গোসাঁই। আর পারি না আমি, আর পারি না। চল গোসাঁই, পালিয়ে চল এখান থেকে। তোমায় নিতে এসেছি। তোমায় নিয়ে পালিয়ে যাব।"

অজ্ঞাতে খুব চুপি চুপি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"কোথায়?"

আরও কাছে সরে এল মুখখানি, প্রায় ঠেকল এসে আমার মুখের সঙ্গে।

আরও চুপি চুপি বললে সে—"যেখানে দু'চক্ষু যায়। যেখানে মানুষ নেই। যেখানে কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি থাকব সেখানে। সেখানে কেউ কাঁদবে না, কেউ মরবে না, কেউ কাউকে হিংসে করবে না, কারও জন্যে কারও জিব দিয়ে জল পড়বে না। সেখানে মড়ার বিছানার ওপর চড়ে বসে থাকতে হবে না তোমায়, গলগল ক'রে গিলতে হবে না ওই বিষগুলো। আমাকে সাত দরজায় লাথি ঝাঁটা খেয়ে ঘুরে মরতে হবে না। সাত জনের মন জোগাতে হবে না। হাজার হাজার হ্যাংলা চোখের চাউনির ছোঁয়াচ লাগবে না আমার গায়ে। চল গোসাঁই চল, আর দেরি করা নয়, ঐ দেখ ফিকে রঙ্ ধরছে গঙ্গার ওপারে।"

বলতে বলতে—আমার মুখ ছেড়ে দিয়ে হাত দু'খানা চেপে ধরলে। গঙ্গার ওপারের আকাশে তাকালাম চোখ তুলে। চোখ নামিয়ে ভালো করে চেয়ে দেখলাম সামনে-বসা মূর্তিটির দিকে। তারপর আস্তে আস্তে হাত দু'খানা ছাড়িয়ে নিলাম।

অপরূপ ভঙ্গিমায় হাঁটু গেড়ে বসেছে আমার সামনে। হাঁটু দুটি ঠেকে আছে আমার কোলের সঙ্গে। মুখখানি ঝুঁকে পড়েছে। ছোট্ট কপালখানিতে চন্দন দিয়ে আলপনা আঁকা রয়েছে। মাথার মাঝখানে সিঁথি কেটে বেণী ঝুলিয়ে দিয়েছে পিঠে। সিঁথির ওপর দিয়ে এসেছে টিকলি। বোধ হয় এতক্ষণ ঘোমটা দিয়েছিল, তাই কাপড়ের ঘষায় অনেকগুলি চূর্ণ কুন্তল এসে পড়েছে কপালের ওপর। অসম্ভব কালো চোখের দুই কোণায় খুব সরু করে টেনে দিয়েছে কাজল। প্রায় কাঁধের ওপর ঠেকছে দু'কান থেকে ঝোলানো দুই ঝুমকো। নাকছাবি থেকে যে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে তাইতে মুখের বাঁ দিকটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। হাঁ, মানিয়েছে বটে, সব কিছু এমনভাবে মানিয়েছে যে মনে হ'ল এই সমস্ত বাদ দিয়ে ওকে ভাবাই যায় না। ওর পিছন

দিক আরও পরিষ্কার হয়ে উঠল। নজর পড়ল ওর গলায়। পরপর তিনটি সরু দাগ ওর গলায় সৃষ্টিকর্তাই এঁকে দিয়েছেন। তার নিচে থাকে তিন ফের খুব সরু তুলসীর মালা। এখন সেই মালার ওপর চড়েছে সোনার চিক, নানা রঙের পাথর বসানো। তারপর নেমেছে সাতনরী বুকের ওপর। বুকের অনেকটা অংশ খোলা, বুকটা বেশ ওঠানামা করছে।

ব্যস্ত হয়ে বুকের ওপর কাপড়টা একটু টেনে দিল। খুব মিষ্টি করে হেসে বেশ একটু জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—"অত করে কি দেখছো গো?" এবার আবার আমার দৃষ্টি উঠে এল ওর চোখের ওপর। চোখের দৃষ্টিতে কি রকম একটা মাদকতা।

শুকনো গলায় একটা ঢোক গিলে বললাম—"না, এমনিই। বেশ মানিয়েছে কিন্তু সই তোমায়!"

বোধ হয় একটু লজ্জা পেলে। মুখখানি ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর। পরমুহূর্তেই একেবারে ধড়ফড়িয়ে উঠল। ওর দু'হাতের গয়নাগুলো উঠল বেজে। খপ করে আবার ধরে ফেললে আমার হাত দু'খানা। ধরে টানাটানি সুরু করলে—"ওঠ গোসাঁই ওঠ। আর দেরি নয়। এখুনিই সবাই জেগে উঠবে। মানুষজন এসে পড়বে এখানে। এইসব নিয়ে আমি লুকোবো কোথায়? চল গোসাঁই, আঁধার থাকতে থাকতে পালাই—"

আর বলতে দিলাম না। খুব আস্তে আস্তে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায়? কোথায় লুকোবে সই মুখ তোমার?"

আকুল কণ্ঠে বলে উঠল—"যেখানে তুমি নিয়ে যাবে গোসাঁই, যেখানে তুমি লুকিয়ে রাখবে আমায়, সেখানেই লুকিয়ে রাখব এ মুখ; শুধু তুমি ছাড়া কখনও আর কেউ দেখতে পাবে না এ মুখ আমার। চল গোসাঁই, ঐ দেখ আলো হয়ে উঠল যে—"

নেমে পড়ল গদি থেকে। নেমে টানতে লাগল আমার দু'হাত ধরে। হাত ছাড়বার চেষ্টা করলাম না। শুধু একটু শক্ত হয়ে চেপে বসলাম। একটু শক্ত করে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলাম ওর চোখের দিকে চেয়ে—"কিন্তু তিনি তোমায় ঠিক খুঁজে বার করবেন।"

বেশ চমকে উঠল। থামল হাত টানাটানি, কিন্তু হাত ছাড়লে না। থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কে! কে আবার খুঁজতে বেরোবে আমায়?"

চোখ দুটির দিকে চেয়ে আছি। অকপট উৎকণ্ঠা উপচে পড়েছে সেই আশ্চর্য

চোখ দু'টি থেকে। বললাম—"তিনি, যিনি এত সব গয়না কাপড় ঢেলে দিয়েছেন তোমার পায়ে।"

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দু'হাত নাড়তে লাগল আমার চোখের সামনে।

"না, না, না গোসাঁই। এই সব গয়নাগাঁটি এমনিই আমি পেয়েছি। তাদের পরাবার সাধ হয়েছিল তাই আমায় পরিয়ে দিয়েছে। এ সব আর ফেরত নেবে না তারা। তাদের অনেক আছে—"

খুব রসিয়ে রসিয়ে বললাম—"আহা, আমি কি বলছি নাকি যে তাদের আর নেই! আছে বলেই ত তোমায় পরাবার সাধ হয়েছে! তবে সাধ ত আর এক রকমের নয়! আরও নানা রকমের সাধও ত তাদের মনে উথলে উঠতে পারে—"

কিছুতেই বলতে দেবে না আমায়, কানেও তুলবে না আমার কথা। আবার জড়িয়ে ধরলে আমার একখানা হাত। তারপরই পিছন ফিরল। আমার হাতখানা ওর ডান বগলের ভেতর দিয়ে গিয়ে ওর বুকের সঙ্গে রইল চেপে ধরা। টেনে নিয়ে চলল একেবারে।

"কোনও কথা শুনব না আমি আর। চুলোয় যাক লোকের সাধ-আহ্লাদ। আগে পালাই চল এখান থেকে। তারপর দেখা যাবে কে কি করতে পারে আমাদের!"

সত্যিই এবার টানের চোটে নামতে হ'ল গদি থেকে। নেমে দাঁড়িয়ে আর এক হাতে ধরলাম ওর কাঁধ। ধরে থামালাম ওকে। বললাম—"কিন্তু আমায় নিয়ে গিয়ে লাভ হবে কি তোমার সই? এত সব গয়না কাপড় আমি পাব কোথায়? কি দিয়ে মন জোগাব তোমার?"

ঘুরে দাঁড়ালো, মুখখানি তুলে কয়েকটি মুহূর্ত চেয়ে রইল আমার চোখের দিকে। কি অদ্ভুত চাউনি! পাথর গলিয়ে জল ক'রে দিতে পারে ওই চাউনি দিয়েই! সাধে কি আর মানুষ ওকে এত জিনিস দিয়ে সাজায়!

থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল ঠোঁট দুখানি। দুই আঁখির লম্বা পল্লবগুলোও যেন একটু কাঁপল। আমার বুকের সঙ্গে এক রকম মিশে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়ে তুলে আছে মুখখানি ওপর দিকে। কানে গেল—"গয়না কাপড়ের দাবি করব আমি তোমার কাছে? তোমার চেয়ে এগুলোর দাম আমার কাছে বেশী হবে? তোমায় নিতে এসেছি আমি সোনা-দানার লোভে?"

আর বলতে পারলে না। ভেতর থেকে কি যেন একটা ঠেলে উঠে ওর

গলার ভেতর আটকে গেল। শুধু চেয়ে রইল আমার দিকে মুখ তুলে, আর চোখ দুটো ভর্তি হয়ে এল।

ওর মুখের ওপর থেকে নজর সরিয়ে গঙ্গার অপর পারের আকাশের দিকে চাইলাম। অন্ধকার লালচে হয়ে উঠছে।

আর সেই ঈষৎ লালচে আকাশের গায়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম চরণদাসের শুকনো মুখখানা। স্পষ্ট শুনতে পেলাম যেন বাবাজী বলছে—"যদি সে কোনও দিন ফেরে ত তাকে বোল যে, শেষ সময় পর্যন্ত এ বিশ্বাস আমি বুকে রাখতে পেরেছি যে, সে কোনও ছোট কাজ করতে পারে না!"

লালচে পূব আকাশটার দিকে চেয়ে মনে হ'ল কে যেন ওখানে লুকিয়ে বসে ভেংচি কাটছে। আস্তে আস্তে লালচে হয়ে উঠল আমার মনের ভেতরটা। আগমবাগীশ ঐ সামনের ওখানটায় ঝাঁপ দিয়ে বেঁচেছে। চরণদাস বলে গেল—এই ত বেশ আছি, শুধু জল খেয়েই কাটাব—যতদিন না সে ফেরে। আর খন্তা ঘোষ জল জল করে শুকিয়ে মরেছে হয়ত এতক্ষণে। সিঙ্গী গিন্নীর নাক-ঠোঁট-খসা মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে সুবর্ণ ঐ গদির ওপর শুয়ে। আর আমার বুক ঘেঁষে মুখের কাছে মুখ তুলে ধরে জবাবের জন্যে একজন চেয়ে রয়েচে, চোখে জল টল টল করছে।

এবং এত কাপড় গয়না সোনাদানা ঢেলে দিয়েও যে ওকে ধরে রাখতে পারল না, সে এতক্ষণে কি করছে তাই বা কে জানে?

আস্তে আস্তে টেনে নিলাম হাতখানা। আস্তে আস্তে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে গদির কিনারায় বসে পড়লাম। বসে আর একবার—আপাদমস্তক দেখলাম ওর। ওর নজর তখনও স্থির হয়ে রয়েছে আমার ওপর। তারপর বললাম।

বললাম—"এত চট করে শখ মিটে গেল? না, পালিয়ে এলে এই সব সোনাদানা নিয়ে? এবার সোনাদানার লোভ দেখিয়ে আমাকে গিলতে পার কিনা তাই দেখতে এলে? সেই কুমার বাহাদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে আসনি ত? যাক্, সেজেছ ভাল! পছন্দ আছে বলতে হবে কুমার বাহাদুরের! এত কিছু দিয়েছে যখন তখন মন্দ করনি ওর অন্দরমহলে ঢুকে। মরুক গে বেটা চরণদাস শুকিয়ে। আর সে ত কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে বসে আছে যে কুমার বাহাদুরের অন্দরমহলের ভেতর বসে তুমি শুধু নামজপ করে দিন কাটাচ্ছ। হা হা হা হা হা হা—এখন যদি একবার দেখাতে পারতাম তাকে তোমার সোনা-দানা গয়নাগাঁটির বহর। হা হা হা হা হা হা—এ সমস্ত শুধু নামজপ করেই

পাওয়া যায়—অন্দরমহলের ভেতর বসে - হা হা হা হা—" দুলে দুলে অট্টহাসি হাসতে লাগলাম।

হাসতে লাগলাম গলা ছেড়ে। তারপর দম ফুরিয়ে গেল। তখন চেয়ে দেখলাম ওর দিকে। জ্বলে উঠেছে ওর দুই চক্ষু। শান দেওয়া ইস্পাতের মত দেখাচ্ছে ওর চেহারাখানা। মানুষটাই যেন আরও খানিক লম্বা হয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে ঘাড় বেঁকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আমার দিকে। দু'টো আগুনের শিখা বেরিয়ে আসছে ওর দুই চোখ থেকে। বেশ জ্বালা ক'রে উঠল আমার চোখ মুখ।

তবু ছাড়লাম না। শেষ কথাটুকু ভালো করে শেষ করার জন্যে আবার আরম্ভ করলাম।

"মনে পড়ে তোমার সই—আগে আগে প্রায়ই বলতে—তোমার ঐ রক্ত-মাংসে গড়া দেহটা পুড়িয়ে আঙার করে নেবার কথা। তখন নাকি তোমার বিষ লাগত কেউ তোমার দিকে চাইলে। হায় রে হায়, সেই রূপকে কি সাজেই সাজিয়েছে কুমার বাহাদুর! এখন একবার পরামর্শ করে এস না গো তোমার বাবুর সঙ্গে, পুড়িয়ে আঙার করে নিলে তাঁর মন উঠবে কি না। এ ত আর হতভাগা চরণদাস নয়, শুধু একটা একতারা সম্বল ক'রে ঘুরে বেড়াত তোমায় আগলে। তাই তোমার পোড়াতে ইচ্ছা করত রূপ। আজ রূপের দাম দেবার লোক জুটেছে। তবু তোমার মন উঠছে না কেন গো সই, তবু তোমার—"

হঠাৎ ঝট করে ছিটকে এসে পড়ল সাতনরী ছড়া আমার গদির ওপর। তারপর টিকলিটা, তারপর কতকগুলো চুড়ি বালা কঙ্কন তাবিজ বাজু। তারপর গলার চিকটা। অবশেষে চন্দ্রহারটা। পাগলের মত টেনে টেনে খুলতে লাগল সব গা থেকে আর ছুঁড়ে মারতে লাগল আমার গদির ওপর। সুবর্ণর গায়েও পড়ল অনেক কিছু। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মেয়েটা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল ওর দিকে। ততক্ষণে একটানে একটা কান থেকে ঝুমকো খুলে আনলে। দর-দরিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। আর সহ্য হ'ল না, লাফিয়ে নামলাম গদির ওপর থেকে। দেখেই মারলে দৌড়। খপ করে ধরে ফেললাম ওর কচি কলাপাতা-রঙের বেনারসী জরির কাজ-করা আঁচলটা। সঙ্গে সঙ্গে তিন পাক ঘুরে অনেকটা দূরে চলে গেল। কাপড়খানার এক খুঁট রইল আমার হাতের মুঠোয় আর বাদবাকীটা লম্বা হয়ে পড়ে রইল উদ্ধারণপুরের ভস্মের ওপর।

আরও অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে দুধের মত সাদা থান-পরা এক কালসাপিনী ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে রইল আমার হতভম্ব মুখের দিকে।

চিল-চেঁচিয়ে উঠল সুবর্ণ—"রাঙাদিদি গো, আমায় ফেলে পালিও না গো।" বলেই গদি থেকে লাফিয়ে পড়ে দিল দৌড়। দৌড়ে গিয়ে দু'হাতে জাপটে ধরলে তার রাঙাদিদিকে।

রাঙাদিদিও ওকে দু'হাতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল দু'চোখ দিয়ে আমার ওপর।

এগোলাম সামনের দিকে। দু'পা না ফেলতেই একটা কান-ফাটানো চিৎকার—"খবরদার—আর এক পা এগিও না, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

থামল আমার পা, একেবারে গেড়ে বসে গেল মাটিতে। কানে এল—"এ এল কি করে গোসাঁই তোমার গদির ওপর?"

জবাব দিলাম তৎক্ষণাৎ—"সে উত্তর তোমায় দিতে বাধ্য নই আমি।"

"অ—আচ্ছা, চলে আয় সুবর্ণ।" বলে মেয়েটাকে জড়িয়ে নিয়ে সামনে পা বাড়ালে।

ছুটে গিয়ে দু'হাত মেলে দাঁড়ালাম সামনে।

"না পারবে না ওকে নিয়ে যেতে। ছেড়ে দাও ওকে। ও ভালো ঘরের মেয়ে, তোমাকে ছোঁয়াও ওর পাপ।"

চোখ দুটো আরও ছোট ছোট করে চাপা গলায় বললে—"অ—আর তোমার ঐ মড়ার চ্যাকড়ার ওপর শুয়ে রাত কাটানো বুঝি পাপ নয়? আমিই ওকে পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে। কিন্তু সে অন্য কারণে। তুমিই যে ওকে গ্রাস করবে তা বুঝতে পারিনি।"

জোর করে মেয়েটাকে নিজের গা থেকে ছাড়িয়ে ঠেলে দিলে আমার দিকে—"আচ্ছা, এই নাও—"

সুবর্ণ আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকের ওপর।

"রাঙাদিদি গো—"

তখন বার দুয়েক তাকাল তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে আর মেয়েটার মুখের দিকে। তারপর মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে পা বাড়ালে সামনে।

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—"কোথায় চললে ওকে নিয়ে?"

তৎক্ষণাৎ জবাব পেলাম—"যেখানে খুশি। ও নিজে ইচ্ছা করে চলেছে আমার সঙ্গে। পার ত রোক না,—দাঁড়িয়ে আছ কেন? সে জোর আর

তোমার নেই গোসাঁই, সব এই শ্মশানের চিতায় পুড়িয়ে বসে আছে। যাক্ এতদিন মনে করতুম মড়ার গদি-বিছানায় বুঝি জ্বালা নেই। মনে করতুম মড়ার গদিতে চেপে যে বসে আছে তার বুকটাও বুঝি ঐ বিছানার মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আজ দেখলাম তা নয়। ওই ছাই-ভস্ম গয়নাগুলোই আগুন জ্বালালে তোমার বুকে! আচ্ছা এইবার বসে বসে পোড়ো নিজের আগুনে।—"

আবার পা বাড়ালে সামনে।

এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। ইচ্ছে ক'রে সরে দাঁড়ালাম না, কে যেন ঠেলে দিলে আমায় এক পাশে। ঠিক দু'হাত সামনে দিয়ে চলে গেল। অনেক চেষ্টায় পেছন থেকে বলতে পারলাম: "যেও না নিতাই, ফের।"

আরও অনেকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো। পূব আকাশ থেকে চোখ-ধাঁধানো লাল আলো এসে পড়ল ওর মুখ-চোখের ওপর। যেন জ্বলছে ওর রূপ।

ধীর শান্ত কণ্ঠে বললে—"না গোসাঁই, আর নয়। যা পাবার আমি পেয়েছি। আমি যদি অপরের দেওয়া গয়নাগাঁটি পরি বা কারও অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকি তাহ'লে যে তোমার বুক পুড়ে যায়—এইটুকু ত জানতে পারলাম। এই আমার সব পাওয়ায় বড় পাওয়া হ'ল। আর কখনও জ্বালাতে আসব না তোমায়। প্রেতের দৃষ্টি তোমার চোখে। মরণের ওপার থেকে জীবনকে দেখ তুমি। শুধু সন্দেহ নিয়ে আর অবিশ্বাস আর মনগড়া মিথ্যে অভিমান। আচ্ছা, ওই সব নিয়ে শান্তিতে বসে প্রেতের রাজত্ব চালাও তুমি—"

বলতে বলতে চলে গেল। মিলিয়ে গেল নিমগাছটার আড়ালে ওরা দু'জন। পাথরের মত দাঁড়িয়ে দেখলাম।

উদ্ধারণপুরের ঘাট।

রঙ্‌তামাসার ঠাট।

ঠাট দেখে সাদা হাড় আর কালো কয়লায় গা টেপাটিপি করে হাসে। শেয়ালে শকুনে ভেংচি কাটে। কুকুরগুলো আকাশের দিকে মুখ তুলে বাহবা দেয়। আর উদ্ধারণপুরের আনাচে-কানাচে গা ঢাকা দিয়ে যারা লুকিয়ে থাকে তারা তাদের অস্থিসার হাতে খট্‌ খটা খট্‌ তালি বাজায়।

তালি বাজায় উদ্ধারণপুরের ওস্তাদ বাজিকর। এক দো তিন—আসমান থেকে একে একে আমদানি হয় রসদ। চিতায় চিতায় ভিয়ান চড়ে যায়। রামহরে কাঁধে করে কাঠ বয়, তার বউ টাকা গুণে আঁচলে বাঁধে। ধোঁয়ায় কালো আঁধার হয়ে ওঠে উদ্ধারণপুরের আকাশ। নবরসের রসায়নাগারে পুরোদমে সুরু হয়ে যায় রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। হাড় মাংস মেদ মজ্জা পুড়িয়ে পুড়িয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়। কোথায় গেল সে? হাসি-কান্না আশা-আকাঙ্ক্ষা দেবত্ব-পিশাচত্ব দিয়ে গড়া যে ছিল ঐ খাঁচার মধ্যে, সে গেল কোথায়? খোলস ছেড়ে লুকোলো কোথায় কাল-সাপটা?

খোলস পুড়তে থাকে। উদ্ধারণপুরের চিতার ক্ষুধা কিন্তু মেটে না কিছুতে! আসল মাল চায়। আসল মাল ত আসে না উদ্ধারণপুরের ঘাটে। উদ্ধারণপুরের বাজিকর তুড়ি দিয়ে যা আমদানি করে তার ওপর-ভেতর ফক্কিকার। উদ্ধারণপুর ঘাটের পশ্চিমে বড় সড়ক। বড় সড়ক দিয়ে আসে যায় আসল মালেরা। খোলস ছাড়লে খোলসটা নেমে আসে উদ্ধারণপুরের ঘাটে পুড়তে।

কিন্তু এল। হুস করে একটা আওয়াজ হ'ল বড় সড়কের ওপর! থামল এসে একখানা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী। তারপর তারা নেমে এল; নিমগাছটার এধারে আসতে চিনতে পারলাম। স্বয়ং কুমার বাহাদুর। হাঁ—আসল মালই বটে। কিন্তু ওটি কে? কতগুলি মনের মানুষকে মনের মত করে সাজান কুমার বাহাদুর? নাঃ—শখ আছে বটে, শখ আর সামর্থ্য দুইই আছে! যাকে পাচ্ছে তাকেই সাজাচ্ছে পটের বিবির মত। কিন্তু এখানে আবার কেন? আর ত কেউ নেই এখানে যে ধরে নিয়ে গিয়ে সাজাবেন। যাক্, ভালোই হ'ল। গয়নাগুলো আর কাপড়খানা ফিরিয়ে নিয়ে যাক্। আবার কোনও মনের মানুষ জুটলে তাকে সাজাবে মনের মত ক'রে। বেশ ক'রে সমঝে দিতে হবে ওঁকে যে

এবার যেন একটু বুজেসুঝে মনের মানুষ পাকড়াও করেন। বুনো পাখীকে সোনার শেকল পরালেও সে তা কাটাবেই!

আরে একি! দামী সাজ পোশাক সুদ্ধই যে লুটিয়ে পড়ল দু'জনে শ্মশান-ভস্মের ওপর! খামকা এত ভক্তি ঢালছে কেন শুকনো ভস্মে?

প্রণাম সেরে গলায় আঁচলসুদ্ধ জোড়হাতে দাঁড়ালেন কুমারের সঙ্গিনী। খুব মৃদু সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবা, মাতাজী কোথায়? তাঁকে দেখছি না ত!"

মাতাজী!

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলাম ওঁদের মুখের দিকে। এক পা এগিয়ে এলেন কুমার। বললেন—"খুব ভোরে আমরা তাঁকে নামিয়ে দি এখানে। ঐ বাজারের ওধারে গাড়ী নিয়ে আমরা বসেছিলাম। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন সেই রকম। আপনাকে তিনি শ্মশান থেকে বার করে নিয়ে যাবেন, তারপর আপনাদের দু'জনকে আমরা নিয়ে যাব।"

যতদূর সম্ভব গলা থেকে ঝাঁজটা তাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলান—"কোন্ চুলোয়?"

থতমত খেয়ে গেলেন কুমার। কিন্তু তাঁর সঙ্গিনী গ্রাহ্য করলেন না কিছু। সেইভাবে জোড়হাতে বলতে লাগলেন—"মাতাজীর কাছে কামনা জানালাম যে অন্তত একটিবার আপনার চরণের ধুলো আমাদের সংসারে পড়া চাই। আপনার দয়াতেই আমাদের ভাঙা সংসারে জোড়া লাগল। আপনাকে দেখে, মাতাজীর মুখ থেকে আপনার কথা শুনে আমার স্বামীর চোখ ফুটল। তাই একটিবার আপনাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব আমরা—এই প্রার্থনা জানালাম মাতাজীর কাছে। তাঁর দয়া হ'ল, নিজেই এলেন আপনাকে নিতে। তিনি ছাড়া আর কারই বা সাধ্য হবে আপনাকে আসন থেকে তোলবার? কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেল যে! আর থাকতে না পেরে আমরাই নেমে এলাম। মাতাজী গেলেন কোথায়?" এধার ওধার চেয়ে খুঁজতে লাগলেন দুজনে ওঁদের মাতাজীকে।

গদির ওপর ছড়ানো গয়নাগুলো তখন নজরে পড়ে গেল ওঁদের। ঘরের চালের ওপর ফেলে রেখেছিলাম শাড়ীখানা। সেখানাও এতক্ষণে দেখতে পেলেন ওঁরা। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে চাইলেন। তারপর বোবা হয়ে চেয়ে রইলেন আমার চোখের দিকে।

ওঁদের মুখের অবস্থা দেখে ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল। আর সামলাতে পারলাম না, হা হা করে হেসে উঠলাম।

সেই নৃশংস উল্লাস দেখে দু' জোড়া চোখে ফুটে উঠল আতঙ্ক। একটি বাক্যও

বার হল না কারও মুখ থেকে, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন দু'জনে আমার মুখের দিকে।

গয়নাগুলোর দিকে আঙুল উঁচিয়ে হুকুম করলাম—"নিয়ে যাও এগুলো।"

চমকে উঠলেন কুমার—"নিয়ে যাব! কেন?"

বেশ রসিয়ে জবাব দিলাম—"আবার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে তখন তাঁকেই জিজ্ঞাসা কোর।"

কান্না উথলে উঠল কুমারের সঙ্গিনীর গলায়—"তাহ'লে কি মাতাজী আমাদের একেবারে ত্যাগ করে গেলেন? মাত্র কাল আমরা তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়েছি, আর দু'টো দিনও তাঁকে ধরে রাখতে পারলাম না। কিছুই যে করা হল না তাঁর, কিছুই যে আমরা দিতে পারলাম না তাঁকে।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হুজুরের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন কুমার—"কোথায় গেছেন তিনি?"

আরও চড়া গলায় জবাব দিলাম—"বলব কেন তোমাদের?"

সমস্ত রক্ত চলে গেল কুমারের মুখ থেকে। চেষ্টা করে একটা ঢোঁক গিললেন।

এক ঝলক আগুনের হলকা বার হ'ল তখন শ্রীমতীর মুখ থেকে।

"বলবেন না আপনি? কেন, কি অপরাধ করেছি আমরা? আমরা আপনাদের সন্তান, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছি আমরা। আপনি আমাদের গুরুর গুরু। আপনাকে দেখে আমার স্বামী পাগল হয়ে উঠলেন। অমন স্ত্রীকে ত্যাগ করে কিসের টানে মানুষ শ্মশানে বসে থাকে, শ্মশানে বাস করে কি শান্তি পান আপনি, এই সব চিন্তা করে উনি মানুষ হয়ে গেলেন। মাতাজী আমাকে গিয়ে ধরলেন আমার বাপের বাড়ীতে। আমাকে ফিরিয়ে আনলেন। স্বামী শ্মশানবাসী হলেও স্ত্রী তাকে ছায়ার মত আগলে থাকে কেন, তা বুঝতে পারলাম মাতাজীকে দেখে। আমার মনের কালি ঘুচে গেল। জন্মের মত বিদেয় নিয়েছিলাম স্বামীর সংসার থেকে। আবার ফিরে এলাম, এসে দেখলাম স্বামী মানুষ হয়ে গেছেন। তখন দু'জনে তাঁর পায়ে আশ্রয় চাইলাম। কাল আমাদের দীক্ষা হয়েছে। ঐ কাপড় ঐ গয়নাগাঁটি আমি তাঁকে আপন হাতে পরিয়ে দিয়েছি। আমাদের ভিখারিণী মা কিন্তু নিজের সাজ ছাড়লেন না। বললেন—দাও পরিয়ে এই সাদা কাপড়ের ওপরেই। এ আমি ছাড়তে পারব না। যদি কোনওদিন তাকে তুলে আনতে পারি শ্মশান থেকে, ছাড়াতে

পারি তার গা থেকে মড়ার কাপড়, তবেই ছাড়ব এই ভিখারীর সাজ! বড় আশায় তিনি এসেছিলেন আপনাকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে। কোথায় গেলেন তিনি? এভাবে আমাদের তিনি ত্যাগ করে চলে যাবেন এ যে ভাবতেই পারি না। কার কাছে আর দাঁড়াব আমরা—"

বল হরি—হরি বোল।

আকাশ-ফাটা হুংকার উঠল বড় সড়কের ওপর। বন্যার জলের মত নেমে আসছে মানুষ! ডোমপাড়া ময়নাপাড়া আর বাজারের দোকানদাররা, সবাই ছুটে আসছে, তাদের মাঝে আসছে মাথা উঁচু করে অনেকগুলো লাঠি। আর আসছে—

বল হরি—হরি বোল।

নিমগাছের এধারে এসে গেছে। কে ও! কাকে আনছে ওরা? রাজার রাজা এলেও ত এত জাঁকজমক হয় না। কার আবির্ভাবে এভাবে খেপে উঠল উদ্ধারণপুরের মানুষ! এ কোন্ মহারাজাধিরাজ?

হু হু করে চলে এল সকলে। সামনের লোক ছ'পাশে সরে পথ করে দিলে। সেই ফাঁক দিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো চারজন আমার গদির সামনে। তাদের কাঁধে বাঁশ। বাঁশের মাঝে ঝুলছে—রক্তমাখা কাপড় জড়ানো একটা জাহুর পোঁটলা। টপ টপ করে রক্ত পড়ল কয়েক ফোঁটা শ্মশান-ভস্মের ওপর। তারপর ভিড়ের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল সিধু ঠাকুর। আছড়ে পড়ল আমার গদির সামনে। আকাশটা চিরে গেল সিধু ঠাকুরের বুক-ফাটা চিৎকারে—

"গোসাঁই বাবা গো— খন্তাকে নিয়ে এলাম গো আমরা—"

বাকীটুকু শোনা গেল না। শতকণ্ঠ একসঙ্গে ডুকরে উঠল। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাহাকার ক'রে উঠল উদ্ধারণপুরের শেয়ালগুলো, বিকট গর্জন করতে লাগল শ্মশানের কুকুরগুলো, নিষ্ফল আক্রোশে শকুনগুলো ডানা ঝাপটাতে লাগল মাথার ওপর। আর নিচে উদ্ধারণপুরের গঙ্গা মাথা কুটতে লাগল উদ্ধারণপুর ঘাটের পায়ে।

এনেছে ওরা।

লাঠালাঠি করে কেড়ে এনেছে। খন্তার খুনের দাম দিতে গিয়েছিল যারা

তারা খুন দিয়ে দাম শোধ করেছে। বিনা জলে শুকিয়ে মারবার মতলবে যে ঘরে খন্তাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল সেই ঘরের জানলা ভেঙে খন্তা উঠে পড়ে শীলেদের তেতলার ছাদে। সেখানেও তাকে তাড়া করা হয়। সেই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে খন্তা নিচের শান-বাঁধানো উঠোনে। কার সাধ্য রোখে খন্তাকে ? খন্তা পালিয়ে এল ঠিক। তাঁরা মতলব করেছিলেন খন্তার ছাড়ু-হওয়া খোলসটা পাচার করে ফেলবার। সে সুযোগটুকু আর মিলল না। এরা গিয়ে পড়ল আর লাঠি হাঁকরে ছিনিয়ে নিয়ে এল খন্তা ঘোষকে।

শুনলাম সিধু ঠাকুরের মুখ থেকে খন্তা ঘোষের বিজয়-কাহিনী। তারপর দু'চোখ বুজে বসে রইলাম। কানে বাজতে লাগল শতকণ্ঠের আকুল আর্তনাদ। দুর্দান্ত খন্তা মরেনি, মরতে পারে না খন্তা। শত শত বুকের ভেতর ভয়ানক রকম বেঁচে রয়েছে। "মোহন প্যারে"কে জাগাবার জন্যে তান তুলত খন্তা ঘোষ। উদ্ধারণপুরের ঘাট তোলপাড় করত দাপাদাপি করে। "মোহন প্যারে" জেগেছে সকলের বুকের মধ্যে। কার সাধ্য মারে খন্তাকে। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে উদ্ধারণপুরের ঘাট থেকে খন্তাকে ছিনিয়ে নেবে।

ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল কান্নার কলরোল। কি হ'ল! দু'চোখ মেলে দেখলাম। দেখলাম আবার ফাঁক হয়ে গেল সামনের মানুষের ভিড়। পথ করে দিল সবাই। আর ওরা দু'জন এগিয়ে এল ধীরে ধীরে। খন্তা ঘোষের ছোড়দি এসে দাঁড়ালো খন্তা ঘোষের জীবনের আলোর হাত ধরে। একটা ছুঁচ পড়লেও শব্দ শোনা যায়। দম বন্ধ করে চেয়ে আছে সকলে। তারপর শোনা গেল ঃ

"চোখ খোল সুবর্ণ। যা দেখতে চাস, চেয়ে দেখ। ভাই আমার নেমকহারাম নয়। ঐ দেখ পড়ে আছে তার বিদ্‌ঘুটে খোলসটা। ওই ছেড়ে ফেলে সে এসে লুকিয়েছে তোর বুকের ভেতর। আর কেউ দেখতে পাবে না তাকে, শুধু তুই দেখবি তোর বুকের ভেতর। সে তোকে দেখবে আর তুই তাকে দেখবি। হয়ে গেল তোদের বিয়ে। এখন আর কে বাধা দেবে! বেঁচে রইল আমার ভাই তোর বুকে। চল্—এবার পালাই এখান থেকে।"

মেয়েটা চোখ খুললে না। টুঁ শব্দ করলে না। মুখটা গুঁজে দিলে রাঙাদিদির বুকে।

আবার ওরা ফিরে চলল ধীরে ধীরে শত শত জোড়া বোবা চোখের সামনে দিয়ে। ছুটে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়ালো কুমারের স্ত্রী।

"মা—"

এগিয়ে গেলেন কুমার। খুব ভারী গলায় বললেন—"আমরা কি করব বলে গেলে না ত ?"

হাসতে জানে নিতাই। খুব মিষ্টি করে হাসতে জানে। মিষ্টি করে হেসে ওদের দিকে চেয়ে বললে—"কেন, তোমার আবার ভাবনা কি ? ঐ ত বসে রইলেন উনি। যাঁর কৃপা তোমরা পেলে, যাঁর মন্ত্র আমি দিয়েছি তোমাদের, যাঁর দিকে চেয়ে তোমরা সংসার করবে, সেই গুরুর গুরু ত ঐ বসে আছেন। আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমি ভিখিরী মেয়েমানুষ। পথে পথে ঘুরে বেড়ানো আমার কাজ। আমাকে বাধা দিও না।"

বাধা আর দিল না ওরা। পথ ছেড়ে দিলে। এগিয়ে চলল আবার—সুবর্ণকে জড়িয়ে ধরে।

আর থাকতে পারলাম না। ডাক ছেড়ে উঠলাম।

"নিতাই, একেবারে ভুলে গেলে বাবাজীর কথা ?"

থমকে দাঁড়াল। পিছন ফিরেও তাকালো না, আবার পা বাড়ালে।

আবার চেঁচিয়ে উঠলাম—"বাবাজী অন্নজল ত্যাগ করেছে নিতাই। সেও গিয়েছিল খন্তার সঙ্গে। খন্তাকে ত আনলে এরা, তাকে বোধ হয় শেষ করেই দিলে।"

ফিরে দাঁড়াল এবার। পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেললে আমার চোখের ওপর। জিজ্ঞাসা করলে—"তা আমি কি করব ?"

তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম—"কিন্তু যদি ধর সে ফিরেই আসে তখন তার মুখে জল তুলে দেবে কে ? তোমার হাতে ছাড়া আর কারও হাতে সে জলও খাবে না।"

আবার বললে সেই এক কথা—"তা আমি কি করব ?"

এবার সত্যিই ব্যাকুল হয়ে উঠলাম—"নিতাই, তুমি যা বলবে তাই করব আমি। উঠে যাব আমি এখান থেকে তোমার সঙ্গে। শুধু তুমি বাবাজীকে বাঁচাও। যদি সে ফেরে তার মুখে জল দিয়ে তাকে বাঁচাও তুমি। আর আমি কিছু চাই না তোমার কাছে—"

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল বোষ্টমী। হাসি যেন উপচে পড়তে লাগল ওর চোখ-মুখ সর্বাঙ্গ থেকে। হাসি সামলাতে সামলাতে বললে—"বাবাজীর জন্যে তুমি আর কি করতে রাজী আছ গোসাঁই ? যাক আর

কয়েকটা দিন। ভুল তোমার ভাঙ্‌বেই একদিন। সেদিন বুঝতে পারবে একটা একেবারে মিথ্যে-মরীচিকা নিয়ে তুমি মাথা খুঁড়ে মরছ। আচ্ছা যদি তোমার বাবাজীর সঙ্গে আবার দেখা হয় ত তাকে বোল যে মড়া নিয়ে মেতে থাকার ফুরসৎ নেই আমার। জ্যান্তদের যদি একটু শান্তি দিতে পারি তাহ'লেই আমি নিজে মরে শান্তি পাব। মড়ার আবদার তুমিই শোন বসে বসে গোসাঁই। ও বিলাসিতা আমার পোষাবে না।"

বলতে বলতে পেছন ফিরে আবার পা বাড়ালে। তারপর ওরা মিলিয়ে গেল লোকজনদের পেছনে। কুমার আর তাঁর স্ত্রীও গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। অভ্যাস দোষে বলে ফেললাম—"খন্তা, একটা বোতল খোল্ ত বাবা, গলাটা ভিজিয়ে নিই।"

বলেই ভয়ানক চমকে উঠলাম। রক্তমাখা কাপড়ের পোঁটলাটা তখনও পড়ে আছে ঠিক সামনে। হাঁ করে চেয়ে রইলাম সেদিকে!

একটা খোলা বোতল কে হাতে ধরিয়ে দিলে। অভ্যাস-দোষে সবটুকু গলগল করে ঢেলে দিলাম। দিয়ে আবার চোখ বুজে রইলাম।

উদ্ধারণপুরের উপসংহার।

নেমে এল উদ্ধারণপুরের মাথার ওপর উদ্দাম উপপ্লবের বেশ ধরে। খুব কাছে সরে এল উদ্ধারণপুরের আকাশ। হাড়ের শিঙা ফোঁকা ভুলে গিয়ে উদ্ধারণ-পুরের বাতাস মেতে উঠল আকাশের দুই কালামুখী দেবীকে নিয়ে। বাসনা আর বঞ্চনা, উদ্ধারণপুরের দুই দেবীর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিতে লাগল উদ্ধারণপুরের উন্মত্ত বাতাস। দুর্দান্ত খন্তা ঘোষ মাঝে মাঝে খেপে গিয়ে ময়না পাড়ার ঢেঁটা মেয়েগুলোর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাত। বলত, মর্ তোরা, মর্। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে মরার চেয়ে আয় তোদের আমিই মেরে ফেলি। মেরে চুলোয় তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাই যেখানে দু'চক্ষু যায়। মড়াকান্না উঠত ময়নাপাড়ায়। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করা মুলতবী রেখে ওরা সবাই গলা মিলিয়ে লেগে যেত খন্তার বাপান্ত চোদ্দপুরুষান্ত করতে। হি হি করে হাসতে হাসতে সরে আসত খন্তা। বলত—দে, যত পারিস গালাগাল দে আমায় চুলোমুখীরা। কিন্তু খেঁকী কুকুরের মত কামড়া-কামড়ি করে মরিস নে।

হি হি করে হাসছে উদ্ধারণপুরের বাতাস। কাঁই কাঁই করে কাঁদছে উদ্ধারণপুর আকাশের দুই কালামুখী দেবী বাসনা আর বঞ্চনা। কড়-

কড়-কড়াৎ করে দু'হাতের দশটা আঙুলের দশখানা ধারালো নখ দিয়ে চিরছে উদ্ধারণপুর রঙ্গমঞ্চের পর্দাখানা উদ্ধারণপুরের উপসংহার। আর কোনও চালাকি চলবে না জাঁহাবাজ জাদুকরের। যবনিকাখানা ছিঁড়ে খানখান করে দেখাবেই উপসংহার কি লুকোনো আছে ওর আড়ালে। জারিজুরি ভাঙবে আজ জাদুকরের। উদ্ধারণপুর রঙ্গমঞ্চের ওপর ভেলকিবাজির খেল্ দেখানো ভেস্তে যাবে চিরকালের মত। ঠসক দেখিয়ে ঠকানো আর চলবে না।

হু হু করে জ্বলে উঠেছে খন্তা ঘোষের চিতাটা। লাফিয়ে উঠেছে আগুন আকাশ ছোঁবার জন্যে। আগুনে বাতাসে লড়াই চলেছে চিতার ওপর। উদ্ধারণপুরের বাতাস নেভাবেই খন্তা ঘোষের চিতা। নবরসের একটারও ধার ধারত না খন্তা। কোনও লাভ নেই ওকে জ্বালে চড়িয়ে। খন্তা ঘোষকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ঐ খোলসের মধ্যে। লোকের বুকের মধ্যে যে চিতা জ্বলছে তাতে চড়ে আরামে পুড়ছে খন্তা ঘোষ। পুড়বেও চিরকাল। কোনও কালে সে পোড়ার শেষ হবে না।

উদ্ধারণপুরের উপসংহার।

উপসংহার উড়িয়ে নিয়ে গেল আমার গদির ওপরের চালাখানা। নিয়ে গিয়ে ফেললে গঙ্গার জলে। গঙ্গা ভাসিয়ে নিয়ে চলল সাগরের বুকে বিসর্জন দিতে। সাফ্ হয়ে গেল মাথাটা। ঠিক সেই সময় কড়-কড়-কড়াৎ—একটা ঝিলিক দিলে গঙ্গার এপার ওপার জুড়ে। আর সেই আলোয় দেখতে পেলাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম কে যেন কি খুঁজছে উদ্ধারণপুরের ঘাটে। অন্ধের মত দু'হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে ঘুরে বেড়াচ্ছে শ্মশানে। নিমেষের জন্যে দেখতে পেলাম। মিলিয়ে গেল সে কালো যবনিকার অন্তরালে। তারপর শুনতে পেলাম।

অনেক দূর থেকে, খন্তা ঘোষের চিতার ওধার থেকে ভেসে এল আওয়াজটা, উদ্ধারণপুরের উন্মাদ বাতাসের বুক চিরে ভেসে এল।

এগিয়ে আসছে, ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে শোনবার চেষ্টা করছি।

আর একবার, আর একটিবার চিরে ফেলুক কালো যবনিকাখানা উদ্ধারণপুরের উপসংহার। তাহ'লেই হবে। সাধ্য থাকবে না—চিতার আঁচে পোড়া আমার চোখ দু'টোকে ফাঁকি দেবার। ঠিক ধরে ফেলব জাদুকরকে।

ধরবই দু'হাতে জাপটে। তারপর গলা টিপে তুলে দোব ঐ খস্তা ঘোষের পেল্লিহান চিতাটার ওপর।

হাত দুটো গদির ওপর দিয়ে হন্তে কুকুরের মত উবু হয়ে বসলাম। দেখা-মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়ব তার ঘাড়ে। বেরিয়ে যাবে আমার সঙ্গে চালাকি করা।

এবার আরও স্পষ্ট শুনতে পেলাম। ধরতে পারলাম কথাগুলো—

"তোমার চরণ পাব বলে
মনে বড় আশা ছিল।
আমার মনে বড় আশা ছিল॥"

লাফিয়ে পড়লাম গদির ওপর থেকে। আন্দাজ করে ছুটলাম যেখান থেকে আওয়াজটা আসছিল সেখানে।

সরে গেল অন্য দিকে। আবার কানে এল—

"আশা-নদীর কূলে বসে গো
আমার আশায় আশায় জনম গেল॥"

আর ফাঁকি দেওয়া চলল না। এক লাফে গিয়ে জাপটে ধরলাম তাকে দু'হাতে বুকের সঙ্গে। টেনে নিয়ে চললাম আলোর দিকে। খস্তা ঘোষের চিতার আলোয় চিনব এবার ওকে।

চিতার কাছে পৌঁছে ও আমার বুকের ওপর মাথাটা রেখে এলিয়ে পড়ল। বললে—"আঃ, বাঁচলাম গোসাঁই। বড় ভয় ছিল তোমায় বোধ হয় খুঁজে পাব না।"

"কেন মোহন্ত? কেন খুঁজে পাবে না আমায়? শুধু তোমার জন্যেই আমি বসে আছি মোহন্ত। জানতুম আমি যে তুমি আসবে। এবার তোমার সঙ্গে আমি চলে যাব মোহন্ত। এখানের কাজ আমার ফুরিয়েছে।"

সমস্ত দেহটা তখন ছেড়ে দিয়েছে চরণদাস আমার গায়ে। ভয়ানক রোগা হয়ে গেছে, আধখানা হয়ে এসেছে চরণদাস। যাক্, তবু ত এসেছে। এবার পালাই ওকে নিয়ে। রাতটা কোনও রকমে কাটলে হয়।

চরণদাস ছোট ছেলের মত আবদেরে সুরে বললে, "একটু বোস গোসাঁই, আমি শুই তোমার কোলে মাথা রেখে। আর যে পারি না খাড়া থাকতে।" বসে পড়লাম খস্তা ঘোষের চিতার পাশে। চরণদাস শুয়ে পড়ল আমার কোলে মাথা দিয়ে। শুয়ে খুব আস্তে আস্তে আবার গেয়ে উঠল—

"তোমার চরণ পাব বলে গো
মনে বড় আশা ছিল।"

হঠাৎ বাবাজীর সমস্ত দেহটা দু'বার শিউরে উঠল। মাথাটা তুলে খক্ খক্ করে কাসতে লাগল। হড়াৎ করে এক ঝলক বেরিয়ে এসে পড়ল আমার কোলের ওপর। দেখলাম চিতার আলোয়—খন্তা ঘোষের চিতার আলোয় দেখতে পেলাম—কালোয় কালো হয়ে গেল আমার কোলটা। আর তার ওপরেই আবার মুখ থুবড়ে পড়ল চরণদাস।

কাঠ হয়ে বসে রইলাম ওর দিকে চেয়ে। অনেকক্ষণ পরে সামলে নিলে বাবাজী। তারপর আবার আরম্ভ করলে—

"আশা-নদীর কূলে বসে গো
আমার আশায় আশায় জনম গেল।"

আবার কেঁপে উঠল ওর দেহটা। তেউড়ে উঠল দেহটা। আবার সেই কাসি। কাসির সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—"তোমায় যে দেখতে পাচ্ছি না গোসাঁই, আর কিছুই যে দেখতে পাই না আমি। আমার চোখের আলো অনেক দিন নিভে গেছে গোসাঁই। তাই বড় ভয় ছিল হয়ত তোমায় খুঁজে পাব না।"

আবার উঠল একটা কাসির দমক। বেরিয়ে এল আর এক ঝলক কালো রক্ত, পড়ল আমার কোলের ওপর। তারপর খুব আস্তে আস্তে চরণদাস শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

উদ্ধারণপুরের উপসংহার।
উপসংহার উপহার দিয়ে গেল আমার কোলে।
খন্তা ঘোষের চিতার আলোয় উপহারের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।
উদ্ধারণপুরের বাতাস লড়তে লাগল চিতার আগুনের সঙ্গে।

ওকে নামিয়ে দিলাম ভস্মের ওপর। দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

একটা কলসী চাই। তাড়াতাড়ি চাই। গঙ্গাজল আনতে হবে। স্নান করাতে হবে চরণদাসকে। বড় জ্বালায় জ্বলেছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেছে তবু জল মুখে দেয়নি। ওকে ঠাণ্ডা করতে হবে। জল মুখে দিতে হবে ওর। ওর সারা অঙ্গ ধুইয়ে দোব গঙ্গাজল দিয়ে। তারপর তুলে দোব খন্তা ঘোষের চিতার ওপর। শেষ হয়ে যাবে, রাতের অন্ধকারে শেষ করে দোব ওকে। চিহ্নমাত্র রাখব না। কেউ জানবে না কোথায় গেল চরণদাস বাবাজী।

পেলাম একটা ভাঙ্গা কলসী।

দৌড়ে গিয়ে আনলাম জল। তাড়াতাড়ি লেগে গেলাম কাজে। টেনে খুলে ফেললাম ওর কাপড়খানা। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম সেখানা আগেই চিতার আগুনে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুনটা। উলটে ফেললাম বাবাজীকে। ছুটে এল আবার বাতাস। আগুনের শিখাটা নুয়ে পড়ল এদিকে। আর—

আর পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেলাম আমি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম বাবাজীর দিকে। খন্তা ঘোষের চিতার আলোয় দেখলাম।

দেখলাম—একটা অসমাপ্ত রচনা। সৃষ্টিকর্তার মনের ভুল। মনের ভুল নয় শুধু, একটু গাফিলতি। অতি-বৃদ্ধ ওস্তাদের হাতের কাজে খুঁত থেকে গেছে।

বাবাজী নর নয়, নারী নয়। কিছুই নয়। বিধাতার অমার্জনীয় ভ্রান্তির নিষ্ঠুর সাক্ষ্য।

উদ্ধারণপুরের উপসংহার।

উপসংহার উপহাস করে বিদায় নিলে। বিধাতার সামান্য ভুলের জের টেনে ভুলের দঁকে পড়ে খাবি খেয়ে মরছি আমি!

ওকে তুলে দিলাম। খন্তা ঘোষ আর চরণদাস, সাদা হাড় আর কালো কয়লা জ্বলতে লাগল একসঙ্গে। চরণদাসের লজ্জা লুকিয়ে ফেললাম। সেই চিতা থেকে একখানা কাঠ টেনে নিয়ে গিয়ে গুঁজে দিলাম গদিটায়। বাতাস এসে লাগল তার পেছনেও। উদ্ধারণপুরের গদি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। রাশীকৃত ভুল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে উদ্ধারণপুর ঘাটের অনেকটা আঁধার ফিকে করে আনলে। সেই আগুনে পুড়তে লাগল কুমার বাহাদুরের গয়নাগুলো আর কাপড়খানা। পুড়ুক—অনেক আছে তাঁর। কিছু ক্ষতি হবে না।

উঠে এলাম বড় সড়কের ওপর।

অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে পালাতে হবে।

নেমে এল আকাশ। কাঁদতে লাগল বাসনা আর বঞ্চনা। কেঁদে বিদেয় দিচ্ছে উদ্ধারণপুরের দেবীরা।

এগিয়ে চললাম বড় সড়ক ধরে।

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই টের পেলাম। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম কে হাঁটছে আমার পাশে পাশে।

তারপর ধরলে আমার একখানা হাত।

কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে—"চল, পা চালিয়ে চল একটু। আঁধার থাকতে পার হয়ে যাই এই পথটুকু।"

নিশ্চিন্ত হয়ে পা চালালাম।

হাত ত ধরেই আছে, আর ভয় কি।

সমাপ্ত